আলেক্সি তল্‌স্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

তিন খণ্ডে সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

উনিশ-শো আঠারো

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
4610
LIBRARY.
2.4.58
Agartala.

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ ঃ **ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫**॥

আলেক্সি তল্‌স্তয়ের **অর্ডিয়েল** উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড **'নাইন্টিন-এইটিন'**
মূল রুশভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ ঃ আইভি লিৎভিনোভা
ও তাতিয়ানা লিৎভিনোভা॥

ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশক ঃ ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস্‌
পাবলিশিং হাউস, মস্কো॥

দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ঃ **রথীন্দ্র সরকার**॥

প্রচ্ছদপট ঃ **খালেদ চৌধুরী**॥

প্রকাশক ঃ **সুরেন দত্ত**
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২॥

মুদ্রক ঃ সুখলাল চট্টোপাধ্যায়
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা ১৪॥

পাঁচ টাকা॥

দ্বিতীয় খণ্ড

উনিশ-শো আঠারো

রচনাকাল

১৯২৭

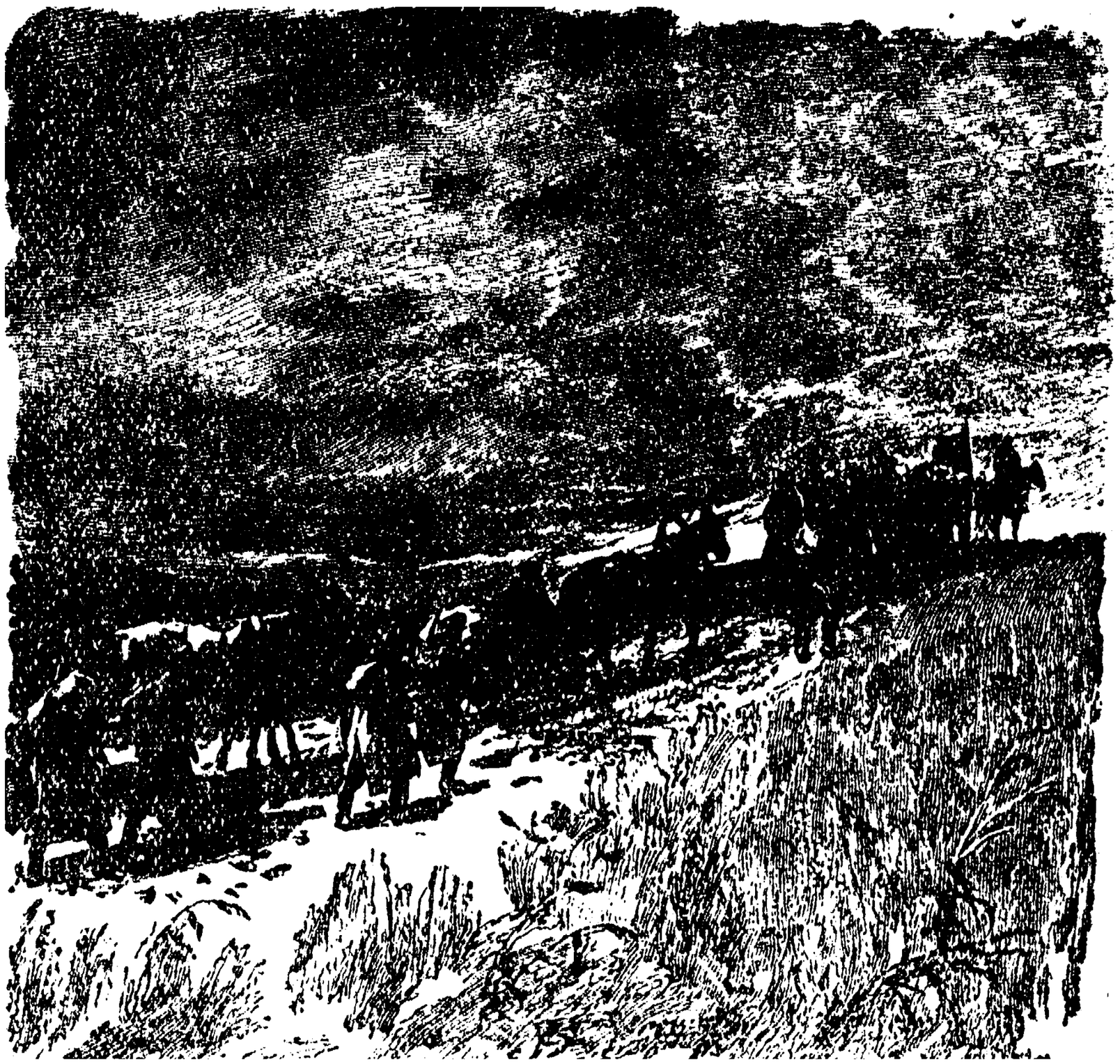

"বারংবার রক্তস্নানে আমাদের সব মালিন্য
ঘুচেছে; তপ্ত ক্ষারের বাষ্প-কটাহে ডুবে
বিগত হয়েছে যত গ্লানি; সলিল মন্থনে
আমরা হয়েছি অনাবিল—
নিকষিত সোনা এমন আর আছে কারা?"

॥ এক ॥

সব শেষ হয়ে গেছে। রাস্তার যতো আবর্জনা কুড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শীতার্ত বাতাস। সামরিক নির্দেশনামা লেখা টুকরো কাগজ, থিয়েটারের পোস্টার আর রুশ জনগণের 'বিবেকবুদ্ধি ও দেশপ্রেমের' উদ্দেশে প্রচারিত আবেদন-পত্রের ছেঁড়া টুকরো এখন পিতার্সবুর্গের নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত রাস্তার উপর বাতাসে গড়িয়ে বেড়ায়। নানা বর্ণের ছেঁড়া পোস্টারের স্তূপ, সেগুলোর গায়ে এখনও আঠার চিহ্ন—হাওয়ার দমকে উড়ে যায় আর কেমন যেন একটা অশুভ আওয়াজ তোলে খস্ খস্ করে। বাঁধানো ফুটপাতের উপর জমে-থাকা বরফ বাতাসের ঠেলায় সাপের মতো এঁকে বেঁকে যায়।

কিছু দিন আগেও হৈ-হল্লা আর মাতাল কোলাহলে এই রাজধানী কেঁপে উঠেছে, আর এখন এইটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজপথ আর চত্বরগুলো ছেড়ে মানুষের সেই অলস ভীড় এখন কোথায় মিলিয়ে গেছে। উইণ্টার প্রাসাদ * খাঁ খাঁ করছে, 'অরোরা' ক্রুজার † থেকে একটা কামানের গোলা এসে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে তার ছাদ। অস্থায়ী গবর্নমেণ্টের সদস্যরা, প্রতিপত্তি-শালী ব্যাংকার আর নামজাদা জেনারেলদের দল যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। গর্বোদ্ধত গাড়ী, সুন্দরী নারী, উপরওয়ালা অফিসার, সরকারী কর্মচারী, আর বড়ো বড়ো আদর্শওয়ালা কূটনীতিকের দল—সবাই চলে গেছে রাজধানীর পথ ছেড়ে। সে-পথ এখন নোংরা আর কলুষিত। দোকানঘরগুলোর জানলায় হাতুড়ি মেরে তক্তা আঁটার শব্দ শোনা যায়—রাত হলে আওয়াজটা আরো ঘন ঘন শোনা যেতে থাকে। কয়েকটা দোকানের জানলায় এখনো করুণভাবে শোভা পাচ্ছে পশরার উচ্ছিষ্ট—কোথাও-বা একটুখানি পনীর, কোথাও-বা পচা কেকের টুকরো। কিন্তু সে দৃশ্য দেখে বিগত জীবনকে ফিরে পাবার কামনাই আরো উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে। ভীরু পথচারীরা দেয়ালে গা ঘেঁষে চঞ্চল চোখে লক্ষ্য করে রাস্তার টহলদারী সৈনিকদের—সবল একদল মানুষ সুদৃঢ়-পায়ে পায়চারি করছে, মাথার টুপিতে লাল তারকার চিহ্ন, কাঁধের উপর ঝুলছে রাইফেল, মাটির দিকে সেগুলোর মুখ ফেরানো।

উত্তুরে-বাতাসের ঠাণ্ডা ঝাপ্টা এসে বাড়ীগুলোর অন্ধকার জানলা গলে ভিতরে ঢোকে, ঠেলে এগিয়ে যায় নির্জন পরিত্যক্ত অলিন্দের দিকে, অতীত বিলাসের অপচ্ছায়াকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে। উনিশ শো সতেরো সালের শেষের এই পিতার্সবুর্গ—এক ভয়ংকর নগরী।

ভয়াল, গভীর রহস্যময় আর দুর্বোধ্য। সবই শেষ হয়ে গেছে। অতীতকে বরবাদ করে দেয়া হয়েছে একদম। ছেঁড়া কোট গায়ে একটি লোক বালতি আর রঙের তুলি হাতে বাতাস-ঝাপটানো সেই রাস্তাটার ওপর দিয়ে একবার দৌড়ে এগিয়ে আসছে আবার পেছিয়ে চলে যাচ্ছে। পুরনো পাঁচিলের গায়ে সাদা তালির মতো লেগে আছে বিজ্ঞাপনগুলো, তারই উপর সেই লোকটি ক্রমাগত নতুন নতুন আদেশনামা সেঁটে চলেছে। পদমর্যাদা, প্রতিপত্তি, বৃত্তি, সাময়িক তকমা, ভগবান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নিজের খুশিমতো বাঁচার অধিকার পর্যন্ত আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত। বরবাদ! লোকটির টুপির কিনারার তলা দিয়ে সাদা পোস্টারগুলোর কুটিল ভয়ংকর দৃষ্টি উঁকি দিচ্ছে কাঁচের জানলাওয়ালা বাড়ীটির দিকে—ঘরের বাসিন্দারা ঠাণ্ডা কামরাগুলোর মধ্যে এখনো

---

* উইণ্টার প্রাসাদ—জারের নিকেতন; ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

† অরোরা—বাল্টিক সাগরের নৌবাহিনীর ক্রুজার; এই 'অরোরা' জাহাজের কামান থেকেই প্রথম উইণ্টার প্রাসাদের উপর আক্রমণ শুরু হয়।

পায়চারি করছে, পরনে তাদের নরম্ ফেল্টের জুতো আর ফারের কোট। হাত মোচড়াতে মোচড়াতে তারা বারে বারে একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করছে—

"এসব কি হচ্ছে! কী হবে বলতে পারো? রাশিয়া যে ধ্বংস হয়ে গেল, সব যে শেষ হয়ে গেল...এ যে মৃত্যু!"

জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওরা দেখতে পায় রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে আসবাবপত্রবোঝাই একটা লম্বা গাড়ি। ঐ বাড়ীটিতেই বাস করতেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। ঐ জায়গাটিতেই একজন শান্ত্রীকে হরদম দেখা যেত সিধে টান হয়ে দাঁড়িয়ে ধূসর প্রাসাদটির দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকতে। আজ তারা সেখানে দেখতে পাচ্ছে বাড়ীর দরজাগুলো একেবারে হাঁ, সশস্ত্র সৈনিকেরা ঐ দরজা দিয়ে টেবিল চেয়ার কার্পেট ছবি ইত্যাদি বয়ে নিয়ে আসছে গাড়িটার মধ্যে। ফটকের উপর ঝুলছে লাল শালুর তৈরি একটা পতাকা। আর ঐখানেই দাঁড়িয়ে আছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, পাতলা একখানি কোট গায়ে পা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, গালের ওপর জুলফি উড়ছে আর পাকাচুলওলা মাথাটা তিনি কেবলই ঝাঁকাচ্ছেন। ওরা তাঁকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিচ্ছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় কোথায় যাবেন উনি? যেখানে তাঁর খুশি!...আর ইনিই হলেন কিনা মহামন্য রাষ্ট্রপতি—রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ!

তারপর যখন রাত্রি নেমে আসে...গাঢ় অন্ধকার, একটি বাতিও জ্বলে না। কোনো ঘরের জানলায় একটুখানি আলোও দেখা যায় না। কয়লা নেই, অথচ তবু শোনা যায় স্মল্‌নি প্রাসাদটি * নাকি আলোয় আলোময়। কারখানা এলাকাতেও নাকি আলো জ্বলে। অত্যাচারিত, বুলেটবিদ্ধ নগরীর উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে যায় হু-হু করে, ছাদের ফুটোগুলোর মধ্যে দিয়ে শিস্ কেটে চলে যায় বাতাস ঃ 'হায়, হায়, হায়!'

অন্ধকারের বুকে বন্দুকের আওয়াজও শোনা যায়। কে গুলি চালায়? কেন? কাকে লক্ষ্য ক'রে? ওইদিকটায় নয় তো? ওই যে যেখানে তুষার-সাদা মেঘের গায়ে দপ্‌দপে আগুনের ছোপ লেগেছে? না, না, ও তো মদের ভাঁটিখানা, আগুনে পুড়ে যাচ্ছে মাটির তলার কুঠরিতে ভাঙা পিপের মদে ডুবে যাচ্ছে মানুষগুলো...মরুক্ গে, পুড়ে মরুক সবই!

হায় রে রাশিয়ার মানুষ, রাশিয়ার জনগণ!

রাশিয়ার মানুষেরা এখন সৈন্যবাহী ট্রেনে গাদাবন্দী হয়ে অন্তহীন স্রোতের মতো ফিরে আসছে—ফিরে আসছে তারা লক্ষ মানুষের প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, ঘরের মুখে,—তাদের গ্রাম, তাদের স্তেপভূমি, তাদের জলা-জঙ্গলের দিকে...দেশের মাটিতে ফিরে আসছে তারা, ঘরের নারীর কাছে...। ভাঙ্গা জানলাওয়ালা রেলের কামরাগুলোয় তারা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,

---

* স্মল্‌নি—লেনিনগ্রাদের একটি অট্টালিকা। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে এই স্মল্‌নিই হয়েছিল মহান্ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সদর দপ্তর।

হঠাৎ জ্বলে উঠল। একটা লালচে আলোয় ভরে গেল ঘরখানা। দাশাকে দেখা গেল টেবিলের পাশে বসে আছে। ভেতরে যাই পরুক কাঁধের উপর চাপিয়ে নিয়েছে একখানা কোট। ফেল্ট-বুটের মধ্যে ঢোকানো একখানি পা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্লটিং-প্যাডটার ওপর গাল রেখে টেবিলে মাথাটা পেতে বসে আছে সে। বিড়ম্বনাক্লিষ্ট মুখখানা রোগা হয়ে গেছে দাশার, চোখ দুটো একেবারে খোলা—চোখ পর্যন্ত বোজেনি সে! কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর বেয়াড়া ভংগীতে বসে আছে দাশা, একদম আড়ষ্ট হয়ে.....

ভারী গলায় বলল তেলেগিন, "দাশা, অমন করে বসে থেকো না।" ওর জন্য এমন একটা করুণা তেলেগিনের মনকে আচ্ছন্ন করল যে সে আর থাকতে পারল না। টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময় বাতির সামান্য লাল শিখাগুলোও আবার দপ্‌দপ্‌ করতে করতে নিবে গেল। ক'সেকেন্ড মাত্র জ্বলেছিল।

দাশার পিছনে এসে দাঁড়ায় তেলেগিন। দম বন্ধ করে ওর উপর ঝুঁকে পড়ে। মনে হয় এখন একটি কথাও না বলে শুধু ওর চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দেওয়াই বোধ হয় সবচেয়ে সহজ কাজ। কিন্তু তেলেগিনের এগিয়ে আসা সত্ত্বেও দাশার কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, তার ঐ নিস্পন্দ দেহটা যে মৃতদেহ নয় তাই বা কে বলবে।

"দাশা, অমনভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?"

একমাস আগে দাশার একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল, কিন্তু তিনদিনের বেশি বাঁচেনি ছেলেটি। অকাল প্রসব হয়েছিল, সাংঘাতিক একটা আঘাতের ফলে। 'ফিল্ড অব মার্সে' দাশার উপর হঠাৎ চড়াও হয়েছিল দু'জন অমানুষিক ধরনের লম্বা লোক, বাতাসে তাদের গায়ের চাদর উড়ছিল। ওরা নিশ্চয়ই সেই কুখ্যাত "লাফানে" গুণ্ডা যারা পায়ে স্প্রিং বেঁধে ঘুরে বেড়াত। সেই ভয়ানক দিনগুলোতে সারা পেত্রোগ্রাদে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছিল ঐ গুণ্ডারা। দাশাকে দেখে প্রথমে তারা শিস্‌ কেটে দন্তবিকাশ করতে থাকে। দাশা মাটিতে পড়ে গেলে ওরা তার কোটটা ছিঁড়ে ফেলে, তারপর লাফাতে লাফাতে চলে যায় লেবিয়াঝি পুলের দিকে। কিছুক্ষণ মাটিতেই পড়েছিল দাশা। এমন সময় বৃষ্টি হতে থাকে তুমুল ধারায়। 'গ্রীষ্ম-উদ্যানের' নগ্ন লাইমগাছগুলো পাগলপারা হয়ে ডাল ঝাপটাতে থাকে। ফন্তান্‌কা নদীর ওপার থেকে যেন একটানা একটা চীৎকার ভেসে আসতে থাকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। অজাত শিশু প্রচণ্ডভাবে লাথি ঝট্‌কাতে থাকে পৃথিবীতে প্রবেশলাভ করার দাবি জানিয়ে।

এমন তাড়া দিতে থাকে গর্ভের শিশুটি যে দাশা অবশেষে উঠে পড়ে। ব্রয়েত্‌স্কি পুল পার হয়ে যায়। লোহার রেলিং-এর গায়ে বাতাসে সেঁটে যায় দাশার দেহ, ভিজে পোশাক তার পা জড়িয়ে ধরে। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই, পথচারীও কেউ নজরে পড়ে না। পুলের অনেক নীচে বয়ে চলেছে নেভা নদীর কালো জলের উদ্দাম স্রোত। পুল থেকে নেমে আসতেই দাশা অনুভব করল প্রথম

তেলেগিন এত করে বোঝানো সত্ত্বেও দাশা কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারল না একটি কথা—তার ছেলেটা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে গেছে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, একা একা।

স্বামীকে জবাব দেয় দাশা, "বেশ তো, এ নিয়ে আর কিছু বলব না কখনো।" তেলেগিনের ওই যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানো কথাগুলো সে আর শুনতে চায় না, স্বামীর ওই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রক্তিম মুখটার দিকে তাকাতে ভালো লাগে না দাশার—কোনো দুঃখবেদনাই সে-মুখের সদাতুষ্ট ভাবটিকে বিচলিত করতে পারবে না।

এই স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যেই তেলেগিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারা শহর ঘুরে বেড়াতে পারে এটা-সেটা কাজকর্ম, খাবার, জ্বালানিকাঠ ইত্যাদির ধান্দায়, শুধু একজোড়া ছেঁড়া গালোশ্ জুতো পায়ে দিয়ে। দিনে কতবারই তো সে বাড়ীর দিকে ছুটে আসে। সব সময়ই একটা উৎকণ্ঠা আর দরদের ভাব নিয়ে।

কিন্তু ঠিক এই দরদ আর সেবার প্রয়োজনটাই এখন ফুরিয়ে গেছে দাশার কাছে। ইভান ইলিয়িচ যতোই কাজের ভীড় বাড়িয়ে তুলছে, দাশাও যেন ততোই দূরে সরে যাচ্ছে, সে-ব্যবধান ঘুচবার আশা ক্রমেই সুদূরপরাহত হয়ে উঠছে। ঠাণ্ডা ঘরটায় সে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে, ওইটাই যা স্বস্তি। কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে সে যখন চোখের উপরে হাত বুলিয়ে নেয়, তখন বেশ তাজাই মনে হয় নিজেকে। তারপর কোন এক সময় রান্নাঘরের দিকে চলে যায়, মনে পড়ে ইভান ইলিয়িচ কী যেন করতে বলে গিয়েছিল তাকে। কিন্তু একেবারে সহজ কাজ-গুলো করাও এখন তার পক্ষে সাধ্যাতীত। জানলার উপরে ঝিরঝিরিয়ে পড়ে নভেম্বরের বৃষ্টির ছাঁট। পিতার্সবুর্গের উপর দিয়ে সোঁ-সোঁ করে পাগলা হাওয়া বয়ে যায়। আর এই ঠাণ্ডায়, সমুদ্রের ধারের ওই গোরস্থানে বিশ্রাম করে তার ছেলের ছোট্ট মৃতদেহটি—একটিবার কেঁদে কঁকিয়ে নালিশও জানাতে পারে নি বেচারা!.....

ইভান ইলিয়িচ বোঝে যে দাশা এখন মানসিকভাবে অসুস্থ। বিজলী বাতি নিবে গেলেও তার কিছু আসে যায় না, চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে যেমন ছিল তেমনি বসে থাকে, মাথায় শালটা মুড়ি দিয়ে। নিশ্চুপ হয়ে নিজের গভীর বেদনায় সে মগ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু জীবনে তো বাঁচতে হবে.....বাঁচা যে একান্ত দরকার...। মস্কোতে কাতিয়ার কাছে লিখেছিল তেলেগিন দাশার কথা জানিয়ে, কিন্তু নিশ্চয়ই চিঠিগুলো তার হাতে পড়ে নি, না হলে জবাব আসতো নিশ্চয়ই। হয়তো কাতিয়ার নিজেরই কোনো বিপদ ঘটে থাকবে। যা কঠিন দিনকাল পড়েছে।

দাশার পিছনে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পা ঘষতে ঘষতে ইভান ইলিয়িচ একটা দেশলাইয়ের বাক্স মাড়িয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে ব্যাপারটা—যতক্ষণ আলো ছিল না, দাশা নিশ্চয়ই একের পর এক দেশলাই জ্বালিয়ে লড়াই করেছিল অন্ধকারের সাথে, প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল নিঃসঙ্গতা দূর করতে। 'আহা, বেচারী! সারাদিনটা একা একাই কাটিয়েছে!'—ভাবল তেলেগিন।

সাবধানে বাক্সটা তুলে নিল সে। এখনও কয়েকটা কাঠি রয়েছে ভেতরে।

সেটা তার হাতে এল সে এক তাজ্জব ব্যাপার (নেভ্স্কি প্রসপেক্টের একজন পঙ্গু সৈন্য একজোড়া দস্তানার বদলে ঐ জিনিসটি দিয়েছে তাকে)। এক কোয়া লেবুর সঙ্গে মিষ্টি এক গেলাস চা তৈরি করে তেলেগিন এগিয়ে দিল দাশার সামনে।

"এই যে দাশা—একেবারে লেবু দিয়ে তৈরি। আচ্ছা, 'ঘোড়ার ঠুলিটা' জেবলে দিচ্ছি এখ্খুনি।"

টিনের কৌটার মধ্যে সূর্যমুখী-বিচির তেলে সলতে ডুবিয়ে যে বাতিটা তৈরি করা হয়েছে তারই নাম হল 'ঘোড়ার ঠুলি'। ইভান ইলিয়িচ সেটা ভেতরে নিয়ে আসতেই একটা ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরটার মধ্যে।

দাশা এখন চেয়ারের উপর ভাল হয়ে গুছিয়ে বসে চা খাচ্ছে। হৃষ্টমনে তেলেগিন তার পাশটিতে বসে পড়ে।

"বল তো দেখি আজ কার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার? ভাসিলি রুব্লেভ! মনে আছে সেই রুব্লেভদের কথা? সেই যে গো, আমার কারখানায় কাজ করতো বাপ আর ছেলে? আমার সঙ্গে ওদের বেজায় দোস্তি ছিল। বাপটার নজর ছিল চোখা, অর্ধেক মন তার পড়ে থাকতো গাঁয়ের দিকে, অর্ধেক কারখানায়। ভারী অদ্ভুত ধরনের লোক! আর ভাসিলি তো সেই তখন থেকেই বলশেভিক। চালাক ছেলে, কিন্তু মাথায় ফোঁড়াওলা ভালুকের মতো একটু যা তিরিক্ষি মেজাজ। ফেব্রুয়ারি মাসে সে-ই তো প্রথম মজুরদের নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিল। বাড়ী বাড়ী চিলে-কোঠায় উঠে সে পুলিশের লোক খুঁজে বেড়াতো। শুনেছি আধ-ডজন পুলিশকে নাকি সাবাড়ও করছিল নিজের হাতে। অক্টোবর বিপ্লব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও এখন বিরাট লোক হয়ে গেছে। যাই হোক, ওতে আমাতে তো অনেক কথই হল।.....কি, শুনছ না দাশা?"

"শুনছি তো"—জবাব দিল সে।

শূন্য গেলাসটা নামিয়ে রেখে হাতের তেলোয় চিবুক ঠেকিয়ে দাশা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল বাতিটার চঞ্চল শিখার দিকে। তার ধূসর চোখের তারায় সারা দুনিয়ার সব কিছুর সম্পর্কে একটা গভীর ঔদাসীন্যের চিহ্ন। মুখটা প্রলম্বিত, গায়ের পাতলা চামড়া কেমন যেন স্বচ্ছ। একসময় স্বাধীন উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে উঁচিয়ে থাকতো যে-নাকটা এখন তা কেমন যেন পাতলা আর শীর্ণ দেখাচ্ছে।

"ইভান", বলল সে (খুব সম্ভব চা আর লেবুর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে)—"দেশলাই খুঁজতে গিয়ে বইয়ের আড়ালে এক বাক্স সিগারেট পেয়েছিলাম। ইচ্ছে করলে তুমি....."

"সিগারেট! ওঃ দাশা, কতোকালের প্রিয় জিনিস যে ওগুলো আমার!"

ইভান ইলিয়িচ খুশির মাত্রাধিক্য দেখিয়ে ফেলল একটু, অথচ অসময়ে কাজে দেবে বলে সে নিজেই ওই সিগারেটগুলো বইয়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। যাই হোক, সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সে আড়চোখে চেয়ে দেখল দাশার নিষ্প্রাণ অবয়ব-রেখার দিকে। নাঃ, ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে কোথাও,...অনেক দূরে, দক্ষিণের দিকেই কোথাও—ভাবল সে। "বুঝলে দাশা, ভাসিলি রুব্লেভের সঙ্গে তো আমার

কিছু শিখতে পারতাম ওদের কাছ থেকে, আমাদের এ জাতটার কাছে কিছু আশা করা যেত তাহলে। কিন্তু এখন তো সবই শেষ.....ওই যে বলে না ডাক্তাররা—'এ-রকম কেসে ডাক্তারী বিদ্যা অচল'? এখন হয়েছে তাই।...তুমি কি যা-তা বলছ! হাতিয়ার কোথায় যে যুদ্ধসজ্জা করব—তিন-কাঁটাওয়ালা উকন-ঠ্যাঙ্গা দিয়ে? এই বছরেই জার্মানরা গোটা দক্ষিণ আর মধ্য এলাকা দখল করে ফেলবে, আর জাপানীরা দখল করবে সাইবেরিয়া, দেখে নিও। আমাদের মুঝিকরা তখন তাদের বিখ্যাত উকন-ঠ্যাঙ্গা হাতে নিয়ে পালিয়ে দিশা পাবে না, উত্তর মেরুর ঐ তুন্দ্রা অঞ্চলে খেদিয়ে দেওয়া হবে তাদের। তারপর,—শৃঙ্খলা, সংস্কৃতি, ভক্তিশ্রদ্ধা সব আবার ফিরে আসবে দেশে। তখন আবার আমরা প্রাণভরে বলতে পারব—'রুশদের দেশ'। আর আমি? আমি তখন কী খুশিই যে হব!"

এককালের পুরনো উদারনৈতিক দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্; যে-সব বস্তুকে একসময়ে তিনি পূতপবিত্র জ্ঞান করতেন আজ তাকেই তিনি তিক্ত বিদ্রূপের কশাঘাতে উপহাস করছেন। নিজের বাড়ীটার উপরেও ছাপ পড়েছে তাঁর এই আত্ম-ধিক্কারের। ধূলি-ধূসর জানলাওয়ালা কামরাগুলোতে ঝাঁট পড়ে নি কখনও, কতকাল সাফ হয় নি কে জানে! তাঁর পড়ার ঘরে মেন্দেলিয়েভের* যে ছবিখানা টাঙানো ছিল, সেটার উপর পড়েছে মাকড়সার জালের ঘন পর্দা, টবের মধ্যে গাছগুলো সব শুকিয়ে গেছে, বই, কার্পেট, ছবি ইত্যাদি সোফার নিচের বাক্সটার মধ্যেই পড়ে রয়েছে ঠিক যেমনটি ছিল তিন বছর আগেও—সেই দাশা যখন বেড়াতে এসেছিল বাপের কাছে, ১৯১৪ সালে।

সৈনিক ও শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সোবিয়েত যখন সামারায় ক্ষমতা দখল করে সে-সময় বেশির ভাগ ডাক্তারই গররাজী হলেন সেপাই আর ইতর জনতার এই প্রতিনিধিদের হয়ে কাজ করতে। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্‌কে পৌর হাসপাতালগুলোর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানানো হল। তাঁর নিজস্ব হিসেব অনুযায়ী যেহেতু বসন্তকালের আগেই জার্মানরা সামারায় এসে পড়বে, তাই তিনি পদটি গ্রহণ করলেন। ওষুধপত্র পাওয়া দুষ্কর, আর দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্‌ও জোলাপ ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ বাতলাতেন না কাউকে। 'সব গণ্ডগোলের মূল হল কোষ্ঠ অপরিষ্কার'—সহকর্মীদের বলতেন তিনি চিড়-ধারা প্যাঁশ্‌নেব আড়াল দিয়ে ওদের দিকে বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যভরা তির্যক দৃষ্টি হেনে। "যুদ্ধের সময় লোকে কোষ্ঠের যত্ন নিত না। বাবুদের এই হাঁক-ডাকওয়ালা ছন্নছাড়া মেজাজের গোড়ার কারণ যদি খুঁজে বার করতে চান তবে দেখবেন সব কিছুর মূলে রয়েছে কোষ্ঠ-কাঠিন্য। হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, নিয়মিত এবং পাইকারি হারে জোলাপের প্রয়োগই একমাত্র....."

---

*দ্মিত্রি ইভানোভিচ্ মেন্দেলিয়েভ (১৮৩৪-১৯০৭) বিখ্যাত রুশ রসায়নবিৎ, বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুপ্রসিদ্ধ। 'পিরিয়ডিক' সূত্র এবং 'পিরিয়ডিক সিস্টেমের' আবিষ্কর্তা।

করে চুল-ছাঁটা গোল মাথাটায় রুপোলি ছোপ ধরেছে। কালিপড়া বসা-চোখে তার ঐ শুকনো মলিন মুখখানা পোড়াকাঠের মতো দেখায়। ছেঁড়া অয়েলক্লথটার উপর যখন সে সজোরে ঘুঁষি মেরে বলে 'আমরা এর শোধ তুলব। চরম শাস্তি দেব' তখন কাতিয়ার কিন্তু মনে হয় ও যেন আসলে একটা নিষ্ফল, অক্ষম ক্রোধ নিয়ে বাড়ী ফিরেছে আর মাঝে মাঝে কারুর উদ্দেশে ধমকানি লাগাচ্ছে : 'দাঁড়াও না, দেখে নেব!' কিন্তু রশ্‌চিন যেমন ভদ্রলোক, ঐরকম একটা দুর্বল আর ভয়ঙ্কর কাহিল মানুষের পক্ষে কার ওপর শোধ নেয়া সম্ভব? নিশ্চয়ই ওই রাশিয়ান সৈন্যগুলোর উপর নয় যারা এই ঠাণ্ডায় রাস্তায় রাস্তায় রুটির টুকরো আর সিগারেট মেগে বেড়াচ্ছে? কাতিয়া ওর স্বামীর পাশে আলগোছে বসে তার হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দেয়। স্বামীর জন্য ওর মনটা বড়ো কোমল হয়ে ওঠে, একটা করুণার ভাবে আচ্ছন্ন হয় বুক। মন্দ কাকে বলে সে ধারণাই নেই কাতিয়ার—যখন অন্যের মধ্যে মন্দ খুঁজে পায় তখন সে নিজেকেই দুষতে থাকে।

কী যে সব ঘটে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই কাতিয়ার। ওর কাছে বিপ্লবটা যেন গভীর অন্ধকার এক ঝড়ের রাত্রির মতো রাশিয়ার বুকের ওপর নেমে এসেছে। তবে কয়েকটা শব্দকে ও বেজায় ভয় পায় : 'সোব-ডেপ্‌' (ডেপুটিদের সোবিয়েত) কথাটাকে মনে হয় একটা বিকট হিংস্র কিছু; 'রেভ্‌-কম্‌' (বিপ্লবী কমিটি) কথাটা যেন ভয়ঙ্কর একটা ষাঁড়ের মতো ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে গর্জন করে তেড়ে আসছে বাগানের বেড়া ভেঙে ছোট্ট কাতিয়ার দিকে (এমন একটা ব্যাপার সত্যিই সত্যিই ঘটেছিল ওর ছেলেবেলায়)। খবরের কাগজটার বাদামী পাতাখানা খুলে যখন সে পড়ে ঃ 'ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ লুণ্ঠনের মতলব লইয়া তাহার হিংসা-লোলুপ মিত্রবর্গের সহিত.....' ইত্যাদি, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভেসে ওঠে প্যারিসের ছবি,—গ্রীষ্মের সেই নিঃশব্দ নীলাভ কুয়াশায় ঢাকা প্যারিস. ম্যানিলার সৌরভে স্নিগ্ধ সেই বিষণ্ণতার আমেজ, শহরের পয়োপ্রণালীগুলোতে জলের কলকল শব্দ; তার মনে পড়ে সেই অপরিচিত লোকটির কথা যে তার পিছু পিছু ধাওয়া করে অবশেষে পার্কের একটা বেঞ্চে বসে তাকে বলেছিল তার মৃত্যুর একদিন আগে : "আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই তোমার। আমার অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস্‌ হয়েছে। তা ছাড়া বুড়োও হয়ে পড়েছি। বিরাট এক দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে আমার উপর—তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি! আহা, কি চমৎকার মিষ্টি মুখখানি তোমার!"

নাঃ, ওরা কিছুতেই সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে না!—ভাবে কাতিয়া।

শীত প্রায় শেষ হয়ে এল। শহরে নানারকম গুজব। আজ যা শোনা যায় কাল হয়তো শোনা যাবে তার চেয়েও চমকপ্রদ কিছু। ফরাসী আর ইংরেজরা নাকি জার্মানির সঙ্গে গোপনে শান্তি-চুক্তি করেছে, যুক্ত বাহিনী নিয়ে রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়াই ওদের মতলব। কর্নিলভের বীরত্বের কাহিনী ফলাও হয়ে প্রচারিত হয়—কর্নিলভ নাকি মুষ্টিমেয় একদল সৈনিক নিয়ে লালরক্ষীবাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যের ব্যাটালিয়ন ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে, কসাক-গ্রামগুলো তারা

দখল করছে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে কাজে লাগবে না বলে; ওরা নাকি গ্রীষ্মকালে মস্কোর উপর একটা ব্যাপক ধরনের আক্রমণ চালাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

রশ্‌চিন বলে : "উঃ কাতিয়া! এমন জোর লড়াই চলছে আর এই সময় আমি কিনা পায়ে পা দিয়ে বসে। আর সহ্য হয় না কাতিয়া, সহ্য হয় না!"

চৌঠা ফ্রেব্রুয়ারি এক বিরাট জনতা ডাক্তারের বাড়ীর জানলার পাশ দিয়ে মিছিল করে গেল ফেস্টুন আর পতাকা উড়িয়ে। দারুণ বরফ পড়ছিল। তুষার-ঝড় শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই পেতলের ব্যান্ডগুলো মুখর হয়ে উঠল 'ইণ্টার-ন্যাশনাল' গানে। খাবার ঘরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে সশব্দে ঢুকে পড়েন ডাক্তার। কোট টুপি বরফে ঢেকে গেছে।

"জার্মানদের সঙ্গে শান্তি হয়ে গেছে, বুঝেছ হে!"

ডাক্তারের চওড়া চক্‌চকে মুখখানার দিকে নীরবে চেয়ে থাকে রশ্‌চিন। চেহারাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা ধূর্ত দম্ভের ভাব। তার ঐ অবজ্ঞাভরা গর্বের হাসি দেখে রশ্‌চিন ঘুরে দাঁড়ায় জানলার দিকে। বাইরে তুষার-ঝড়ে ঢাকা পড়ে গেছে বিরাট এক জনতার ভীড়। হাতে হাত দিয়ে, জটলা বেঁধে চিৎকার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে চলেছে ওরা। লম্বা কোট গায়ে, ভারী জামা পরা মানুষের দল, নারী ও শিশু সবাই হেঁটে চলেছে এক অন্তহীন মিছিলে—এই হল সত্যিকারের রাশিয়া, নীচুতলার আঁধারঘেরা রাশিয়া.... কিন্তু এরা সব এল কোত্থেকে?

রশ্‌চিনের রুপোলি মাথার পিছনটা চাপা রাগে ফুলে ওঠে, যেন গর্দানের মধ্যে ঢুকে যেতে চায় মাথাটা। কাতিযা তার কাঁধের উপর নিজেব গালটা পেতে দেয়। জানলার বাইরে ওই যে জীবনটা বয়ে চলেছে সেটাকে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

বলে ওঠে : "ঐ দেখ ভাদিম, কেমন খুশিতে উপচে পড়ছে ওরা! যুদ্ধ কি তা হলে সত্যি সত্যিই শেষ হল? এমন চমক লাগানো কথা তো আমার বিশ্বেসই হতে চায় না।"

রশ্‌চিন ওর কাছ থেকে সরে যায়। হাতদুটো পেছনে রেখে মোচড়াতে থাকে মুঠো। চাপা ঠোঁটের ওপর ফুটে ওঠে একটা নিষ্ঠুর রেখা.....

"সবুরই করো না একটু!"

সামরিক উর্দির কাপড়ে তৈরি কুঁচকে-যাওয়া জ্যাকেট আর শার্ট-পরা পাঁচ জন লোক বসেছিলেন খিলানওয়ালা ছোট ঘরটিতে। সামনে একখানা টেবিল। অনিদ্রায় চোখে-মুখে কালি পড়ে গেছে। টেবিলের বং-চটা ঢাকনিটার উপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে রুটিব টুকরো, সিগারেটের অর্ধাংশ, বাজে কাগজ। সেগুলোর ভীড়ের মধ্যে মাথা জাগিয়ে রয়েছে টেলিফোন আর কাঁচের গেলাসগুলো। মাঝে মাঝেই লম্বা করিডোরের সামনে দরজাটা খুলে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে একেক

HARJAS BIR BIKRAM COLLEGE
4610
LIBRARY.

॥ দুই ॥

শীতের শুরুতেই অগণিত মানুষের দু'টো স্রোত দু'দিক থেকে এসে মিলছিল দক্ষিণ-রাশিয়ার রেলওয়ে জংশনগুলোতে—একটানা অবিরামগতিতে। উত্তর দিক থেকে আসছিল শৌখীন রাজনীতিবিদ্, উর্দিপরা অফিসার, ব্যবসায়ী, পুলিশের লোক, আগুন-লাগা প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে-আসা জমিদার, রোমাঞ্চ-সন্ধানী, অভিনেতা, লেখক, সরকারী কর্মচারী আর ছাত্রের দল যারা ভাবতো ফেনিমোর কুপারের অ্যাডভেঞ্চারের দিনগুলো বুঝি ফিরে এসেছে আবার;—অর্থাৎ সেদিন পর্যন্ত যারা রাজধানী দুটোতে হৈ-হল্লায় মেতেছে সেই শহুরে জনতারই নানা স্তরের মানুষ আজ পালিয়ে এসেছে এইখানে, পালিযে এসেছে ধর্মশাস্ত্রের উপসংহারে আগামী দিনের যে ভয়াবহ উপপ্লবের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তার হাত থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে। দন, কুবান আর তেরেক্-এর শস্য-সুফলা প্রাচুর্যভরা অঞ্চলের দিকে ছুটে চলেছে তারা। দক্ষিণ দিকে থেকে আগত বিশাল ট্রান্সককেসীয়-বাহিনীর সঙ্গে পথে মোলাকাত হচ্ছে তাদের, উত্তরের দিকে এগিয়ে আসছে এই বাহিনী, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনগান, গুলিগোলা আর ট্রাক-বোঝাই নুন, চিনি, কাপড় ইত্যাদি নিয়ে। দুটো জনস্রোত যেখানে মিলেছে সেখানে মানুষের কী অসম্ভব ভীড়। প্রতিবিপ্লবী শ্বেতরক্ষী (হোয়াইট গার্ড) গোয়েন্দারা ওরই মধ্যে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছে। গ্রাম থেকে কসাকরা আসছে অস্ত্রশস্ত্র কিনবার আশায়, ধনী কৃষকরা শস্য আর শুয়োরের চর্বির বদলে নিয়ে যাচ্ছে কাপড়। চারিদিকেই ডাকাত আর পকেটমারের উপদ্রব। যারা ধরা পড়ছে পত্রপাঠ 'সাফ্' হয়ে যাচ্ছে রেলগাড়ীর তলায়।

লাল রক্ষীদের (রেড গার্ড) কয়েকটি বাহিনীকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারছিল না তারা, মাকড়সার জালের মতো কেবলই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। এ হল স্তেপ অঞ্চল, স্বাধীন স্বেচ্ছা-চারিতার পীঠভূমি। সেই স্মরণাতীত কাল থেকে কসাকরা চরে বেড়াচ্ছে এখানে। সবকিছুই নিষ্ফল এখানে, বেসামাল, বগলাহীন আব অনিশ্চিত..... আজ হয়তো জমিহীন চাষী আর বহিরাগতেরা মিলে খাড়া করল একটি নির্বাচিত সোবিয়েত, কালই আবার দেখা যাবে গ্রামাঞ্চলেব কসাকরা নির্মম তলোয়ারের সাহায্যে খেদিয়ে দিয়েছে কমিউনিস্টদের, নভোচেবকাস্কের আতামান (কসাক-সর্দার) কালেদিনের কাছে হয়তো কোনো দূতকে পাঠিয়েছে তাব টুপির নীচে গোপন চিঠি লুকিয়ে রেখে। সুদূর পেত্রোগ্রাদের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে এখানে থোড়াই গ্রাহ্য করে লোক।

কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ওরা টের পেতে শুরু করল পেত্রোগ্রাদের শক্তি। নাবিক, শ্রমিক আর গৃহহীন সৈনিকদের নিয়ে তৈরি হল প্রথম বিপ্লবী ফৌজীদলগুলো। জরাজীর্ণ সৈন্যবাহী-ট্রেনে চেপে তারা এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গা পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। বড়ো শৃঙ্খলাহীন আর মারমুখী তাদের স্বভাব।

পিঠের দিকে গিঁট বাঁধা। রুশ্‌চিন তার আসনটিতে বসে ঝিমুচ্ছে। গায়ে সৈনিকের গ্রেটকোট, মাথায় চুড়োতোলা টুপি।

মন্থরগতিতে চলেছে ট্রেন। বড়ো বড়ো লম্বা গাছ নজরে পড়ে। তাদের ঝাপড়া ডালগুলোয় ঘন হয়ে ঝুলছে দাঁড়কাকের বাসা। গাছগুলোর মাথার উপরে চক্কোর দিচ্ছে অসংখ্য কাক, ডালের উপরেও বসে বসে দুলছে কতকগুলো। জানলা ঘেঁসে বসল কাতিয়া। বাচালের মতো উদ্বেগভরে 'কা-কা' করছে দাঁড়কাকগুলো—মনে হয় যেন বসন্তকাল। কাতিয়া যখন ছোট্টটি তখনও ওরা ওইভাবেই 'কা-কা' করে ডাকতো বসন্তের তুমুল বৃষ্টিধারা, পাতলা কুয়াশা আর প্রথম ঝড়ের গান গেয়ে।.....

কাতিয়া আর রুশ্‌চিন চলেছিল দক্ষিণমুখো। কোথায় তা ওরা নিজেরাই জানে না—রস্তভ্‌ কিংবা নভোচেরকাস্ক্‌ অথবা দন অঞ্চলের কোনো গ্রামদেশে। এমন জায়গা খুঁজে নিতে হবে যেখানে গৃহযুদ্ধের আল্‌গা বাঁধন শক্তহাতে গেরো দেয়া হচ্ছে। রুশ্‌চিন ঘুমিয়ে পড়েছে মাথাটা ঝুলিয়ে। পাতলা মুখখানা ভরে গেছে দাড়িতে, রুচিবাগীশ চাপা ঠোঁটদুটি ঘিরে কঠিন কালো রেখা। কাতিয়া যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়। এ তো 'ওর' মুখ নয়, উঁচু নাক-ওয়ালা এ যে এক অপরিচিত চেহারা।.....বাতাসে ভেসে আসে কাকের কর্কশ স্বর। লাইনের জোড়-গুলোয় খট্‌খট্‌ আওয়াজ তুলে ধীরে এগিয়ে চলেছে গাড়ীটা। স্তেপভূমির উপর দিয়ে একটা কর্দমাক্ত রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। রাস্তাটা জুড়ে সারবন্দী হয়ে চলেছে অসংখ্য গাড়ি—ঝাঁকড়া-লোমওলা টাট্টু ঘোড়া, কাদার চাপড়া লেগে থাকা খামার-গাড়ি, আর তার মধ্যে কুৎসিত ভয়ংকর চেহারার দাড়িওয়ালা সব মানুষ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রুশ্‌চিন গলা থেকে বের করছে একটা অদ্ভুত আওয়াজ। নাক-ডাকানি আর আর্তবিলাপের মাঝামাঝি একধরনের শব্দ, কর্কশ অথচ করুণ।

"ভাদিম, ভাদিম!"

ভয়ংকর শব্দটা হঠাৎ থেমে যায়। চোখ খুলে তাকায় রুশ্‌চিন, দৃষ্টিতে তার ভাবের লেশমাত্র নেই।

"উঃ! কী বিশ্রী স্বপ্নই না দেখছিলাম!..."

•

ট্রেন এসে দাঁড়ায় এক জায়গায়। এবার দাঁড়কাকের গলার সঙ্গে মিলে গিয়েছে মানুষের কণ্ঠস্বর। পুরুষের বুট জুতো পায়ে ভীড় ঠেলে ঠেলে ছুটে আসছে মেয়েরা, পিঠে বোঝা নিয়ে মালগাড়ীতে উঠবার সময় উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের ফর্সা উরু। কামরার যে জানলাটার কাছে কাতিয়া বসেছিল, হঠাৎ তেল-চকচকে চুড়ো-টুপি পরা একটা মাথা উঁকি দিল সেখানে। লোকটার একেবারে চোখের নীচে পর্যন্ত ঘন দাড়ির জঙ্গল ছড়িয়ে পড়েছে।

"মেশিনগান বিক্রি আছে নাকি হে?"

উপরের তাকটা থেকে একটা জোর কাশির শব্দ শোনা গেল। কে যেন ধড়-মড়িয়ে ঘুরে ফূর্তিভরা গলায় জবাব দিল সেখান থেকে ঃ

সৈন্যটি এবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় রুশচিনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তার ভুরু দুটো উঁচু হয়ে ওঠে :

"আরে এ কী, ভাদিম পেত্রোভিচ্, আপনি!" মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার।

কাতিয়ার দিকে একবার চট্ করে তাকিয়ে দেখে রুশ্চিন। কিন্তু আর কোনো উপায় তো নেই। অভ্যর্থনা জানিয়ে হাতটা বাড়িয়েই দিতে হল তাকে। হৃদ্যতার সঙ্গে হাতটা চেপে ধরল সৈনিকটি, পাশে এসে বসল। কাতিয়া বেশ দেখতে পেল রুশ্চিন যেন কেমন মিইয়ে গেছে।

"তা হলে আবার দেখা হল আমাদের!" শুকনো গলায় বলল রুশ্চিন—"তোমার চেহারার উন্নতি দেখে খুশি হলাম, আলেক্সি ইভানোভিচ্। দেখতেই পাচ্ছ কেমন তল্পিতল্পা গুটিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে!"

এবার কাতিয়া বুঝতে পারল সৈনিকটি আর কেউ নয়, আলেক্সি ক্লাসিল্নিকভ্ রুশ্চিনেরই প্রাক্তন আরদালি। ভাদিম পেত্রোভিচ্ প্রায়ই তার কথা বলত, বুদ্ধিমান আর প্রতিভাবান রুশ চাষীর নমুনা হিসাবে সুখ্যাতি করত তার। কাতিয়া ভেবে পেল না লোকটির প্রতি তার স্বামী অমন বিরূপ হয়ে উঠেছে কেন। কিন্তু ক্লাসিল্নিকভ্ বোধহয় ঠিকই ধরতে পেরেছে। হেসে একখানা সিগারেট ধরিয়ে সে নেহাত সাদামাটা নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল : "আপনার স্ত্রী বুঝি?"

"হ্যাঁ, বিয়ে করেছি আমি। এস আলাপ করিয়ে দি'। কাতিয়া, এই আমার ইষ্টদেবতাটি—তোমায় তো বলেছি ওর কথা অনেকবার। যাক্, আলেক্সি ইভানোভিচ্, তোমাতে আমাতে মিলে কত লড়াই-ই তো লড়লাম, এবার এসো তোমায় অভিনন্দন জানাই—এই নোংরা শান্তির জন্য। রাশিয়ার সেই ঈগল " (তিক্তভাবে হাসল সে)। "এখন আর কি, আমি আর কাতিয়া চলেছি দক্ষিণ-মুখো ..সূর্যের কাছাকাছি।.." (কথাগুলো নিজের কানেই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হল, ভ্রূকুটি করে উঠল রুশ্চিন। ক্লাসিলনিকভ্ লেশমাত্রও ভাবাবেগ দেখালো না) "কিছুই তো আর রইল না এখন, কৃতজ্ঞ দেশ আমাদের, পুরস্কার দিল পেটে বেয়নেট চালিয়ে। (সারা গায়ে উকুন লেগেছে এইভাবে সে শিউরে উঠতে থাকে) "বহিষ্কৃত, জনগণের শত্রু এই তো বলা হয় আমাদের "

"আপনি বড়ো কঠিন অবস্থায় পড়েছেন!"—মাথা নেড়ে বলল ক্লাসিলনিকভ। আধবোজা চোখের ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। একটা ভাঙা বেড়ার ওপাশে খোলা জায়গাটায় জড়ো হয়েছে একদল মানুষ। জায়গাটা স্টেশনেরই সম্পত্তি। বলে চলে ক্লাসিলনিকভ্ : "একজন বিদেশী এসে যেমন কঠিন অবস্থায় পড়ে তেমনি অসুবিধে হয়েছে আপনার। আমি কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছি আপনার সমস্যাটা। তবে, সবাই তা বুঝবে না। আপনি এখন পর্যন্ত দেশের মানুষকে চিনে উঠতে পারেন নি!"

"ও কথার মানে?"

"রাশিয়ার মুক্তি-সংগঠকরা" অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক আলেক্সিয়েভ আর লাভ্র্ কর্নিলভ যে কেন মুষ্টিমেয় একদল সৈন্য ও ক্যাডেট নিয়ে (সবশুদ্ধ হাজার পাঁচেক হবে) দক্ষিণের দিকে একাতেরিনোদার-এ গিয়ে উপস্থিত হলেন সেটা প্রথম নজরে বোঝা দুষ্কর। অথচ তাদের গোলন্দাজবাহিনীর অবস্থা তখন সঙ্গীন, গোলাগুলি কার্তুজ নেই বললেও চলে, তার ওপর তারা পড়ল গিয়ে বলশেভিক ফৌজের একেবারে সিংহ-গুহায়—কুবান কসাকদের রাজধানী ঘিরে তখন ওরা একটা অর্ধবৃত্ত ব্যূহ রচনা করেছে।

কোনো বাঁধাধরা সামরিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এদের ছিল বলে মনে হয়নি প্রথমে। রস্তভ থেকে ভলাণ্টিয়ার বাহিনীকে জোর করেই উৎখাত করে দেয়া হয়েছে—সেখানে দখল বজায় রাখার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। বিপ্লবের ঢেউ এসে তাদের যেন ভাসিয়ে নিয়ে গছে কুবানের স্তেপভূমিতে। কিন্তু একটা রাজনৈতিক মতলব যে এদের ছিল সেটা প্রকাশ পেল মাস দুয়েক বাদে। কসাকদের মধ্যে যারা ধনী তারা তো একদিন বহিরাগতদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই! বহিরাগতরা হল এক নতুন ধরনের অধিবাসী যারা কসাকদের জমির বাবদ খাজনা দিত বটে কিন্তু কোনো স্বত্বাধিকার ভোগ করতে পারতো না।* যেখানে কসাকদের সংখ্যা হল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ, সেখানে 'বহিরাগতেরা' এক কোটি ষাট লক্ষ।

'বহিরাগতেরা' স্বভাবতই জমি আর ক্ষমতার জন্য লড়তে বাধ্য। আর কসাকরাও তাদের নানা অধিকার বজায় রাখবার জন্য অস্ত্রধারণ করতে একই রকম বাধ্য! বলশেভিকরা 'বহিরাগত'দের নেতৃত্ব দিতে লাগল। প্রথমটায় কসাকরা তো কোনোরকম কর্তৃত্বই মেনে নেবে না। নিজের নিজের এলাকায় ওরা প্রভু হয়ে বসে থাকবেই—এর চেয়ে আলাদা কোনো ব্যবস্থা হতেই পারে না। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে একটা ব্যাপার ঘটল। গোলুবভ নামে একজন কসাক ভাগ্যান্বেষী সঙ্গে সাতাশ জন কসাক সেপাই নিয়ে ঢুকে পড়ল আতামান নাজারভের সভাকক্ষে। নভেচেরকাসক্-এর যুদ্ধ দপ্তরে তখন নাজারভের সভা চলছিল। রাইফেল উঁচিয়ে, বন্দুকের বল্টু খটখটিয়ে চীৎকার করে বলল গোলুবভ ঃ "উঠে দাঁড়া, বদমাশইগুলো! সোবিয়েত আতামান গোলুবভ এসেছে ক্ষমতা হাতে নিতে!" পরদিন আতমান নাজারভ আর তার সাগরদের শহরের বাইরে একটা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারা হল। এদিকে আতামান-প্রভুর শাসন-দণ্ডখানা হাতে নেবার জন্য গোলুবভ দু'হাজার কসাক অফিসারকে গুলি করে খতম করল; ঘোড়া ছুটিয়ে গেল স্তেপ অঞ্চলে মিত্রোফান্ বোগায়েভ্স্কি-কে বাগাবার আশায়।

---

*কসাক স্বত্বাধিকার—জমির উপর কসাকদের অধিকার সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিয়মটা হল পদমর্যাদা অনুসারে জমিহীন কসাকদের মধ্যে চিরজীবনের মেয়াদে জমি বিলিয়ে দেওয়া; ১৮৩৫ সালে জারের গভর্নমেণ্ট এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

যুদ্ধে জেতাটা তাদের পক্ষে নেহাতই বাধ্যতামূলক। আর প্রত্যেকটা লড়াইয়ের পরই রসদ-বোঝাই গাড়ী আর আহতদের নিয়ে এক একদিনে প্রকাণ্ড রাস্তা পাড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে হয় তাদের। পশ্চাদপসরণ করার কোনো সুবিধেই নেই। তাই নেহাত মরীয়া হয়ে গিয়ে সেই জোরেই কর্নিলভের সৈন্যরা যুদ্ধে জিতে ফেলে। এবারও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটছে।

রণাঙ্গনের যে রেখা বরাবর মেশিনগানের গুলিগোলা চলছে সেখান থেকে মাইল খানেক দূরে গতবছরের পুরনো একটা খড়ের গাদার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন কর্নিলভ, পা দুটো ফাঁক করে। কনুই উঁচু করে ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখছিলেন, কাঁধের উপর দুলছিল একটা ক্যানভাসের ঝোলা। ধূসর পটিলাগানো কালো ভেড়ার চামড়ার কোটটার বোতামগুলো সব খোলা। বড় গরম বোধ হচ্ছিল তাঁর। ছ্যাঁকড়া পাকা দাড়িতে ঢাকা থুতনিটা একগুঁয়ে ভঙ্গীতে উঁচিয়ে ছিল ফিল্ডগ্লাসের তলা দিয়ে।

খড়ের গাদার একদিকটা চেপে ধরে নীচে দাঁড়িয়েছিল লেফটেন্যান্ট দোলিনস্কি, কম্যান্ডারের সহকারী। যুবকটির বড়ো বড়ো চোখ আর কালো ভুরু, পরনে অফিসারের লম্বা কোট আর নক্শাকাটা চটকদার চূড়ো টুপি। উত্তেজনায় গলার ভেতরটা যেন আটকে যাচ্ছিল তার, ঢোঁক গিলে সামলে নিয়ে কম্যান্ডারের পাকা দাড়িওয়ালা থুতনিটার দিকে তাকাচ্ছিল সে—যেন ঐ ক'গাছি দাড়ির মধ্যেই লুকিয়ে আছে ওদের সব আশাভরসা, ওদের প্রাণ-ভোমরা—কত আপন আর কত কাছাকাছি!

"জেনারেল সাহেব, আপনি দয়া করে নেমে আসুন—আমার অনুরোধ।—গুলি লেগে যেতে পারে হঠাৎ।" বারে বারে কাতরভাবে মিনতি জানাতে থাকল দোলিনস্কি। ওর নজরে পড়ল কর্নিলভের বেগুনী ঠোঁট দুটো উত্তেজনায় ফাঁক হয়ে গেছে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। এর অর্থ অবস্থা খুব ঘোরালো। দোলিনস্কি আর চেয়ে দেখল না ওই দিকটাতে যেখানে বলশেভিক সারির খুদে খুদে কালো মূর্তিগুলো সচল হয়ে উঠেছে, বাদামী-সবুজ স্তেপভূমির ওপরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে তারা। ওদের মাথার উপর দিয়ে একটানা শিস্ কেটে ফেটে পড়ছে কামানের গোলা। কিন্তু দোলিনস্কি তো ভাল করেই জানে কটা মাত্র গোলা তাদের আর অবশিষ্ট আছে!—হা ভগবান্, কটা মাত্র গোলাই বা রয়েছে! পুলটা যেখানে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তারই ওপাশ থেকে বলশেভিকদের ভারী কামানের গম্ভীর 'বুম্ বুম্' আওয়াজ ভেসে আসছে। দ্রুততালে খক্ খক্ করে গর্জে উঠছে মেশিনগান। কম্যান্ডারের মাথার উপর দিয়ে অসংখ্য মৌমাছির মতো গুঞ্জন তুলে ছুটে যাচ্ছে বুলেটের ঝাঁক।

"গুলি লেগে যাবে যে, জেনারেল সাহেব!..'

কর্নিলভ ফিল্ড-গ্লাস জোড়া ছেড়ে দিলেন হাত থেকে—পাশে ঝুলতে লাগল সেটা। পাখীর মতো কালো চোখ বসানো মঙ্গোলীয় ছাঁচের রোদে-পোড়া মুখটা কুঁচকে উঠল একবার। খড়ের গাদাটার ওপর একবার পা দাপিয়ে তিনি ঘুরে

মাটির মধ্যে ডুবে যাবে সে। বড্ড মনে পড়ছে তার স্ত্রী মাত্রিয়োনার কথা। সে ছাড়া তার স্ত্রী বাঁচবেই বা কেমন করে! তার পথ চেয়ে কত অধীর প্রতীক্ষাই না করেছে মাত্রিয়োনা, তাগান্‌রগে সে লিখেছে চিঠির পর চিঠি—এস গো, একবারটি এস! মাত্রিয়োনা এখন যদি থাকতো তার কাছে, ক্ষতস্থান বেঁধে দিত, জল এনে দিত—উঃ একগ্লাস ঠাণ্ডা জল পেলে এখন কী আরামই না হত...তারপর এক ভাঁড় দই...

ক্রাসিল্‌নিকভের কানে এল অনেকগুলো গলার আওয়াজ, কারা যেন গালাগাল করছে। তার কমরেডরা তো নয়, এতো অফিসারদের গলা—সাবধানে চোখ খুলল সে। চারজন অফিসার একসঙ্গে হেঁটে চলেছে। একজনের গায়ে সিরকাশিয়ান জামা, দুজনের পরনে অফিসারদের গ্রেটকোট, আর চতুর্থজনের গায়ে 'এন্‌-সি-ও' প্রতীকচিহ্ন লাগানো ছাত্রদের ওভারকোট। রাইফেলগুলোকে বগলদাবা করে হাঁটছে ওরা শিকারীদের মতো।

"দেখ দেখ, নাবিক একটা—বেজন্মাটাকে খতম করে দাও তো!"—বলল একজন।

"ছেড়ে দাও,—মরে গেছে লোকটা। ঐ যে ওদিকের লোকটা এখনও বেঁচে আছে দেখছি।"

পরিহাস-প্রিয় সেই ভাস্‌কা ছেলেটির ভূ-লুণ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। সিরকাশিয়ান জামা-পরা লোকটা হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, "ওঠ্‌!"—সঙ্গে সঙ্গে ভাস্‌কার উপর ঝাড়ল একটা লাথি।

ক্রাসিল্‌নিকভ দেখল ভাস্‌কা উঠে বসেছে, মুখের অর্ধেকটা তার ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

"টেন্‌—শান!" —চীৎকার করে উঠেই সিরকাশিয়ান-পরা লোকটা ভাস্‌কার মুখের উপর চড় বসাল। সঙ্গে সঙ্গে চারজনই বাগিয়ে ধরল রাইফেল।

"আমায় ছেড়ে দিন খুড়ো, দয়া করে!"— কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল ভাস্‌কা।

সিরকাশিয়ান জামাপরা লোকটা এক লাফ দিয়ে সরে গেল তার কাছ থেকে। তারপর সজোরে ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে ভাস্‌কার পেটের মধ্যে গেঁথে দিল বেয়নেটের ফলাটা। ঘুরে দাঁড়িয়েই লোকটা হাঁটতে শুরু করল। অন্য তিন-জন তখন ভাস্‌কার উপব ঝুঁকে পড়ে তার বুটজোড়া টেনে খুলতে লেগেছে।

বন্দীদের গুলি করে মেরে, গ্রাম কাউন্সিলের বাড়ীতে আগুন লাগিযে ভলাণ্টিয়াররা গ্রামের মানুষদের শিক্ষা দিতে লাগল যাতে তারা আর দ্বিতীয়বার টুঁ শব্দটি না করে। তারপর তারা দক্ষিণের পথ ধরে আবার এগোতে শুরু করল। এদিকে কসাকরা গ্রামে ফিরে আসার মুখে ক্ষেতের মধ্যে ক্রাসিল্‌নিকভকে পেয়ে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে এল। সদ্য-গজানো হালকা সবুজ ঘাসের শীষে ঢাকা স্তেপভূমিকে পেছনে ফেলে ক্যাডেটদের সৈন্যরেখা নীচু দিগন্তের আড়ালে সবেমাত্র অদৃশ্য হয়েছে, এমন সময় গ্রামে ফিরে এল কসাকরা তাদের স্ত্রী-পুত্র গরুভেড়া নিয়ে।

সেমিয়ন ক্রাসিল্‌নিকভ চায়নি যে সে অজানা অচেনা একদল মানুষের

চালিয়ে যাবার। সে শুনেছে যে জার্মানরাও আসলে রুশদেরই মতো কিসান আর মজুর, তারা যুদ্ধ করছে নিজেদের রক্তচোষা বুর্জোয়া আর মেন্‌শেভিকদের পাল্লায় পড়ে। সভা-সমিতিগুলোতে নাবিকরা যেন ঘৃণায় পাগল হয়ে উঠত ঃ "হাজার বছর ধরে ওরা রশিয়ার মানুষকে প্রবঞ্চনা করছে! আমাদেব রক্ত চুষে খাচ্ছে হাজার বছর ধরে!—ঐ জমিদার আর বুর্জোয়ার দল, বিষাক্ত গোখ্‌রোগুলো!" চোখ খুলে যেত লোকের : "এইজন্যই তাহলে আমরা চিরকাল গরুভেড়ার মতো জীবন কাটিয়েছি?. .ঐখানেই তাহলে দুশমনগুলোর মাথা গুঁজবার জায়গা?" বাড়ীর জন্য সেমিয়নের মনটা ভয়ানক ছটফট করত। ছেড়ে-আসা জোতজমি, আর ঘরে তার যুবতী স্ত্রী। কিন্তু তবু সে যখন বক্তাদের কথা শুনতো, উত্তেজনায় তার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠত, অন্য সকলের মতো সে-ও বিপ্লবের মদে চুর হয়ে যেত, প্রচণ্ড নেশায় সে ভুলে বসত বাড়ীঘরের কথা, সুন্দরী মাত্রিয়োনার জন্য তার আকুল প্রতীক্ষার কথা।.....

ভাসিলি রুবলেভ নামে একজন নামজাদা আন্দোলনকারী এল পেত্রোগ্রাদ থেকে। রুবলেভ তাদের প্রশ্ন করল ঃ "তোমরা কি চিরকালই ভাঁড়ের অভিনয় করে যাবে ভাইসব? সভাসমিতিতে দাঁত খিঁচিয়েই কি খুশি থাকবে চিরদিন? কেরেন্‌স্কি অনেকদিন আগেই তোমাদের বিকিয়ে দিয়েছে পুঁজিবাদীদের হাতে। আর কটা দিন মাত্র ওরা সময় দেবে তোমাদের ঠেকিয়ে রাখবার, তারপরই প্রতি-বিপ্লবীরা শুরু করবে হত্যার অভিযান, প্রত্যেককে কচুকাটা করবে তারা। তাই ভাইসব, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই কল্‌চাকের নিকেশ করে ফেল, তোমাদের মজুর ও কিসানদের হাতে তুলে নাও নৌ-বহরের ভার।....."

পরদিন একটি যুদ্ধজাহাজ থেকে বেতারযোগে ঘোষণা করা হল ঃ "অফিসার-দের নিরস্ত্র কর!" কয়েকজন আফসার আত্মহত্যা করল, বাদবাকী সবই অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করল। প্রধান সামরিক পোত 'বিজয়ী সেণ্ট জর্জ'-এর উপরতলার ডেকে কল্‌চাক তাঁর গোটা নাবিকবাহিনীকে তলব করলেন। হাসতে হাসতে কোয়ার্টার ডেকের ওপর উঠে এল নাবিকরা। পুরো উর্দি পরে কল্‌চাক দাঁড়িয়েছিলেন 'ব্রিজ'-এর ওপর।

"নাবিক সেপাইরা!" সতীক্ষ্ণ ভাঙা গলায় চীৎকার করে উঠলেন তিনি, "সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ঘটে গেছে। জনগণের শত্রু গুপ্ত জার্মান দালালরা অফিসারদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়েছে। এমন নির্বোধ কি কেউ আছে যে সত্যি সত্যিই বলতে পারে অফিসাররা প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত পাকাচ্ছিল? মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আমি একথা আপনাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রতিবিপ্লব বলে কোনো বস্তু নেই—প্রতিবিপ্লব বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্বই নেই।"

এই পর্যন্ত বলে অ্যাডমিরাল ব্রিজের ওপর পায়চারি করতে লাগলেন। কোমরে ঝোলানো তলোয়ারটার ঝনৎকারে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মেজাজ কতটা চড়ে আছে।

"যা কিছু ঘটেছে তাকে আমি প্রধানত ও প্রথমত আমারই ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করি, তোমাদের প্রধান অফিসার হিসাবে এ-সব আমারই অপমান।

ওখানে হয়তো শোনা গিয়েছে দুএকটা ফরাসী শব্দের টুকরো, ঠাণ্ডা ভিজে বাতাসের হাত থেকে নাক বাঁচাবার জন্য দামী ফারের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন বাহারে পোশাক পরা মহিলারা। অবিশ্বাস্যরকম হালকা চিন্তা এঁদের, খালি হয়তো ভেবেছেন এখানে আর কটা দিন শীতটা কাটিয়ে তারপর যথাসময়ে ফিরে যাবেন পেত্রোগ্রাদের উজ্জ্বল নৈশজীবনে, আবার আশ্রয় নেবেন তাঁদের ফ্ল্যাটে আর অট্টালিকায় ভক্তিমান্ খ সখানসামাদের মাঝে, থামওয়ালা বসার-ঘরে, কার্পেট আর গন্‌গনে আগুনের উষ্ণ পরিবেশে। আহা, পিতার্সবুর্গ! শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ভালোভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে নিশ্চয়! বাহারে পোশাক পরা মহিলাদের দোষ দেবার আর কি আছে!

তারপর হঠাৎ,—যেন কোনো বিরাট ঘূর্ণ্যমান অভিনয়-মঞ্চের অধ্যক্ষের হাতের তালি শুনেই, অদৃশ্য হয়ে গেল সবকিছু। দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে গেল। রস্তভের রাস্তা পরিত্যক্ত, দোকানঘরগুলো ঢাকা পড়ল তক্তার আড়ালে, বুলেটের গর্তে ঝাঁঝরা হয়ে গেল জানলার শার্সিগুলো। ভদ্রমহিলারা তাঁদের ফারের জামা লুকিয়ে ফেললেন, রুমাল বাঁধলেন মাথায়। কর্নিলভের সঙ্গে পালালেন কয়েকজন অফিসার কিন্তু বাদবাকি সবাই এক নাটকীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিরীহ নাগরিকে পরিণত হলেন, কেউ অভিনেতা, কেউ ক্যাবারে-গায়ক, কেউ নৃত্যশিক্ষক, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর ফেব্রুয়ারির বাতাস এসে আবর্জনার মেঘে ঢেকে দিল প্রশস্ত রাজপথগুলো।

"বড্ড দেরিতে এসে পড়লাম আমরা" বলল রশ্‌চিন।

মাথা নীচু করে হাঁটছিল সে। তার মনে হচ্ছিল রাশিয়ার সারা দেহটিকে বুঝি হাজার টুকরোয় চুরমার করে ফেলা হয়েছে। সাম্রাজ্যের প্রহরী ওই পিতার্স-বুর্গের গম্বুজ আজ খান্‌খান্ হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে। জনসাধারণ পরিণত হয়েছে গড্ডালিকায়। মঞ্চের স্বচ্ছ পর্দার মতো মিলিয়ে গেছে ইতিহাস, অতীতের মহান্ গৌরব। আবরণ খসে বেরিয়ে পড়েছে নগ্ন, রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তর, সর্বাঙ্গে অসংখ্য কবরের ব্রণচিহ্ন নিয়ে। রাশিয়ার শেষ দিন. । রশ্‌চিনের মনে হল তার বুকের ভেতরে কি যেন একটা জিনিস ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর তারই তীক্ষ্ণ ভাঙা টুকরোগুলো বিঁধছে তার মনের সেই আজন্ম-কল্পিত অবিনশ্বর বস্তুটিতে, যাকে কেন্দ্র করে এতদিন আবর্তিত হয়েছে তার সমগ্র জীবন। কাতিয়ার পেছনে পেছনে হাঁটছিল সে, মাঝে মাঝে হোঁচটও খাচ্ছিল। ভাবছিল, রস্তভের পতন হয়েছে। রাশিয়ার যে অন্তিম ভগ্নাংশটুকু এখনও বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ কর্নিলভের ফৌজ, এবার তা'ও ধ্বংসের মুখোমুখি। সুতরাং ওরা যখন শেষ হবে তখন আর মগজে বুলেট চালিয়ে দেয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না!

এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা। রশ্‌চিনের মনে পড়ল কয়েকজন প্রাক্তন ফৌজী বন্ধুর ঠিকানা। কিন্তু তারাও সম্ভবত পালিয়েছে কিংবা মারা পড়েছে। তা হলে এখন মৃত্যু ছাড়া তো আর কোনো পথ নজরে পড়ছে না। কাতিয়ার দিকে তাকাল সে। খাটো সুতীর জ্যাকেট আর ওরেনবুর্গ শালখানা চাপিয়ে সে পরম অচঞ্চল অর অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে হেঁটে চলেছে। বড়ো বড়ো ধূসর চোখ-ওয়ালা মিষ্টি মুখখানা যেন অবাক বিস্ময়ে ঘুরে ঘুরে দেখছে ছেঁড়া আবেদনপত্র

সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটি কর্তা হয়ে বসেছে। সামান্য একটু কথা হয়েছে কি অমনি বলে উঠবে : 'কমরেড লেনিনই আমার কদর বোঝেন, তাঁকে আমি এখুনি ব্যক্তিগতভাবে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি।'...যত সব দাগী বদমায়েশগুলোকে নিয়ে ও চলফেরা করে—হরদম জবরদখল চালাচ্ছে তারা, গুলি করে মারবার জন্য ঘর থেকে মানুষ টেনে বের করছে। রাতে যে-কেনো লোককে দেখলে কাপড় খুলে নেবে। ঠিক যেন ডাকাতের মত ব্যবহার করছে লোকটা।...জঘন্য ব্যাপার! এই সব দখল-করা সম্পত্তি যাচ্ছে কোন্ ভাণ্ডারে? বিপ্লবী কমিটি নিজেরাই তো পারছে না তাকে সামলাতে, বুঝলেন কিনা! ওরা ভয় পায়...আমার মনে হয় না লোকটার কোনো নীতির বালাই আছে। শ্রমিকশ্রেণীর যা লক্ষ্য সেদিক থেকে ভাল কিছু তো করছেই না, বরং ক্ষতিই করছে সে।..." (কিন্তু এই পর্যন্ত বলে তেংকিনের মনে হল বড্ড বেশি বলে ফেলেছে, পাশ ফিরে সে হাঁচল একবার, তারপর আবার বুকের উপর রাখল হাত দুটো। আর একটি কথাও বলল না সে।)

নীরসকণ্ঠে বলল রশ্চিন : 'আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না কর্নেল। আপনার ওই ব্রয়নিৎস্কি আর তার দলবল হল প্রায় নিখাদ সোবিয়েত সোনা, সামান্য ভেজাল থাকলেও। ওদের তারিফ করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, ওদের সঙ্গে আমাদের মরণপণ লড়াই "

"কার জন্য লড়বেন শুনি?" চট্ করে জিজ্ঞেস করল তেংকিন।

"মহান্ রাশিয়ার নামে লড়ব, কর্নেল!"

"সেটা কি চীজ্ একবার বলুন তো আমায়? মাফ করবেন—নেহাৎ মূর্খের মতোই তুলছি প্রশ্নটা : মহান্ রাশিয়া যে বলছেন, সেটা কার ধারণায় মহান্? দয়া করে একটু গুছিয়ে বলুন কথাটা। মহান্ সে কি পেত্রোগ্রাদ সমাজের কাছে? তার একটা মানে হয় অবশ্য। নাকি ঐ পদাতিক রেজিমেন্টের কাছে, যেখানে আপনি আমি লড়াই করেছি, কাঁটা-তারের বেড়ায় বীরের মতো প্রাণ দিয়েছি? কিংবা হয়তো মস্কো ব্যবসায়ী সম্মেলনের কথা বলছেন আপনি? মনে আছে রিয়াবুশিন্স্কি কেমন করে কাঁদছিল বলশয় থিয়েটারে, মহান্ রাশিয়ার জন্য? সেটা হল আর এক অর্থে মহান্। আবার, বলতে পারেন একজন মজুরের কথা যে কেবল ছুটির দিন হলেই রাশিয়ার মহত্ত্ব উপলব্ধি করে, অর্থাৎ সেই চোখেই তখন সে নোংরা ভাঁটিখানা থেকে রাশিয়াকে দেখে। কিংবা ধরুন দশ কোটি কৃষকের কথা যারা..."

"কি পাগলের মতো যা-তা..." (চট্ করে টেবিলের তলা দিয়ে রুশ্চিনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয় কাতিয়া) "মাফ করবেন, কর্নেল! এই খানিক আগেও আমার জানা ছিল যে রাশিয়া হচ্ছে গোটা পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ, যেখানে মহান্ ঐতিহ্যময় একটা জাতি বাস করে।...হয়তো-বা এটা বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গী হল না।...আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে.." (তিক্ত হাসি হেসে সে অতি কষ্টে দমন করে রাখল প্রবল বিরক্তির ভাবটা)।

"আমারও ঐ একই মত। দেশের জন্য গর্ব আমারও আছে। যখন রুশ

হাতদুটো নামিয়ে কাতিয়া টেবিলের তলাকার জোড়াগুলো খুলতে থাকে) "যখন তুমি একেবারে নিশ্চিত যে তোমার বিবেকের তরফ থেকে কোনো বাধাই নেই—তখন ছুটে যাও, খুন করো, যা খুশি করো. ."

"কাতিয়া!"—কর্কশভাবে চীৎকার করে উঠে রশ্‌চিন, যেন একটা ভীষণ ঘুষি খেয়ে চমকে উঠেছে, "দয়া করে মুখটা সামলাও!"

"না থামব না! তোমায় ভালবাসি বলেই একথা বলছি। খুনী তুমি কখ্‌খনো হতে পারবে না, কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না!..."

ওদের কারুকেই সামলাবার চেষ্টা না করে তেৎকিন কেবল বিড়বিড় করে বলতে থাকল ঃ

"বন্ধুরা, আসুন না, আলাপ-আলোচনা করেই মিটিয়ে ফেলি ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত মতের মিল হবেই।"

কিন্তু মতের মিল হবার আর সময় নেই তখন। যে-প্রবল ঘৃণাটা গত কয়েক মাস ধরে জমে উঠেছিল রশ্‌চিনের মনের মধ্যে, তা এবার হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল সাংঘাতিক রূপ নিয়ে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সে ধনুকের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল কাতিয়ার দিকে। তার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে বাইরে।

"তোমায় আমি ঘৃণা করি!"—হিস্‌হিসিয়ে উঠল সে, "চুলোয় যাও তুমি আর তোমার ন্যাকা ভালবাসা! একটা ইহুদী যোগাড় করে নাও গে যাও...কিংবা বলশেভিক্‌ একটা! গোল্লায় যাও তুমি!"

রেলগাড়ীর কামরায় বসে কাতিয়া যে দীর্ণ বিলাপধ্বনি শুনেছিল রশ্‌চিনের কণ্ঠে, আজ আবার যেন সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার গলায়। মনে হচ্ছে যেন এখনই ভেঙে পড়বে সে। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন থমথমে হয়ে উঠেছে গভীর বিপদাশঙ্কায়.. (তেৎকিন এবার সত্যি সত্যিই সরে এল কাতিয়ার সামনে।) কিন্তু রশ্‌চিনের চোখদুটো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এল। ধীরে ধীরে চলে গেল সে।

হাসপাতালের খাটে বসে সেমিয়ন ক্লাসিল্‌নিকভ গম্ভীর হয়ে শুনছিল তার ভাই আলেক্সির কথা। খাটের পায়ার কাছে পড়ে আছে মাত্রিয়োনার পাঠানো উপহারের জিনিস—শুয়োরের চর্বি, পোষা মুরগী, মাংসের পুর-দেয়া পিঠে ইত্যাদি। সেমিয়ন ভালো করে দেখেও নি ওগুলো। রোগা হয়ে গেছে সে, মুখখানা শুকনো, গালে ক্ষুর পড়ে নি। অনেকদিন শুয়ে থেকে থেকে চুলগুলো এলোমেলো। হলদে সুতীর পাজামার মধ্যে তার পা দুটো রোগা রোগা দেখাচ্ছে। একটা লাল ডিম সে এ-হাত থেকে ও-হাত করছে। আলেক্সির মুখটা রোদে-পোড়া, দাড়িতে সোনালি ছোপ ধরেছে। মজবুত বুটপরা পা দুখানা অনেকখানি ফাঁক করে সে একটা টুলের ওপর বসে। খুব মিষ্টিগলায় দরদভরা প্রাণে সে কথা বলছিল ভাইয়ের সঙ্গে, কিন্তু ওর কথাগুলো যেন সেমিয়নকে মোটেই কাছে টানতে পারছিল না, তার থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল সেমিয়ন।

"যতোদিন ওই কালসাপগুলো আমাদের রক্ত শুষতে থাকবে ততোদিন বিশ্রাম নেই আমার, বিশ্রাম নেই!"

মাথা নাড়ল আলেক্সি ইভানোভিচ্। সিগারেটের ডগায় থুথু দিয়ে সেটা দু' আঙুলে চেপে নিভিয়ে ফেলল; এদিক ওদিক দেখে কোথায় ফেলবে ঠিক করতে না পেরে অবশেষে সিগারেটটাকে সে খাটের নীচেই চালান করে দিল।

"যাই হোক্, সেমিয়ন, এ হল তোর নিজের ব্যাপার, আর তুই যার জন্য লড়ছিস সেটা ন্যায়েরই লড়াই। বাড়িতে এসে দু'দিন থেকে ভাল হয়ে যা। আমি তোকে জোর করে আটকে রাখব না।"

আলেক্সি ক্লাসিল্নিকভ হাসপাতাল-বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে আসতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ইগ্নাতের। তারই দেশের লোক, প্রবীণ যোদ্ধা। দু'জনে করমর্দন করে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করে। ইগনাত জানায় 'কার্যকরী কমিটির' শোফারের কাজ করছে সে।

"একবার এসো না আমার সঙ্গে 'সলেইল্'-এ"—অনুরোধ জানালো ইগনাত, "রাতে তুমি আমার সঙ্গেই ফিরে আসতে পারবে। আজ রীতিমত একটা লড়াই হয়ে যাবে ওখানে। কমিসার ব্রয়নিত্স্কির নাম শুনেছ তো? জানি না কি ভাবে আজ সে তার কুকীর্তির কৈফিয়ৎ দেবে। তার সাঙ্গোপাঙ্গগুলো হল এক-দল গুণ্ডাবিশেষ, সারা শহরটা ওদের জ্বালায় পাগল। দুটো ইস্কুলের ছেলে, একেবারে বাচ্চা,—তাদের ধরে দিনে-দুপুরে রাস্তার ঐ কোণটায় কেটে ফেলল, অথচ কোনো কারণই নেই,—শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ল তলোয়ার নিয়ে—ব্যস্। ঐ জায়গাটায় পাহারায় ছিলাম আমিই—দেখে তো একেবারে পেট যেন গুলিয়ে গেল আমার।"

'সলেইল্' সিনেমাঘর পর্যন্ত ওরা কথা বলতে বলতেই চলে এল। ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে ওরা বাজনদারদের জায়গার পাশেই দাঁড়াবার স্থান করে নিল। পাংশু চেহারার গোল-কাঁধওয়ালা একটি লোক ছোট মঞ্চটার ওপর এপাশ-ওপাশ পায়চারি করছিল খাঁচায় আটকানো জন্তুর মতো। মাথায় এক গোছা কালো চুল। মঞ্চটার সামনেই সভাপতিদের টেবিল পাতা রয়েছে। সেখানে বসে আছেন সৈনিকের কোট-পরা একজন মহিলা, মুখখানি গোলাকৃতি; মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা একজন গম্ভীর চেহারার সৈনিক; চোখে চশমা-আঁটা শুকনো ধরনের বুড়ো শ্রমিক একজন; আর সৈনিকের উর্দিপরা দু'জন যুবক। পাংশু চেহারার সেই লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছিল। দুর্বল হাতের মুঠোখানা সে একঘেয়েভাবে শূন্যে তুলছিল করাত চালানোর ভঙ্গি করে, আর এক হাতে চেপে ধরেছিল এক বাণ্ডিল সংবাদপত্রের কাটিং।

ক্লাসিল্নিকভের কানে কানে বলল ইগ্নাত, "উনি হলেন একজন শিক্ষক—আমাদের সোবিয়েত থেকে এসেছেন।"

"আর চুপ করে থাকতে পারি না আমরা...এখন আর চুপ করে থাকা উচিতও

ব্যাপার ঘটেনি। দয়া করে পেছন দিকের ওই দরজাটা বন্ধ করে দিন তো। কমরেড ত্রিফনভ সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন। কমরেড ব্রয়নিত্স্কিকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে তাঁর বক্তব্য হাজির করবার জন্য।"

কিন্তু ব্রয়নিত্স্কি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু শণের মতো চুলওয়ালা সেই সৈনিকটি অর্কেস্ট্রার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে, বিস্ময়ে তার ঠোঁটদুটো হাঁ হয়ে গেছে।

দুর্ভেদ্য মেঘে আকাশটা ঢেকে গেছে। পনেরোই মার্চ তারিখে নভো-দ্মিত্রভ্স্কায়ার দিকে অগ্রসরমান ভলাণ্টিয়ার বাহিনী পড়ল মহাবিপদে—সামনে অপার জল থৈ-থৈ করছে, তার ওপর তরল কাদার স্রোত। দূরে দূরে একেকটা পাহাড়, সুতোর মতো সরু সরু রাস্তা, পাহাড়গুলোকে ঘিরে তারা এঁকে বেঁকে হারিয়ে গেছে কুয়াশাচ্ছন্ন প্রান্তরের মাঝে। হাঁটু অবধি জলে নেমে ওরা হেঁটে চলে, গাড়ী আর কামানের চাকা একেবারে অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে গেছে। গোড়ার দিকে যে ভিজে বরফ-ঝরা বাতাসটা বইছিল অবশেষে তা ভয়ংকর তুষার-ঝড়ের রূপ নিল।

মালগাড়ী থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল রশচিন। রাইফেল আর থলিটা গুছিয়ে নিয়ে সে চারিদিকটা চেয়ে দেখল একবার। রেল লাইনের উপর একদল সৈনিক জড়ো হয়ে চেঁচামেচি করছে। এরা সবাই ভারনাভ্ রেজিমেণ্টের লোক। কারুর পরনে লম্বাকোট, কারুর ভেড়ার চামড়ার, কয়েকজন আবার দড়ি দিয়ে কোমর বেঁধে বে-সামরিক ওভারকোটও চাপিয়েছে গায়ে। ওদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই মেশিনগান-বুলেটের বেল্ট, হাত-বোমা, রিভলবার। কেউ কেউ মাথায় দিয়েছে সাধারণ চুড়ো-টুপি, কেউ কোণাচে ধরনের ফারের টুপি, কেউ কেউ আবার ফাটকাবাজদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া বোলার-টুপিও মাথায় দিয়েছে। ছেঁড়া জুতো, ফেল্টের জুতো, ন্যাকড়া-জড়ানো পায়ে প্যাঁচপেঁচে কাদা মাড়াচ্ছে সবাই। সঙ্গীনে সঙ্গীনে গুঁতো লেগে আওয়াজ উঠছে, আর নানা এলোমেলো চিৎকার কথা-বার্তা জড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসের মধ্যে : "মিটিং-এ দেখা হবে বন্ধুরা! ব্যাপারটা আমাদের নিজেদেরই ফয়সালা করতে হবে! এ-ভাবে কসাইখানার দিকে আমাদের আর টেনে নেয়া চলবে না!"

উত্তেজনাটার কারণ হল গুজব—এসব ব্যাপারে যেমনটা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ফিলিপ্পভ্স্কায়ায় লাল ইউনিটের পরাজয়ের খবরটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ওদের কাছে হাজির করা হয়েছে। চীৎকার উঠছে : "কর্নিলভের হাতে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার ক্যাডেট, আর আমাদের দলের রেজিমেণ্টগুলোকে এক এক করে পাঠানো হচ্ছে তারই কবলে।.....এ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা, বন্ধুরা! কম্যাণ্ডারকে এখনই ধরো।"

সৈনিকেরা ছুটে যাচ্ছিল স্টেশনের দিকে। গ্রামের ঠিক পরেই স্টেশনের হাতা শেষ হয়ে মিশে গেছে কুয়াশা-ঢাকা স্তেপ-প্রান্তরের মাঝে। মালগাড়ীর দরজাগুলো অনবরত ঝপ্ঝপ্ করে বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে—রাইফেল কাঁধে নিয়ে অর্ধোন্মত্ত মানুষগুলো উৎসুক হয়ে ছুটে চলেছে একটা জায়গায়। লম্বার্ড পপ্লারের নগ্ন শাখায় দোলা দিয়ে শিস্ কেটে যাচ্ছে বাতাস। দাঁড়কাকগুলো মাথার ওপর চক্কোর দিয়ে দিয়ে ডাকছে। ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢাকা একটা বরফ-ঘরের ছাদে উঠে বক্তারা মুষ্টি আস্ফালন করে চীৎকার করছে : "কমরেডস্, কর্নিলভের দল আমাদের হারিয়ে দিচ্ছে কেন? একাতেরিনোদারের দিকে ক্যাডেটদের বিনা বাধায় যেতে দেয়া হচ্ছে কেন? কী ধরনের ফন্দী এটা? কম্যাণ্ডার আমাদের বুঝিয়ে বলুন দেখি!"

হাজারখানেক লোকের ভীড়ের মাঝখান থেকে প্রতিধ্বনি উঠল : "কম্যাণ্ডারকে চাই!" আওয়াজে ভড়কে উঠে পালিয়ে গেল একদল দাঁড়কাক। স্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রশ্‌চিন লক্ষ্য করল কম্যাণ্ডারের কুঁচকে-যাওয়া টুপিখানা অসংখ্য সচল মাথার ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে ঘাসের চাপড়া-ঢাকা বরফ-ঘরটার দিকে। পরিষ্কার করে কামানো তার রোগা ফ্যাকাশে মুখখানা আর দু'চোখের স্থিরদৃষ্টি যেন দৃঢ়সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠেছে। রশ্‌চিন এবার তার পুরনো বন্ধুকে চিনতে পারল—সার্গি সার্গিয়েভিচ্‌ সাপঝ্‌কভ।

যুদ্ধের আগে একটা সময় ছিল যখন এই সাপঝ্‌কভকে দেখা যেত "আগামী-যুগের-মানুষ" দলের হয়ে গলাবাজী করতে। সাবেকী রীতিনীতির আদ্যশ্রাদ্ধ করত সে। বুর্জোয়া সমাজে চলাফেরা করত গালে লোভনীয় প্রসাধনী রং মেখে, উজ্জ্বল সবুজ ফাস্টিয়ান কাপড়ের ফ্রককোট পরে। যুদ্ধের সময় সে অশ্বারোহী বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যোগ দেয়, বেপরোয়া গোয়েন্দাগিরি ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে নাম কিনে ফেলে, অবশেষে তাকে অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বিতীয় লেফটেন্যাণ্টের পদে উন্নীত করা হয়। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করে পেত্রোগ্রাদে চালান করে দেয়া হয়। কোনো এক গোপন সংগঠনের সদস্য এই অভিযোগে তাকে গুলি করে মারার হুকুম দেয়া হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তার মুক্তি হয়। সৈনিক প্রতিনিধিদের সোবিয়েতে তাকে কিছুকাল দেখা যায় অ্যানার্কিস্ট দলের লোক হিসেবে। তারপর আবার অদৃশ্য। অক্টোবরের শেষ দিকে তার পুনরায় আবির্ভাব হল উইণ্টার প্রাসাদ দখল করার সময়। লাল রক্ষীবাহিনীতে যে-সব নিয়মিত ফৌজী অফিসার যোগদান করেছিল সাপঝ্‌কভ তাদের অন্যতম।

ঠেলেঠুলে কোনোমতে সামলে নিয়ে সে ছাদের উপরে গিয়ে উঠল। হাতের বুড়ো আঙুল দুটো ঢুকিয়ে দিল বেল্টের মধ্যে। থুতনিটা গলার ভাঁজ পর্যন্ত নামিয়ে নিয়ে সে চারদিকটায় একবার নজর বুলিয়ে নিল। হাজারটা মাথা উৎসুক হয়ে উঁচিয়ে আছে তার দিকে।

"গলা-ফাটানো হতভাগার দল, জানতে চাও ঐ সোনার পদক ঝোলানো বেজম্মাগুলো কেন তোমাদের হারিয়ে দিল? তোমাদের এই চেঁচামেচি আর হৈচৈ-এর জন্যই!"—বিদ্রূপের টান তার কথায়, জোরে বলছে না অথচ সবাই শুনতে পাচ্ছে তার গলা : "তোমরা যে শুধু উপরওয়ালা কম্যাণ্ডারের হুকুম মানো নি তাই নয়, সামান্যতম উস্কানিতেই তোমরা যে চ্যাঁচাতে শুরু করো শুধু তাই নয়, তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে যারা ভয়-তরাসে, গুজব ছড়িয়ে বেড়ানোই তাদের পেশা। কে তোমাদের বলেছে আমরা ফিলিপ্‌পভ্‌স্কায়ায় হেরে গিয়েছি? কর্নিলভ যে বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়েই একতেরিনোদারের দিকে অভিযান চালাচ্ছে এ-কথা কে বলল তোমাদের? কে? তুমি বলেছ নাকি হে?" (সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজনের দিকে চট্‌ করে রিভলবার-ধরা হাতখানি বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল সে) "চলে এস তাহলে! সামনা-সামনি কথা হোক আমার সঙ্গে!

ওঃ—হো, তুমি নও বুঝি?" (অনিচ্ছাভরে সে রিভলবারটা পুনরায় পকেটস্থ করল) "আমাকে কি মেনি-বেড়ালটি পেয়েছ তোমরা? আমি কি বুঝি না তোমরা কেঁউ-কেঁউ করছ কিসের জন্য? তা হলে বলব কথাটা, শুনতে চাও? ফিদর ইভল্‌গিন, এক নম্বর; পাবলেঙ্কভ্‌, দুই; তেরেন্তি দুলিয়া, তিন—এরা সবাই সরাসরি গন্ধ পেয়েছিল ভাঁটিখানার, খবর পেয়েছিল আফিপ্‌স্কায়া গাঁয়ে নাকি মদের ভরা পিপে রয়েছে।..." (হেসে ফেলল সবাই। এমন-কি রশ্‌চিনও একবার কাষ্ঠহাসি হেসে ভাবল : যাক্‌ শয়তানটা দেখছি চালাকি করে পার পেয়ে গেল!) "হ্যাঁ, তবে এটা ঠিক যে এ ছোকরারা কেউই যুদ্ধ করতে পেছ-পা নয়। মদের পিপে-গুলো ধরো যদি কর্নিলভের অফিসারদের হাতে পড়তো?—তা হলে তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যেত যে আমাদের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ হলেন বিশ্বাস-ঘাতক!.....আমাদের প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হত, কি বল?" (হাসি ফেটে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আর একবার দাঁড়কাকগুলো উড়তে শুরু করল আকাশে) "আমার মনে হয়, কমরেডস্‌, এখানেই এ-ঘটনার ছেদ টানা ভাল। রণাঙ্গনের সর্বশেষে বুলেটিনটা এবার আমি পড়ে শোনাব।"

কতগুলো ইশ্‌তেহার বের করে সাপোঝ্‌কভ উচ্চকণ্ঠে পড়তে লাগল। রশ্‌চিন ফিরে চলল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকে। সেখানে একটা ভাঙা বেঞ্চির উপর বসে সে একটুকরো কাগজে ঘরে-তৈরি তামাক জড়াতে শুরু করল। হপ্তাখানেক আগে কতগুলো জাল দলিলপত্র জোগাড় করে সে লালরক্ষী বাহিনীর একটা ইউনিটে যোগ দিয়েছে। ইউনিটটা তখন রণাঙ্গনের দিকেই যাচ্ছিল। কাতিয়ার সঙ্গে সে ইতিমধ্যে যেমন-তেমন একটা বোঝাপড়াও করে নিয়েছে। তেৎকিনের সঙ্গে চায়ের টেবিলে সেই বেদনাদায়ক তর্কবিতর্কের পর সারাটা দিন রশ্‌চিন শহরে টহল দিয়ে বেড়ায়। রাতে অবশ্য কাতিয়ার কাছে ফিরে এসেছিল, কিন্তু পাছে কোনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলে এই ভয়ে কাতিয়ার দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে রীতিমত কড়া গলায় বলেছিল :

"আর একমাস কি দু'মাস এখানে থাকতে পারবে হয়তো, ঠিক জানি না কতো দিন।...আশা করি তেৎকিনের সঙ্গে এ সময়টুকু বেশ ভালোই মানিয়ে চলবে তুমি। তোমাকে এখানে রাখার খরচাটা অবশ্য আমি সুযোগ পেলেই দিয়ে দেব। দয়া করে তাকে এখনই বলে দাও যে তার হাতে পয়সা গুণেই দেয়া হবে, তার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে আসিনি আমি। ভালো কথা—কিছুদিনের জন্য আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই। "

ঠোঁট প্রায় না খুলেই কাতিয়া প্রশ্ন করে :

"ফ্রন্টে যাচ্ছ নাকি?"

"আজ্ঞে মাফ করো। সে ভাবনা আমার নিজস্ব।"

কাতিয়ার সময় কাটছিল অত্যন্ত খারাপ, অত্যন্ত শোচনীয়। মনে পড়ে এই সেদিনও জুলাইয়ের এক চমৎকার সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে সে আর রশ্‌চিন বসেছিল নেভা নদীর ধারে একটা পাথরের বেঞ্চিতে; আয়নার মতো স্বচ্ছ নদীর বুকে ছায়া

নদীর ওপারে এসে হাজির হয়েছে। রশ্‌চিনের মনে হল যেন কয়েকটি মূর্তিকেও দেখতে পাচ্ছে সে মাথা নীচু করে নদীব পাশের ঝোপগুলোর দিকে ছুটে আসতে। বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠল তার। নদীর পাড়ে খোঁড়া অগভীর পরিখার মধ্যে থেকে গলা বাড়িয়ে রইল সে।

কিনারা পর্যন্ত ছাপিয়ে ওঠা হলদে-সবুজ ঘোলা জলে দেখা যাচ্ছে একটা পুল,—জলের মধ্যে অর্ধেক তলিয়ে গেছে। প্রায় গোটা কুড়ি আবছা মূর্তি জল থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে পুলটার ওপর। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। টিলার ওপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিগোলা যেন ক্রমশই এলোমেলো আর ঘন হয়ে আসতে থাকে নদী আর পুলের ওপরে। নদীর উল্টো দিকে একটা কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘ এক অগ্নিজিহ্বা—বেশ কাছাকাছিই। রশচিন যে পরিখাটার মধ্যে গুঁড়ি মেরে পড়েছিল তার ঠিক ওপরেই ফাটলো একটা গোলা। কতকগুলো ছায়ামূর্তি,—কোনোটা কালো, কোনোটা ধূসর,—চূড়োর ওধার থেকে বেরিয়ে ছুটে চলল সেতুমুখটার ওদিকে—কখনো ওরা দৌড়চ্ছে, কখনো বা বসে পড়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলছে, কখনো গড়াচ্ছে, কখনো পড়ে যাচ্ছে। ওদের কাঁধের স্ট্র্যাপগুলো পর্যন্ত রশচিন এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

আবার গোলার বিস্ফোরণ হল। ট্রেঞ্চের ওপর আবার একটা কর্কশ কান-ফাটানো গর্জন। "ভাইসব, ভাইসব—ওঃ" কোথা থেকে ভেসে এল একটা আর্তনাদ। অসংখ্য গুলিগোলার শব্দের মধ্যে শোনা গেল একটা দীর্ণ চীৎকার ঃ "ওরা আমাদের ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করছে! পেছনে হঠে এস সবাই!"

এইবার বুঝি সেই চরম মুহূর্তটি এল, এতদিন প্রতীক্ষার পর—ভাবতে লাগল রশচিন। সটান সামনের দিকে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সে সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে। মাথার মধ্যে পাগলের মতো ঘুরপাক খেতে লাগল নানা ধরনের চিন্তা : '...রুমাল তো নেই সঙ্গে.....সার্টের ছেঁড়া টুকরো একখানা বেযনেটের মাথায়.....আর ফরাসী ভাষায় চীৎকার করতে হবে কিন্তু. .।' আচম্বিতে কে যেন ওর পিঠের ওপর প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে এসে পড়ল,—ওর গলাটা হাত দিয়ে জড়িয়ে চেপে ধরে আঙুল দিয়ে কণ্ঠনালী পিষতে লাগল আর ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করতে লাগল। রশচিন ভড়কে গিয়ে কাঁধ ফিরিয়ে দেখল একখানা রক্তাপ্লুত মুখ, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ক্‌ভাশিনের দন্তহীন মুখগহ্বরটা ব্যাদান করে আছে!—আবার এসেছে! উন্মাদের মতো বারে বারে চিৎকার করে বলছে সে :

"ও, পালিয়ে যাচ্ছিলে বুঝি ওদিকে? নিজের দলের লোকের দেখা পেয়েছ, তাই না!"

পিঠ থেকে তাকে ঝেড়ে ফেলে রশ্‌চিন টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্‌ভাশিনের আঙুল যেন সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে তার কাঁধজোড়া। নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে রশচিন ট্রেঞ্চের পাশের উঁচু মাটিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; ক্‌ভাশিনের দুর্গন্ধ ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেটটার মধ্যে সাংঘাতিকভাবে দাঁত বসিয়ে

দিল। তরল কাদার মধ্যে পিছলে যাচ্ছে তার কনুই আর হাঁটু, টের পাচ্ছিল সে। আর মাত্র হাতখানেক তফাতেই পাহাড়ের কিনারা—তারপর খাদ।

"ছেড়ে দাও!"—মরীয়া হয়ে গর্জে উঠল রশচিন। তারপর অকস্মাৎ পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন—খাদ বেয়ে দুটো দেহ জড়াজড়ি করে পড়ল নদীর মধ্যে।

কামানের গর্জনে চারিদিকটা গুম্‌গুম্‌ করতে থাকে। মাটি কেঁপে ওঠে বিস্ফোরণের শব্দে। ফৌজের প্রধান অংশটা তখন নদী পার হচ্ছে। গ্রিগরিয়েভস্কায়া গ্রাম থেকে গোলন্দাজবাহিনী তখন সেতুমুখের ওপরে গোলা বর্ষণ করছে। বরফ-ঢাকা মাঠটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে হাত বোমার টুকরোয়। নদীর মধ্যে যখনই এক-আধটা বোমা পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে ফুলে উঠছে ছোট ছোট জলস্তম্ভ।

শ্বেতরক্ষী পদাতিকরা নদী পার হচ্ছিল—দু'জন দুজন করে একেকটা ঘোড়ায় চেপে। খরস্রোতা নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েই ঘোড়াগুলো পিছনে হঠে আসে, কিন্তু তারপরেই বেয়নেটের গুঁতোনি খেয়ে এগোতে বাধ্য হয়। ঘোড়ায়-টানা একখানা কামান-গাড়ী নদীর ঢালু পিছল তট বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে আসছিল। এ-পাশে ও-পাশে দুলতে দুলতে কামানগাড়ীটা অদৃশ্য হয়ে গেল অতল জলের মধ্যে। ঘোড়সওয়ারের চাবুক খেয়ে বোগা রোগা ঘোড়াগুলো কোনোমতে পিড়মরি করে অর্ধমগ্ন পুলের উঁচু জায়গাটায় উঠতে থাকে। চারিদিকে পড়ছে কামানের গোলা, হিসহিস্‌ করে উঠছে জল। ভয়ানকভাবে ভড়কে গিয়ে ঘোড়া-গুলো পিছু হঠতে থাকে; দড়ির মধ্যে জড়িয়ে যায় ওদের পেছনের পা-গুলো।

মেশিনগান-বাহী গাড়িগুলো পুল ঘেঁষে সশব্দে গড়িয়ে পড়ছিল জলের মধ্যে। ভাসতে ভাসতে পাক খেয়ে যাচ্ছিল অসহায়ভাবে। একটা গাড়ি সম্পূর্ণ উল্টে গেল, মানুষ ঘোড়াসমেত ভেসে চলল একদিকে। প্রাণপণে চাকা আঁকড়ে ধরে হাবুডুবু খেতে লাগল মানুষগুলো। ঘূর্ণ্যমান তালগোল পাকানো এই স্তূপের ওপর আকাশ থেকে নেমে এল একটা বোমা। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ কাঠের টুকরো আর মাংসের দলা সমেত শূন্যে পাক খেয়ে উঠল একটা জলের স্তম্ভ।

একটা ছোট লোমশ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেঁটে খাটো একজন লোক নদীর ধারে লম্ফঝম্ফ দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ছোট করে ছাঁটা দাড়ি, পরনে বাদামী ফ্লানেলের জামা। লম্বা একখানা সাদা ফারের টুপি চোখ পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন। হাতের চাবুকটা ভয়ংকর ভঙ্গিতে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি তীব্র দর্পিত কণ্ঠে চীৎকার করছিলেন। ইনি হলেন জেনারেল মারকভ। নদী পার হবার সমস্ত অভিযানটা তিনিই পরিচালনা করছিলেন। মারকভের সাহস সম্পর্কে নানা অদ্ভুত কিংবদন্তী ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

মারকভ লড়াই করেছেন মহাযুদ্ধে, তাঁর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সেই ভয়াবহ যুদ্ধের বিষাক্ত বায়ু। ঘোড়ার পিঠে চড়ে চোখে ফিল্ড্‌ গ্লাস লাগিয়েই হোক, অথবা তলোয়ার হাতে সৈনিকদের পুরোভাগে থেকে যুদ্ধের ভয়ংকর খেলা পরি-

চালনা করার ব্যাপারেই হোক, সর্বত্রই মারকভ অনুভব করেন এক অনির্বচনীয় তুরীয়ানন্দ। যে কোনো আদর্শের জন্য যে কোনো শত্রুর সঙ্গেই তিনি নির্বিচারে লড়াই করতে প্রস্তুত। তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে পোরা আছে তৈরি মালের মতো কয়েকটি বাঁধাধরা সূত্র—ঈশ্বর, জার ও রাশিয়া সম্পর্কে। এগুলোই তাঁর কাছে একমাত্র শাশ্বত সত্য, আর কোনোরকম বাড়াবাড়ির ধার ধারেন না তিনি। দাবা-খেলোয়াড়ের কাছে যেমন দাবার ছক ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই, ওঁর কাছেও তেমনি সারা দুনিয়াটা সংকুচিত হয়ে গেছে এক গণ্ডীবদ্ধ এলাকায় যেখানে দাবা-বোড়ের চাল দেয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

ভয়ানক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক। নিম্নপদস্থদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার যেমন রূঢ় তেমনি উদ্ধত। ফৌজের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ভয় করে চলে, অনেকেই আবার তাঁর সম্পর্কে মনে মনে পোষণ করে তীব্র ঘৃণা—মানুষকে মানুষ বলে গণ্যই করেন না তিনি, মনে করেন দাবার ঘুঁটি। কিন্তু কী প্রচণ্ড সাহস! জানেন কোন্ চরম সংকটের মুহূর্তে জীবন নিয়ে জুয়া খেলার প্রয়োজন—যখন সারাদিন লড়াইয়ের পর জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে অধিনায়কের জুয়ার চালের ওপর, সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে থেকে তখন তিনি চাবুক আস্ফালন করে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বুলেটের ঝড়ের নীচে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল নদী পার হবার কাজ। নদী আর তটরেখা ঘিরে আবার এল তুষার-ঝড়। বাতাসের গতি বেড়ে উঠল উত্তরমুখী হয়ে। তুষারপাতের পরিমাণ বেড়েই চলল ক্রমশ। রশচিন পড়ে ছিল নদীর উঁচু ঢালের কিনারায়। তার কাঁধের হাড় স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। বন্ধুদের নজরে পড়বার আশা সে একেবারেই ত্যাগ করেছে। যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে জামার বুক থেকে কোনো রকমে খুলে নিল সামরিক চিহ্নগুলো, যেমন-তেমন করে সেগুলো পিন দিয়ে এঁটে নিল কাঁধের ওপর। টুপি থেকে ছিঁড়ে ফেলল পাঁচকোণা তারকা-চিহ্নটা। এতক্ষণ অনেক দূরে ভেসে গেছে ক্ভাশিনেব মৃতদেহ। চারিদিকে পড়ে আছে আহত সৈনিক—ওদের দিকে তাকাবারও কারো অবসর নেই এখন।

নদীটা পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথাও না থেমে ফৌজ সিধে এগিয়ে চলল নভোদ্মিত্রভ্স্কায়ার দিকে। সৈনিকদের উর্দি ঠাণ্ডায় জমাট হয়ে সেঁটে আছে গায়ে—বরফের পুরু আস্তরণে ঢেকে গেছে। ঘোড়ার খুর আর গাড়ির চাকায় কেঁপে উঠছে হিমজমা মাটি। বুট ছিঁড়ে গেছে, পায়ের ছাল চামড়া উঠে গেছে এবড়ো-খেবড়ো মাটি আর রাস্তার গর্তে পড়ে।

আহতদের মধ্যে কয়েকজন উঠে হামাগুড়ি দিয়ে চলল নদীর খাড়া পাড়ের দিকে, যেমন করে হোক আঁকড়ে ধরে থাকতেই হবে জীবনকে। কখনো কখনো পা হড়কে পেছিয়ে পড়ছিল ওরা। রশ্চিনের মনে হল যেন মাটির মধ্যে জমে গিয়েছে তার পা জোড়া। দাঁতে দাঁত চেপে সেও দাঁড়িয়ে পড়ল (কাঁধে আর পাছায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল তার, হাঁটুর হাড়টাও ভেঙে গিয়েছে), আহত সৈনিকদের পিছন পিছন সে টলতে টলতে এগিয়ে চলল। কেউ তাকে নজর করেও দেখল

নভোরোসিস্ক্-একাতেরিনোদার রেলশড়কের দিক থেকে তিনি আক্রমণ করতে পারেন এইটে প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি যে শহরের পশ্চিম দিক থেকে ওই রকম সাংঘাতিক বিপজ্জনক ঘুরপথটাই বেছে নেবেন তা কেউ কল্পনাতেই আনতে পারে নি। পুরো ফৌজ নিয়ে তিনি কুবানের ওই রুদ্র জলস্রোত ডিঙোবেন এমন একটা জায়গায় যেখানে পুল নেই, আছে একটা মাত্র পারঘাটা, অর্থাৎ পশ্চাদপসরণ করার পথ পর্যন্ত বন্ধ। কর্নিলভের এই অদ্ভুত সামরিক কর্মপন্থার কথা কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ আভ্তোনমভের লাল সদর দপ্তরের কারুর পক্ষে আগে থেকে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল। আর ঠিক এই দুর্বলতম অরক্ষিত রাস্তাটাই বেছে নিলেন ধূর্ত কর্নিলভ—দু' তিন দিন লড়াই থেকে অবসরও পাওয়া যাবে, তারপর সিধে ফৌজ নিয়ে ঢুকে পড়বেন একাতেরিনোদারের ফলবাগান আর শব্জিক্ষেতের মধ্যে।

রসদের জোগানে যে ঘাটতি পড়েছিল, আফিপ্স্কায়া রেলস্টেশন দখলে রাখার সময় তা উশুল করে নেয়া গেল। সাঁজোয়া ট্রেন থেকে গুলিবর্ষণ করছিল লাল বাহিনী, ভলাণ্টিয়াররা লাইন উড়িয়ে দিয়ে গুলির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার প্রয়াস পেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাল বাহিনীর একখানা ট্রেন থেকে মেশিনগানের বুলেট এসে ছেঁকে ধরল হামলাদারদের পাশের দিকটা। হামলাদাররা তখন বরফ-গলা জলের স্রোত পার হচ্ছিল। বড়ো বড়ো জলস্তম্ভের সৃষ্টি করে এক সারি বুলেট ছড়িয়ে পড়ল ওদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁসের মতো জলে ডুব দিতে শুরু করল ওরা, আগে মাথা তারপর গা। তারপর মাথা জাগিয়ে ছুটতে শুরু করল ওরা। আফিপ্স্কায়ায় মোতায়েন লাল সৈন্য মরীয়া হয়ে প্রতিরোধ করতে লাগল। কিন্তু শুধু আত্মরক্ষার লড়াই চালিয়ে আর কতক্ষণ রুখবে ওরা—শত্রুরাই তখন আক্রমণের উদ্যোগ হাতে নিয়েছিল।

ভলাণ্টিয়ার ইউনিটগুলো মন্থর গতিতে সাপের মতো এঁকে বেঁকে নানা পথ ঘুরে অবশেষে আফিপ্স্কায়া গ্রামটিকে একেবারে ঘেরাও করে ফেলল। উজ্জ্বল সূর্যের আলো যেন গলে পড়ছে নীল জলাজমির মধ্যে। সমতলভূমি এখানে ওখানে জেগে রয়েছে গাছের সারি, খড়ের গাদা, খামার বাড়ির ছাদ; বন্যাজলে বাসন্তী মেঘের ছায়া যেন পরস্পরকে ধাওয়া করে ছুটে চলেছে। মরীচিকার মতো এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটির মাঝে কর্নিলভকে দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে—পরনে তাঁর ভেড়ার চামড়ার ছোট জ্যাকেট, কাঁধে জেনারেলের নরম স্ট্র্যাপ, হাতে ফিল্ডগ্লাস আর একটি মানচিত্র। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের হুকুম দিচ্ছেন. জলের মধ্যে ঘূর্ণি ছিটিয়ে ওরা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যাচ্ছে। এক সময়ে গুলির আক্রমণের মধ্যেই পড়ে গেলেন তিনি; সঙ্গে ছিল জেনারেল রোমানভ্স্কি, সামান্য আহত হল সে।

পশ্চিম দিক থেকে রেলস্টেশন আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোদস্তুর আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। কর্নিলভ ঘোড়া চাবুকে সিধে আফিপ্স্কায়ার মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁরই জয় যে সুনিশ্চিত এ সম্পর্কে একমুহূর্তের জন্যেও কোনো

সন্দেহ তাঁর মনে আসে নি। রেললাইনের ওদিকটায় পরিত্যক্ত ট্রেন, স্টেশনবাড়ি, মালগুদাম আর ব্যারাকঘরগুলোর মাঝে মাঝে লড়াই চলতে লাগল—ফাঁদের মধ্যে পেয়ে লাল রক্ষীদের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগল ভলাণ্টিয়ার বাহিনী।

এই হল ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর সর্বশেষ জয়—চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ে অর্জিত।

মৃতদেহগুলো ডিঙিয়ে কর্নিলভের কাছে লাফিয়ে ছুটে আসে কর্নেল নেঝেন্‌ৎসেভ। গালগুলো লাল হয়ে উঠেছে। যুবকের মতো দেখাচ্ছে তাকে, ফূর্তি যেন উপচে পড়ছে। প্যাঁশনের কাঁচজোড়া ঝিলমিলিয়ে উঠল। রিপোর্ট করল :

"আফিপ্‌স্কায়া স্টেশন দখলে এসে গেছে, জেনারেল সাহেব।"

অধৈর্য কণ্ঠে কর্নিলভ তাকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"রসদ কাড়তে পেরেছ ওদের?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, জেনারেল সাহেব! সাত শো গোলা, চার গাড়ি বোঝাই ছোট-খ'টো অস্ত্রশস্ত্র আর গুলিবারুদ।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" বিনয়াবনত ভঙ্গিতে তিনি মাথার ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন, কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে শক্ত কোটের ওপরটা চুলকে নিলেন একটু। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ....."

নেঝেন্‌ৎসেভ্‌ চোখ ঘুরিয়ে দেখাল স্টেশনের দিকটা—একদল 'শক ফাইটার' জটলা করছিল সেখানে। ওরা হল ভয়ডরহীন সংশপ্তকদের একটা বিশেষ রেজিমেণ্ট। প্রত্যেকের উর্দির হাতার ওপর সেলাই করা তেরঙ্গা চৌকো সামরিক চিহ্ন। রাইফেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওরা, যেন দুরারোহ পাহাড়ে ওঠার পর একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। মুখে ওদের রাগ ফুটে উঠেছে, চোখ ঘুরছে, হাতে রক্তের ছাপ, কারো কারো মুখও রক্তমাখা।

"দু' দু'বার ওরা আসন্ন বিপদকে ঠেকিয়েছে, জেনারেল সাহেব। আর ছুটে এসে ঢুকেছেও ওরা সবার প্রথম!"

"তাই নাকি!" ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকালেন কর্নিলভ, পূর্ণ গতিতে ছুটে গেলেন 'শক্‌' পল্টনদের মাঝে। অবশ্য দূরত্বটা এমন কিছু বেশি ছিল না। চঞ্চল হয়ে উঠল গোটা দলটা। তৎক্ষণাৎ ওরা সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নাটকীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কর্নিলভ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন স্মৃতিস্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান ঘোড়সওয়ারের মতো। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন ঃ

"আমার ঈগলপাখীর দল. তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। যে চমৎকার কীর্তি তোমরা আজ দেখালে তার জন্য তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি শত্রুর রসদ কেড়ে নিতে পেরেছ বলে।.....কৃতজ্ঞতায় আমি মাথা নোয়াচ্ছি তোমাদের সামনে।..... " প্রত্যেকটা কথা যেন তিনি ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে বের করলেন গলা থেকে।

রসদের এক নতুন জোগান হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভলাণ্টিয়ার বাহিনী কুবান নদী পার হতে শুরু করল। অশ্বারোহী একটা ইউনিট আগেই এসে তক্তার

একটি ফেরী-নৌকা দখল করে নিয়েছিল। সেই ফেরীতেই তারা পার হতে শুরু করল। ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা তখন ন'হাজার, সঙ্গে চার হাজার ঘোড়া। তিনদিন ধরে নদী পেরুনো চলল। পারঘাটার এ পাশ থেকে ওপাশ বিরাট ক্যাম্প সাজিয়ে বসেছে পল্টনেরা, গাড়ী-ঘোড়া, কামান-বন্দুকের স্তূপ আর রসদ সঙ্গে নিয়ে। কাপড়-চোপড় কেচে শুকোতে দেয়া হয়েছে ঘোড়ার গাড়ির জোয়ালের ওপর —বসন্তের বাতাসে তাই উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। ক্যাম্পের আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘোড়াগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চরে বেড়াচ্ছে মাঠে। পেটমোটা অফিসাররা লাফিয়ে উঠছে গাড়ির ওপর, চোখে ফিল্ডগ্লাস লাগিয়ে তারা আকাশের নীল দিগন্তে খুঁজছে বহু-আকাঙ্ক্ষিত শহরটির ফলবাগিচা আর গির্জার চূড়োগুলো।

"মাইরি বলছি, আমরা যেন ধর্মযোদ্ধার দল, জেরুজালেম শহরে ঢুকতে যাচ্ছি!"

"হ্যাঁ, তবে জেরুজালেমে ছিল ইহুদী ছুঁড়িগুলো আর এখানে সব প্রলেতারিয়ান-সুন্দরী।"

"আমরা কিন্তু মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করব!..... হাঃ হাঃ হাঃ ....."

"স্নানের ঘর, পার্ক, বীয়ারের দোকান, আর কি চাই!"

একাতেরিনোদারের তরফ থেকে কেউ নদী পার হবার পথে বাধা দিতে চেষ্টাই করল না। মাঝে মাঝে শুধু স্কাউটরা ফাঁকা গুলি চালাচ্ছিল। শহর রক্ষা করবে মনস্থ করেছিল লাল বাহিনী। শহরের সমস্ত মানুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ছুটল পরিখা খুঁড়তে, কাঁটা তারের বেড়া আর কামান পাতার কাজে। কৃষ্ণ-সাগরীয় নাবিকদের একটা পল্টনবাহিনী বন্দুক গোলাবারুদ সমেত এসে হাজির হল নভোরোসিস্ক্‌ থেকে। কর্নিলভের ভলাণ্টিয়ারবাহিনীর শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে পল্টনদের বুঝিয়ে বললেন কমিসাররা। ওরা হল "নির্মম বিশ্ব-পুঁজিবাদীচক্রের দালাল, আর এই পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধেই আমরা অবিশ্রাম লড়াই চালাচ্ছি, কমরেডস্‌।" ওরা প্রতিজ্ঞা করল মরবে তবু একাতেরিনোদার ছাড়বে না।

অভিযানের চতুর্থ দিনটিতে ভলাণ্টিয়ার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল কুবানের রাজধানীর ওপর।

ভলাণ্টিয়ারদের প্রচণ্ড আক্রমণের পাল্টা গোলাবর্ষণ শুরু হল। কৃষ্ণ-সাগর রেলস্টেশন আর কুবান পারঘাটার কামানগুলো থেকে ঝড়ের মতো অগ্নিবৃষ্টি চলল। কিন্তু এবড়ো-খেবড়ো জমি আর ফলবাগান, নালা, বেড়া, খাল ইত্যাদি থাকার ফলে আক্রমণকারী ভলাণ্টিয়াররা গা-ঢাকা দিয়ে শহরে এসে পেঁছুতে পারল—ক্ষতি তাদের পোয়াতে হল সামান্যই।

এইবার শুরু হল লড়াই। 'খামার' নামে পরিচিত একটি সাদা বাড়ীর কাছে লাল বাহিনী অমিত বিক্রমে বাধা দিল। বাড়ীটা ছিল কুবান নদীর উঁচু পাড়ে একটা নির্জন নিস্তব্ধ পপলার বাগানের একেবারে কিনারায়। লাল বাহিনী প্রথমবার হঠে গেলেও আবার ছুটে এল বিপুল সংখ্যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর

"গোলাবারুদের ব্যারাকঘরগুলো.....আক্রমণ করো.....জেনারেল সামনেই রয়েছেন, ওই দিকে....."

একটা টিলার দিকে হাত দেখালো সে। গুটিকয়েক মানুষ সেখানে আসা-যাওয়া করছিল, একজনের মাথায় উঁচু ফারের টুপি। বাতাস কাঁপিয়ে আদেশ এল :

"লাইনস্.....ফরওয়ার্ড!"

রশ্‌চিনের গলা যেন বন্ধ হয়ে এল, চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল; শঙ্কা আর তীব্র আনন্দের একটা লহমা,— রশ্‌চিন অনুভব করল যেন সেই এক লহমার বিহ্বলতায় তার সর্বশরীর নিষিক্ত হয়ে যাচ্ছে, একটা সুতীব্র বাসনা জেগে উঠছে তার মনে, ছুটে চলে যাও, চীৎকার করে ওঠো, চালাও গুলি, সঙ্গীন দিয়ে গেঁথে ফেলো; আকাঙ্ক্ষা জাগছে—রক্তে টৈটম্বুর হয়ে উঠুক তার কল্‌জেখানা, এ-কল্‌জে সে বলি দেবে.....।

প্রথম সারিটা এগিয়ে গেল সামনে। রশ্‌চিন ছিল তারই বাঁ পাশে। টিলার ওপর দেখা যাচ্ছে মারকভকে, অগ্রসরমান রেজিমেণ্টের দিকে তাকিয়ে তিনি পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন।

"এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, বন্ধুরা!"—সমানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন তিনি। স্বাভাবিক মিটমিটে চোখদুটো যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে এখন...বড়ো ভয়ানক...।

মাটির ওপর জেগে-ওঠা শুকনো ঘাসের শীষগুলো এবারে নজরে পড়ল রশ্‌চিনের। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে সর্বত্র বস্তার মতো শুয়ে আছে সৈনিকের উর্দি-পরা, নাবিকের জ্যাকেট ও অফিসারের লম্বাকোট-পরা নিশ্চল দেহগুলো, কোনোটি পড়ে আছে সটান লম্বা হয়ে, কোনোটি কাত হয়ে। রশ্‌চিনের সামনেই ওয়াট্‌ল্‌ লতার নীচু বেড়া, আর পাতাহীন কাঁটাগাছের ঝোপ। সৈনিকের খাটোজামা-পরা একজন লম্বা-মুখো লোক বসেছিল বেড়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, মাঝে মাঝে সে মুখটা খুলছিল আর বন্ধ করছিল।

বেড়া ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ল রশ্‌চিন। নজরে এল একটা চওড়া রাস্তা। দ্রুতবেগে অনেকগুলো ধূলিস্তম্ভ এগিয়ে আসছিল রাস্তা বেয়ে। বলশেভিকরা মেশিনগান চালাচ্ছে হামলাদারদের লক্ষ্য করে। মাঝপথেই থেমে পড়ল রশ্‌চিন, পেছিয়ে এসে নিঃশ্বাস নিয়ে একবার ফিরে তাকাল পিছন দিকে। যারা লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে-ছিল সবাই শুয়ে পড়ছে মাটিতে। রশ্‌চিনও ওদের পথ ধরল, গালটা ঠেকিয়ে রাখল থোঁচা-থোঁচা ঘাসওয়ালা মাটির ওপর। একবার সে জোর করেই মাথাটা তুলবার চেষ্টা করল। গোটা সারিটাই শুয়ে পড়েছে। প্রায় পঞ্চাশ পা দূরে মাঠের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা মাটির ঢিবি, পাশেই খোঁড়া হয়েছে পরিখা। রশ্‌চিন লাফিয়ে উঠে মাথা নীচু করে ছুটে গেল পরিখাটার দিকে। বুকটা ভয়ানক ঢিপ্‌-ঢিপ করছিল। পরিখার প্যাঁচপেঁচে কাদার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। রশ্‌চিনের পেছনে পেছনে গোটা সৈন্যসারিটাই চলে এল একের পর এক। দু'একজন পথেই ধরাশায়ী হল। পরিখার মধ্যে গা এলিয়ে দিয়ে সবাই হাঁফাতে লাগল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে তখন বুলেট উড়ে চলেছে।

কিন্তু হঠাৎ সামনে কী একটা পরিবর্তন ঘটল—কোথা থেকে যেন ওদের পাশ কেটে কামানের গোলা গিয়ে পড়তে লাগল ব্যারাকঘরের দিকে। মেশিনগানের গুলি-বর্ষণ স্তিমিত হয়ে এল।

অতিকষ্টে পরিখা থেকে উঠে সৈন্যরা সামনের দিকে এগোতে লাগল। রশ্‌চিন দেখল তার নিজের লালচে-কালো ছায়াটা এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর দিয়ে পিছলে সরে যাচ্ছে, ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে তার আকৃতিটা, কখনো কুঁচকে ছোট হয়ে যাচ্ছে, কখনো অনেকদূর পর্যন্ত লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। রশ্‌চিন ভাবল, 'কি অদ্ভুত! এখনো বেঁচে রয়েছি আমি, ঐ তো আমার ছায়াটাও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।'

ও তরফ থেকে আবার জোরালো হয়ে উঠল গুলিবর্ষণ। কিন্তু ব্যারাক থেকে মাত্র একশো হাত দূরে একটা গভীর খাদের মধ্যে এখন এসে গেছে রশ্‌চিনরা। দলের লোক অবশ্য ক্রমেই কমে যাচ্ছে সংখ্যায়। কর্দমাক্ত খাদটার মধ্যে এ-পাশ ও-পাশ পায়চারি করছিলেন মারকভ। চোখ দুটো তাঁর ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

চেঁচিয়ে বলছিলেন তিনি : "ভদ্রমহোদয়গণ! একটু নিঃশ্বাস ফেলবার সময়.....একবার শেষ চেষ্টা.....কিছুই নয়, এই সামান্য কয়েক পা রাস্তা....."

রশ্‌চিনের পাশেই একজন বেঁটে টাক-মাথা অফিসার। খাদটার ওপর বিস্ফোরিত বুলেটের ধোঁয়া উঠতে দেখে সে ক্রমাগত একই ভাষায় গালাগাল করে যাচ্ছিল চাপা গলায়। কয়েকজন সৈনিক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে পড়েছিল। একজন পা মুড়িয়ে বসে কপালের রগ চেপে ধরে রক্তবমি করছিল। খাঁচায় আটকানো হায়েনার মতো খাদটার তলায় এ-পাশ ও-পাশ পায়চারি করছিল অনেকে। হুকুম এল : "আগে বাড়ো!" কেউ যেন শুনতেই পেল না কথাটা। সারা শরীরে একটা খিঁচুনির ভাব করে রশ্‌চিন তার বেল্টটা এঁটে নিল। কাঁটাঝোপের ডাল-পালা ধরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করল একবার। পিছলে পড়ে গেল, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে আবার এগিয়ে গেল। অবশেষে যখন একেবারে মাথায় গিয়ে উঠল, দেখল মারকভ সেই খাদটার একেবারে কিনারায় বসে চেঁচাচ্ছেন :

"এগিয়ে গিয়ে হামলা করো! যাও!"

কয়েক গজ সামনেই রশ্‌চিন দেখতে পেল মারকভের চক্‌চকে বুটের তলা, এমন-কি তার ফুটোগুলোও নজরে পড়ল তার। কয়েকজন লোক তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে। অস্তগামী সূর্যের কিরণে ঝলমলিয়ে উঠেছে ব্যারাকঘরের ইটের দেয়াল। জানলায় লেগে-থাকা কাঁচের ভাঙা টুকরোগুলো রাঙা হয়ে উঠেছে। দু'একটা মূর্তিকে দেখা যাচ্ছে ব্যারাক ছেড়ে মাঠ পেরিয়ে ছুটে পালাতে। দূরের ছোট ছোট বাগানওয়ালা কুঠুরিঘরগুলোর মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে ওরা।

গোলন্দাজ ব্যারাকের বালিভরা আঙিনাটার মধ্যে একটা ভাঙা ব্যায়াম-সরঞ্জামের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল একদল বেসামরিক নাগরিক ও কয়েকজন সৈনিক। ওদের মুখ ফ্যাকাশে, পরিশ্রান্ত, চিন্তাচ্ছন্ন। চোখ নীচু করে নিস্পন্দ অসাড় হাতগুলো দু পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে ওরা। ওদের মুখোমুখি রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা ক্ষুদ্রতর দল। এরা সবাই অফিসার। দীর্ঘকালের সঞ্চিত এক

ঘৃণা নিয়ে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। দুটো দলই নির্বাক হয়ে কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করছে। হঠাৎ ক্যাপ্টেন ফন মেক্ এগিয়ে গেল ক্ষিপ্র গতিতে (রশ্চিন তাকে চিনতে পেরেছে : খুনীর মতো বিনিদ্র-চোখ সেই লোকটি)। বন্দীদের সামনে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে গিয়ে হাজির হল সে। "সবগুলোকেই" —উল্লসিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল সে : "সকলের জন্যই এ হুকুম...অফিসারদের মধ্যে থেকে দশজন এগিয়ে আসুন তো সামনে..."

বন্দুকের বল্টু খটখটিয়ে দশজন অফিসার সামনে এগিয়ে আসার আগেই বন্দীদের মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা গেল। চওড়া-বুকওয়ালা ঢ্যাঙা মতো এক-জন বন্দী জামাটা মাথার ওপর টেনে তুলল। দাঁতহীন, কালো সোজা গোঁফওয়ালা আরেকজন সাধারণ নাগরিক, দেখলে মনে হয় ক্ষয়রোগে যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তার বুকটা, চেঁচিয়ে উঠল ভাঙা গলায় :

"মজুরদের রক্ত শুষে খাস্, পরগাছার দল!"

ওরা দুজন পরস্পরকে সজোরে আলিঙ্গন করে রইল। একটা ঘ্যাঁসঘেসে গলা বেসুরোভাবে গেয়ে উঠল গান :

"জাগো, বন্দী যারা....."

দশজন অফিসার কাঁধে ঠেকিয়ে নিল রাইফেলগুলো। রশ্চিনের হঠাৎ যেন মনে হল কে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল সে। (একটা বাক্সের ওপর বসে তখন সে পায়ের বুট খুলতে ব্যস্ত)। এক-জোড়া চোখ (মুখটা নজরে পড়ে নি রশ্চিনের), একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে, দৃষ্টিতে মুমূর্ষুর তিরস্কার, কী যেন একটা বিশাল তাৎপর্য লুকিয়ে আছে সে দৃষ্টিতে। 'ধূসর চোখ—হা ভগবান! ও চোখ যে আমার কতো আপনার, কতো আদরের!'

"ফায়ার!"

একের পর এক তড়বড় করে চালিয়ে দেওয়া হল গুলি। শোনা গেল গোঙানি আর চীৎকার। রশ্চিন তখন মাথা নীচু করে নোংরা এক ফালি ন্যাকড়া দিয়ে পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধছে—লড়াইয়ের সময় বুলেটে ছড়ে গিয়েছিল জায়গাটা।

প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনেও ভলান্টিয়ার বাহিনীর কোনো জিতই হল না। ডানদিকটাতে তারা গোলন্দাজ ব্যারাক দখল করলেও, রণাঙ্গনের মাঝখানটায় এক পা-ও এগোতে পারেনি। সেই অংশটাতে কর্নিলভ বাহিনী একজন সেরা কম্যাণ্ডারকে হারিয়েছে—সে হল কর্নিলভের প্রিয়পাত্র কর্নেল নেঝেন্ৎসেভ। বাঁদিকে এরদেলির ঘোড়সওয়ারবাহিনী ক্রমাগতই পশ্চাদপসরণ করছিল। অভূতপূর্ব প্রতি-রোধের পরিচয় দিচ্ছিল লালবাহিনী, যদিও তখন একাতেরিনোদারের প্রায় ঘরে ঘরে আহত মানুষের ভীড়। ট্রেঞ্চের কাছে কিবা রাস্তায় অসংখ্য নারী ও শিশু প্রাণ দিয়েছে। আভ্তোনমভের বদলে যদি আর কোনো সদক্ষ অধিনায়কের হাতে লাল পল্টনদের সংগঠিত করে পূর্ণ সর্বাত্মক আক্রমণ চালাবার ভার দেয়া হত, তা হলে

ঘন করে নিজের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তার দিকে। সেমিয়ন জবাব দিল ঃ

"তোমরা গাঁয়ের মানুষ তো দিব্যি আছ, তাই না?"

খোলামেলা নতুন চুণকাম-করা বাড়ীটার মধ্যে ঢুকতে সেমিয়নের মনটা বেশ খুশিই হয়ে উঠল। ছোট ছোট জানলায় সবুজ খড়খড়ি; একটা নতুন গাড়িবারান্দাওয়ালা ফটক; কতোকালেব চেনা সেই নীচু দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সেমিয়ন যেন তাজ্জব হয়ে যায়, এমন স্বাচ্ছন্দ্য আর সাচ্ছল্যের পরিচয় সবকিছুর মধ্যে—চুণকাম-করা উষ্ণ চুল্লী, শক্ত টেবিলটা ছুঁচের কাজ-করা কাপড় দিয়ে ঢাকা, তাকের উপরের থালা-বাসনগুলোর মধ্যে আর গেঁয়ো ছাপ নেই, তার বদলে কোনোটা নিকেল-করা, কোনোটা চীনামাটির তৈরি, মাত্রিয়োনার শোবার ঘরে লোহার খাট সাজানো, লেসের কাজ-করা লেপ দিয়ে ঢাকা, তোষকের উপর পাহাড় করা ফুলো ফুলো বালিশ। আর ডান দিকটায় আলেক্সির ঘর (মৃত্যুর আগে ওদের বাপ থাকতেন ঐ কামরাটায), দেয়ালে ঝুলছে লাগাম-জিন, চক্‌চকে নতুন ঘোড়ার-সাজ, একটা তলোয়ার, একটা বাইফেল আর ফ্রেম-বাঁধাই আলোক চিত্র খানকয়েক। তিনটে কামরাই সযত্ন-লালিত ফুলের টব, রবার গাছ, আর মনসা গাছ দিয়ে সাজানো।.....আঠারো মাস বাইরেবাইরেই কাটিয়েছে সেমিয়ন, আর আজ! টবের গাছ, রাজকন্যার যুগ্যি খাটপালঙ্ক, আর শহুরে কোট গায়ে দিয়ে মাত্রিয়োনা স্বয়ং!

"তোমরা দেখছি রাজার হালে থাকো!" বলল সেমিয়ন একটা বেঞ্চ টেনে নিয়ে। গলায় জড়ানো স্কার্ফটা খুলতে তার বেশ কষ্টই হচ্ছিল। মাত্রিয়োনা নিজের চমৎকার কোটখানা খুলে বাক্সে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর এপ্রনটা বেঁধে নিয়ে টেবিলঢাকা কাপড়টা উলটো দিকে ঘুরিয়ে চট্‌পট্‌ সাজিয়ে ফেলল টেবিল। প্রকান্ড চিমটেখানা চুল্লীর মধ্যে চালিযে দেবার সময় সেটার ভারে যেন নুয়ে পড়ছিল মাত্রিয়োনা, কনুই পর্যন্ত খোলা, টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে মুখখানা। বর্শ্‌-এর লোহার পাত্রটা টেনে বার করল চিমটে দিয়ে। টেবিলে ইতিমধ্যেই এসে গেছে চর্বি, ভাপে-সেদ্ধ হাঁসের মাংস আর শুঁটকি মাছ। মাত্রিয়োনার চক্‌চকে চোখজোড়া ঘুরল আলেক্সির দিকে, আলেক্সি চোখ টিপে কি ইশারা করতেই মাত্রিয়োনা কলসী-বোঝাই সামোগন এনে হাজির করল।

দু'ভাই বসেছে টেবিল ঘেঁষে। আলেক্সি প্রথম গ্লাসটা ভাইয়ের হাতে তুলে দিল। মাত্রিয়োনা মাথাটা ঝোঁকালো আদবমাফিক। সেই গলা-জ্বলানো নির্জলা স্পিরিটটুকু গিলবার সময় সেমিয়নের যখন প্রায় দম আটকে যাবার অবস্থা, আলেক্সি আর মাত্রিয়োনা তখন তার দিকে তাকিয়ে চোখ মুছছে। সেমিয়ন আজ বেঁচে ফিরে এসে আবার ওদের সঙ্গেই এক টেবিলে বসেছে, এ যে কতো আনন্দের!

বর্শ্‌-টুকু ওরা প্রায় শেষ করে এনেছে। আলেক্সি বলল ঃ "রাজার হালে থাকি সে কথাটা হয়তো ঠিক নয় ভাই, তবে আরামেরও অভাব নেই।"

মাত্রিয়োনা এঁটো প্লেটগুলো সরিয়ে ফেলল, তারপর এসে বসল স্বামীর কাছ ঘেঁষে।

আলেক্সি তখন বলে চলেছে "জগলের কাছে সেই জমিটার কথা মনে আছে তো? সেই প্রিন্সের সম্পত্তি? সেই যে গো চমৎকার মাটি জায়গাটার? গাঁয়ের মধ্যে খুব একচোট লাগিয়ে দিয়েছিলাম যা হোক, চাষীদের জন্য ছ' ছ' বার্লাত সামোগন আমি একাই জোগান দিয়েছি, আর ওরাও আমার ভাগেই ছেড়ে দিল জমিটা। তারপর তো আমি আর মাত্রিয়োনা মিলে চাষবাস করছি ওতে। তা, গতবার গরমের সময় নদীর ধারের জমিটা থেকে তো বেশ ভালই ফসল পেয়েছিলাম। আর এই যে সব দেখছ—বিছানা, আয়না, কফির পেয়ালা, চামচে, কাঁটা, আরও সব এটা-সেটা নানান্‌টা—সবই কিনেছি এই শীতে। মাত্রিয়োনার মতো অমন গিন্নী আর দুটি পাবে না। হাটবারের দিন সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। আমি তো সেই পুরনো কায়দাই ধরে বসে আছি—টাকা ফেল, মাল উঠিয়ে নিয়ে যাও। ও কিন্তু তা নয়! এই একটা শুয়োর জবাই করল, কি ধর ঝটপট দুটো মুরগি মারল, অমনি উঠল গিয়ে গাড়িতে, এক বস্তা ময়দা, আর আলু সঙ্গে নিয়ে ছুটল শহর বলে.....আর, বাজারের দিকে তো যাবে না ও, যাবে সিধে সাবেক বড়োলোকগুলোর বাড়ি, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের বলবে—পালঙ্কটার বদলে দু' পুড ময়দা আর ছ' পাউন্ড চর্বি দিতে পারি...আর বিছানার ঐ চাদরটার জন্য পাবে এক বস্তা আলু...। যেভাবে বাজার করে বাড়ি ফিরতাম আমরা, একবার দেখতে যদি! হাসতে হাসতে পিলে ফাটতো তোমার।—সাক্ষাৎ জিপসী যাকে বলে—গাড়ি বোঝাই রাজ্যের ওঁচা মাল নিয়ে বাড়িমুখো!"

মাত্রিয়োনা স্বামীর হাতটা চেপে বলল ঃ

"আমার সেই মামাতো বোন আভ্‌দোতিয়ার কথা মনে আছে তো? আমার চেয়ে বছরখনেকের বড়ো হবে। ওকে আমরা আলেক্সির সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছি।"

আলেক্সি হেসে উঠে পকেট হাতড়াতে থাকে।

"আমাকে বাদ দিয়েই ছুঁড়িগুলো বন্দোবস্ত করেছে, বুঝেছ? তা তুমি তো জানো ভাই, বিধবা থেকে থেকে একেবারে হয়রান হয়ে উঠেছি। মদ ওড়ান আর মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করা,—তারপর? খালি মনে হবে যেন কতো ময়লাই লেগে আছে সর্বাঙ্গে..."

পকেট থেকে একটা থলি আর পোড়ে-খাওয়া পাইপ বের করল আলেক্সি। পাইপটার গায়ে ঝুলছে তামার শিকলি। ঘরে-তৈরি তামাক ভরে নিয়ে আলেক্সি টানতে শুরু করল, সারা ঘরটা ভরে উঠল ধোঁয়ায়। সেমিয়নের মাথা ঘুরছিল বকবকানি শুনে আর সামোগনের ঝোঁকে জায়গায় বসে বসে সে খালি শুনছিল আর অবাক হচ্ছিল।

বিকেলের দিকে মাত্রিয়োনা তাকে স্নান-ঘরে নিয়ে গেল। বেশ করে সাবান মাখিয়ে বাষ্প-স্নান করিয়ে মাত্রিয়োনা ওর সারা দেহ কচি ডালের গোছা দিয়ে রগড়ালো। তারপর ভেড়ার চামড়ার কোট দিয়ে তাকে ঢেকে নিয়ে এল ঘরে।

আবার তারা সবাই মিলে বসল টেবিলে, সান্ধ্য আহার হয়ে যাবার পর সামোগনের কলসীটা নিঃশেষ করল তারা, একেবারে শেষ ফোঁটাটি অবধি। সেমিয়নের ক্লান্তি এখনও কাটে নি। বৌয়ের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তার উষ্ণ বাহুর বেষ্টনে। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো সমস্ত ঘরখানিই মনে হল ওর কাছে উষ্ণতায় ভরা আর তক্‌তকে সাজানো। মাত্রিয়োনা বসে একতাল ময়দা ঠাসছে—খুশির হাসিতে ঝিকমিকিয়ে উঠছে তার চোখের কিনারা আর সাদা দাঁতের সারি। বসন্তের রোদ এসেছে চকচকে পরিষ্কার জানলার কাঁচ গলে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রবার গাছের পাতাগুলো। বিছানায় বসেই সেমিয়ন আড়মোড়া ভেঙে নিল পা-জোড়া টান-টান করে ঃ মাত্রিয়োনার একদিন একরাতের সাহচর্যেই তার শরীরের অনেকটা উন্নতি হয়েছে, বেশ বুঝতে পারল সে। পোশাক বদ্‌লে, হাতমুখ ধুয়ে একবার খোঁজ নিল দাদার দাড়ি কামানোর ক্ষুরটা কোথায় থাকে। আলেক্সির ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে, সামনে একটা ভাঙা আয়নার টুকরো রেখে সে কামিয়ে নিল দাড়িটা। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে ফটকটার কাছে দাঁড়াতেই পাশের বাড়ির বাগানে বসে থাকতে দেখল একটি বুড়োকে। নমস্কার জানালো সে। বুড়ো আজকের লোক নয়, চারজন জারকে দেখেছে সে। বেশ কেতাদুরস্তভাবেই মাথা ঝুঁকিয়ে টুপি খুলে পালটা নমস্কার জানালো বুড়ো। ফেল্ট্‌বুটের মধ্যে ঢোকানো পা-জোড়া সামনের দিকে ছড়িয়ে বসেছে সে, লাঠির ওপর শিরা-ওঠা হাতদুটো ভাঁজ করে রেখেছে বেশ ছন্দোবদ্ধভাবে।

পরিচিত রাস্তাটা এই সময় একেবারে নির্জন। এক কুটির থেকে আরেক কুটিরের মাঝে দেখা যায় সুদূরবিস্তৃত সবুজ ঘেসো জমির ফালি। এখানে ওখানে একেকটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া-লাগামহীন খালি গাড়ি, দিগন্তের আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে তাদের অবয়বরেখা। বাঁদিকটায় তাকালো সেমিয়ন—দুটো বায়ুচালিত কল, তালসভাবে ঘুরছে তাদের পাখা, পেছনেই একটা খড়িমাটির খাত। অনেকটা নীচে ঢালু জমির ওপর ফলের বাগান, খড়ের কুটির, ঘণ্টাঘরের সাদা চূড়োটা ঝিকমিক করছে তার মধ্যে। ঝোপজঙ্গলের ওপাশে সূর্যের আলোয় চক্‌চক্‌ করছে কোনো প্রাক্তন কুলীনব্যক্তির মহলবাড়ির জানলাগুলো। বসন্ত এসে গেলেও গাছের পাতার বাহার নেই, ঝোপজঙ্গলগুলো প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। দাঁড়কাকের দল চারিদিকে চক্কোর দিয়ে কা-কা করছে। জঙ্গল আর চমৎকার বাড়িটার সামনের দিকটার প্রতিচ্ছবি পড়েছে টৈ-টম্বুর পুকুরের জলে। জলার ধারে বসে আছে একপাল গরু। ছেলেমেয়েরা খেলছে। ভাইয়ের জ্যাকেটটি গায়ে চাপিয়েছে সেমিয়ন; প্রকাণ্ড পকেট দুটোর মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছিল সে ভুরু নীচু করে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এল তার মনের গভীরে। গ্রাম ছাপিয়ে-ওঠা স্বচ্ছ উষ্ণতার ঢেউ কেটে, নীলাভ ফলবাগিচা আর চষা জমির আড়াল থেকে এক অন্য পৃথিবী, এই শান্ত পরিবেশ ছাড়িয়ে অনেক দূরের এক পৃথিবী ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল তার চোখের সামনে। আলেক্সি গাড়ি চালিয়ে আসছিল, দূর থেকে

ছিল, মুঝিকদের ধরে গালাগাল করেছে—তোরা বেটা অমুক-তমুক, ডাকাত, গুণ্ডা, উনিশ শো পাঁচ সালের কথা ভুলে গিয়েছিস্? তিন ঘণ্টা ঝাড়া গলাবাজি করেছে। খিস্তি-খেউড় করে টের পাইয়ে দিয়েছে ওদের রাজনীতি করতে যাওয়ার মানেটা কি!"

"কি হবে তাহলে এখন?"

"চাবুক—আর কি!"

"তাহলে জমির কি হবে? এখন এর মালিক হবে কে?"

"আধা-আধি হে আধা-আধি। ফসল ঘরে তুলতে দেবে, প্রিন্সের প্রাপ্য অর্ধেকটা কিন্তু নিয়ে চলে যাবে।"

"রেখে দাও তোমার!—চললাম আমি।"

"যাবে কোথায় হে, মুখ্যু?"

আর দু'-চারটে কথার পর চাষীরা সবাই ভঙ্গ দেয়। রাত হবার আগেই জমিদারের মহলবাড়িতে ফের গিয়ে জমতে থাকে সোফা, বিছানা, মশারি, গিল্টি-করা ফ্রেম-বাঁধানো আয়না আর ছবি।

ক্লাসিল্নিকভরা অন্ধকারের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে। হাতের চামচেটা নামিয়ে রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে আলেক্সি। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মাত্রিয়োনা চুল্লী আর টেবিলের মাঝখান দিয়ে ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। সেমিয়ন বসে আছে কাঁধ নিচু করে, কপালের ওপর এসে পড়েছে তার কোঁকড়া কালো চুল। ভাঙা জিনিসের টুকরো-টাকরা সাফ করতে গিয়ে কিংবা টেবিলের ওপর ডিশ রাখবার অছিলায় মাত্রিয়োনা প্রত্যেক বারই ওকে ঘেঁষে চলে যাচ্ছে বাহু দিয়ে, স্তন দিয়ে। কিন্তু এক কঠিন মৌন বজায় রেখেছে সেমিয়ন, মাথা পর্যন্ত তুলছে না সে।

হঠাৎ আলেক্সি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল জানলার কাছে। নখ দিয়ে কাঁচের ওপর টোকা মারতে লাগল সে, তাকিয়ে থাকল বাইরের দিকে। সন্ধ্যার নীরবতায় এখন পরিষ্কার শোনা যেতে লাগল একটা দীর্ঘ বন্য আর্তচীৎকার। মাত্রিয়োনা ধপ্ করে একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়ল, দু' হাঁটুর মাঝে মোচড়াতে লাগলো হাতদুটো।

"ভাস্কা দিমেনতিয়েভকে চাবকাচ্ছে ওরা"—ধীরে ধীরে বলল আলেক্সি। "ওর খোঁজেই এসেছিল, ধরে নিয়ে গেছে প্রিন্সের বাড়িতে।"

"এই নিয়ে তিনজন হল।"—ফিস্ফিস্ করে বলল মাত্রিয়োনা।

তিনজনেই নীরবে কান পেতে রইল। আঁধার-ঘেরা গ্রামের সারা আকাশ বাতাস মথিত করছিল একটা তীব্র আর্তনাদ, আগের মতোই ভয় আর হতাশায় ভরা।

সেমিয়ন দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। চকিত গতিতে পাতলুনের বেল্ট্টা চেপে ধরে বেরিয়ে চলে গেল ভাইয়ের কামরায়। মাত্রিয়োনাও নিঃশব্দে দ্রুত অনুসরণ

করল তাকে। ততক্ষণে সেমিয়ন রাইফেলটা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিয়েছে। মাত্রিয়োনা দু' বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, মাথাটা পিছন থেকে হেলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পাথর হয়ে ঝুলে রইল সে সেমিয়নের গলা আঁকড়ে ধরে। সেমিয়ন তাকে সরাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মাটির মেঝেতে ঝুপ্ করে পড়ে গেল রাইফেল। বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সেমিয়ন মাথা গুঁজলো বালিশে। মাত্রিয়োনা পাশে বসে ওর কর্কশ চুলে তাড়াতাড়ি হাত বুলোতে লাগল।

রক্ষীদের শক্তিতে আস্থা ছিল না নায়েব গ্রিগরি কার্লোভিচের, নতুন হেৎমান-পল্টন 'গাইদামাক'দের ওপরও তার ভরসা ছিল কম। তাই ভ্লাদিমিরস্কয়ে গ্রামে একটা পুরো গ্যারিসন মোতায়েন রাখবার জন্য বায়না ধরেছিল সে। জার্মানরাও এসব ব্যাপারে একটু ইতস্তত করে না; সঙ্গে সঙ্গে তারা দুটো পল্টন-বাহিনী পাঠিয়ে দিল—মেশিনগান সমেত তারা ঢুকলো এসে ভ্লাদিমিরস্কয়েতে।

গ্রামেই ঘাঁটি গেড়ে বসল সৈন্যদলটা। লোকের বিশ্বাস গ্রিগরি কার্লোভিচ নিজেই তাদের বলে দিয়েছিল কোন্ কোন্ বাড়িতে তাদের আস্তানা গাড়তে সুবিধে হবে। কিন্তু এ-গুজবের পেছনে সত্যি মিথ্যা যাই থাকুক, গত বছরে যে-সব চাষী প্রিন্সের মহলবাড়ি লুট করার ব্যাপারে যোগ দিয়েছিল তাদের প্রত্যেককে এখন মাশুল দিতে হল ঃ একেক জন করে সৈন্য এবং একটা ঘোড়ার জন্য প্রত্যেককে ঘরে জায়গা দিতে হবে, তাদের ভরণপোষণ করতে হবে। জেলা কার্যকরী কমিটির যারা অদলীয় সদস্য ছিল তাদের ওপরও ওই একই হুকুম (তবে জার্মানরা এসে পড়ার আগেই তরুণ সদস্যদের দশজন গ্রাম ছেড়ে সরে পড়েছে)।

ক্রাসিল্নিকভরাও রেহাই পেল না। ভারিক্কি চেহারার একজন জার্মান সৈনিক কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে মাথায় হেলমেট পরে পুরো যুদ্ধসাজে এসে হাজির হল ওদের বাড়ির দরজায়। দুর্বোধ্য ভাষায় কী কতগুলো কথা বলে সে আলেক্সিকে দেখাল তার হুকুমনামা, ওর পিঠ চাপড়ে বলল ঃ

'গুট্ ফ্রয়েন্ড্...'

আলেক্সির কামরাটা দেয়া হল তাকে। ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ গুছিয়ে বসল লোকটা। বিছানায় পাতলো একটা ভাল কম্বল, দেয়ালে টাঙিয়ে দিল কাইজার উইল্হেল্মের ফটো। তারপর হুকুম করল মেঝেটাকে ঝাড়পোঁছ করে দেবার জন্য।

মাত্রিয়োনা যখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, লোকটা তার নোংরা পোশাক-আশাকগুলো এক জায়গায় জড়ো করে ওকে বলল পরিষ্কার করতে। "শ্মুৎসিক্—প্ফুই!" বলল সে : "বিট্টে হবাশেন্।" (নোংরা—সাফ করে দিও!) তারপর বেশ খুশি হয়েই বুট-শুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়, চুরুট ধরালো একটা।

চুমরানো তির্যক গোঁফওয়ালা মোটা মানুষ। পোশাকটাও বেশ উঁচুদরের, আরামদায়ক। আর শুয়োরের মতোই খাই-খাই করে সবসময়। মাত্রিয়োনা যা

এনে দেয় তাই গপ্‌গপ্‌ করে গেলে। সবচেয়ে পছন্দ করে নোনা বেকন। একজন জার্মান এসে তার বেকনে ভাগ বসাবে এ মাত্রিয়োনা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না; কিন্তু আলেক্সি বলে ঃ "যাক্‌ গে, ছেড়ে দাও! গিলুক আর পড়ে পড়ে ঘুমোক, অন্য ব্যাপারে নাক না গলালেই হল!"

অবসর সময়ে লোকটা সামরিক মার্চের শিস্‌ দেয়, কিংবা কিয়েভ-শহরের ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে বাড়ির উদ্দেশে চিঠি লেখে। চমৎকার ব্যবহার, খালি একটু মাতব্বরি চালে পা দাপায় এই যা, নিজেকে বোধহয় ভাবে গোটা বাড়ির মালিক।

ক্লাসিল্‌নিকভরা এমনভাবে চলাফেরা করে যেন ঘরে একটা মৃতদেহ রয়েছে —নিঃশব্দে খেতে বসে, নিঃশব্দে টেবিল ছেড়ে ওঠে। আলেক্সি তো সব সময়ই গুম্‌ হয়ে থাকে, কপালে তার ভাঁজ পড়ে গেছে এর মধ্যে। মাথা নীচু করে ঘুরে বেড়ায় মাত্রিয়োনা, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর গোপনে এপ্রনের প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মোছে। সবসময়ই তার ভয় এই বুঝি সেমিয়ন রাগে ফেটে পড়ে সংযম হারিয়ে বসে। কিন্তু এ ক'দিন সেমিয়ন যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে, মনে হয় যেন আপনাকে সে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে।

জেলা শাসনদপ্তরের বাড়ীর গায়ে আর খামারবাড়ীগুলোর ফটকে ফটকে আজকাল রোজই ঝুলতে দেখা যায় হেৎমান সাহেবের নতুন নতুন ফরমান। ওতে থাকে মালিকের কাছে গরুভেড়া ও জমি ফিরিয়ে দেবার হুকুম, জবরদখল ও আদায়ের হুমকি। কখনো বা বলা হয় বাধ্যতামূলকভাবে রুটি বিক্রির কথা। বিজ্ঞপ্তি থাকে : দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করলে কিংবা কমিউনিস্টদের সহায়তা করলে অথবা ওই রকম কিছু করলে নির্মম শাস্তি দেয়া হবে...।

চাষীরা বিজ্ঞপ্তি পড়ে বটে কিন্তু টুঁ শব্দটি করে না। নানা ধরনের অলক্ষুণে গুজব শোনা যেতে থাকে আজকাল—কোন্‌ গাঁয়ে নাকি জার্মান অশ্বারোহী সৈন্য-দের সঙ্গে নিয়ে একদল খরিদ্দার এসে জোর করে আ-ছাঁটা শস্য কেড়ে নিয়ে গেছে, বদলে যে-দাম তারা দিয়েছে বিদেশী কাগজের নোটে, মেয়েরা পর্যন্ত সে টাকা ছোঁয় না; অন্য একটা গাঁ থেকে নাকি অর্ধেক গরুভেড়া খেদিয়ে বের করে দিয়েছে তারা; আরেকটা গাঁ তারা এমনভাবে লুটে পুটে নিয়ে গেছে যে গাঁয়ের লোকদের না খেয়ে মরার অবস্থা।

চাষীরা রাত্তিরে গোপনে জড়ো হতে শুরু করে একেকটা জায়গায়—ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। সেখানে তারা নানাধরনের গুজব নিয়ে চর্চা করে, গজরায় ক্ষুব্ধভাবে। কী করা যেতে পারে? কোনো উপায় কি খুঁজে পাওয়া যাবে না? প্রচণ্ড আঘাত আজ নেমে এসেছে ওদের মাথায়, এমনভাবে দমিয়ে দিয়েছে ওদের যে নীরবে সবকিছু হজম করে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া ওদের আর কোনো গতি আছে বলে মনে হয় না।

খিড়কির আঙিনায়, নদীর পাড়ে, উইলোগাছের নীচে জটলা বসে গোপনে; সেমিয়নও যোগ দিতে শুরু করেছে ওদের সঙ্গে। কাঁধের ওপর কোটটি ফেলে

কারখানাগুলো স্তব্ধ। শস্য, চিনি, সাবান,—সবই ট্রেন বোঝাই হয়ে চলে গেছে জার্মানিতে। শৌখিন পিয়ানো, পুরনো ডাচ ছবির ক্যানভাস কিংবা চীনা চা-পাত্র দিয়ে কী করবে মুঝিক-দম্পতি? বড়ো জোর ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে গাইদামাকদের কপালের চুলের গোছা, তাদের ঝুলে-পড়া গোঁফ, নীল ঢিলে জামা আর চুড়োওয়ালা ফারের টুপিগুলো। আর সদর রাস্তায় ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করবে নীল-চোয়ালওয়ালা বোলার-টুপিপরা ফাটকা কারবারী কিংবা টাকা লেন-দেনের ব্যাপারীদের সঙ্গে। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ীর পথ ধরবে, যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে যাবে তারা। কিন্তু ফিরতি পথেই বা রেহাই কোথায়? প্রথম কুড়ি মাইল পেরিয়ে এসেই ট্রেনের চাকার দাঁড় অতিরিক্ত তেতে উঠে ট্রেন যাবে অচল হয়ে। এদিকে মেশিনের তেলও নেই যে ফের চালু করা যাবে, কারণ জার্মানরা একদম শুষে নিয়ে গেছে সবকিছু। বালি ছিটিয়ে দিয়ে আবার চালানো হবে বটে, কিন্তু আবারও থেমে যাবে চাকার দাঁড়ের উত্তাপ অতিরিক্ত বেড়ে যাবার ফলে।

রাইখ-মার্কগুলো হাতের মধ্যে দলা পাকিয়ে মেয়েরা যে কাঁদছে তার কারণই হল এই, আর এই একই কারণে পুরুষরাও জংলা জলা-জায়গায় লুকিয়ে রাখছে গরুভেড়ার পাল, এমন সব জায়গায় যেখানে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই—কে জানে কাল সকালে আবার হয়তো কোন্ নতুন নোটিশ ঝুলতে দেখা যাবে!

গ্রামে আলোর চিহ্ন নেই। সমস্ত ঘরগুলো আঁধার। কিন্তু ঝাড়জঙ্গলের ওধারে হ্রদটার ওই পারে বড়ো মহলবাড়িটার জানলার জ্বলজ্বল করছে আলো। জার্মান অফিসারদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করেছে নায়েব। সামরিক সঙ্গীতের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে জার্মান ওঅলট্স্ নাচের সুর অন্ধকার গ্রামখানির বুকে ভেসে বেড়াচ্ছিল বিভীষিকা জাগিয়ে। জ্বলন্ত সুতোর মতো একটা হাউই উঠে গেল আকাশের অনেক উঁচুতে—জার্মান সৈনিকদের খুশি করবার জন্য এই ব্যবস্থা! ওরা তখন মহলবাড়িটার খোলা আঙিনায় দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে, বীয়ারের একটা পিপে বের করে আনা হয়েছে ওদেরই জন্য। জ্বলন্ত সুতোটা ফেটে পড়ল তারার ফুলঝুরি হয়ে—মন্থরগতিতে সেগুলো নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে খড়ের চালাঘর, ফলবাগান, উইলোগাছ, সাদা ঘণ্টাঘরটা আর ওয়াট্ল্-লতার বেড়াগুলো আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অসংখ্য বিষণ্ণ মুখও ফিরে তাকিয়েছে এই সময় হাউইয়ের তারাগুলোর দিকে। এমনই উজ্জ্বল তাদের আলো যে সে মুখগুলোর প্রত্যেকটি রুদ্ধ কুঞ্চনরেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কোনো অদৃশ্য ক্যামেরা দিয়ে হয়তো কেউ এমন একটি মুহূর্তে তাদের রোষদীপ্ত মুখ-মণ্ডলের ছবি তুলে রাখতে পারতো—আর সে ছবি জার্মান জেনারেলদের হাতে পড়লে মস্তিষ্ক কণ্ডুয়নের যথেষ্ট খোরাকও মিলতো তাদের।

গ্রামের মাইলখানেক দূরে ক্ষেতগুলো অবধি যেন দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দু'একজন লোককে দেখা গেল নির্জন খড়ের গাদাটার কাছে চুপি-সারে এগিয়ে যেতে। চট্ করে ওরা মাটিতে শুয়ে পড়ল। একজন শুধু খড়ের

গাদার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশ থেকে ঝরে পড়া আলোগুলোর দিকে মাথা উঁচিয়ে দেখে সে হেসে বলল ঃ

"ঐ যে, দেখ দেখ!"

মাটিতে পেঁছবার আগেই নিবে গেল আলোর ফুল্‌কিগুলো। আবার সূচীভেদ্য অন্ধকার। খড়ের গাদার আশেপাশে যারা ছিল সবাই এক জায়গায় এসে জড়ো হল। মাটিতে রাখবার সময় ওদের রাইফেলগুলো খট্‌খট্‌ করে উঠল।

"সবশুদ্ধ কতোগুলো?"

"দশটা করাত-চালানো বন্দুক, আর চারটে রাইফেল, কমরেড কোঝিন!"

"এই কটা মাত্র?"

"সময়ই পাওয়া গেল না, কি করব? কাল রাতে আরো কিছু নিয়ে আসব।"

"আর কার্তুজগুলো কোথায়?"

"এই যে রয়েছে আমাদের পকেটে। অনেকগুলো কার্তুজ।"

"তাহলে খড়ের গাদার নিচে লুকিয়ে রাখো জিনিসগুলো। হাতবোমা চাই, বুঝলে?" হাতবোমা নিয়ে এসো!.....করাত-কাটা বন্দুকগুলো তো বুড়োদের জন্য, যারা ঝোপের আড়ালে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে! একবার গুলি চালিয়েই ব্যস্‌ পাৎলুন ভিজিয়ে একাকার। ছোকরা লড়িয়েদের জন্য চাই রাইফেল, তার চেয়েও বেশি দরকার হাতবোমা, বুঝেছ কথাটা? আর যারা তলোয়ার চালাতে জানে তাদের জন্য তলোয়ার। ঐ হল সব অস্তরের সেরা অস্তর।'

"আজ রাতেই আমরা শুরু করতে পারতাম, কমরেড কোঝিন। আমার জানের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি আজই ছিল সুযোগ!"

"সারা গ্রামটাকে আজ জাগিয়ে দিতে পারা যেত...এমন রাগ জমা হয়ে আছে লোকের।...আমাদের একেবারে কলজের খুন শুষে নিয়েছে, দেখেছিস্‌...চল্‌ এই খুরপি কাস্তে নিয়েই সাবাড় করি ওদের, বন্দুক কামানের দরকার নেই।.....ওরা এখন ঘুমে অচেতন, উঃ এমন সোজা হত কাজটা যে কী বলব!..."

"বলি কম্যাণ্ডারটি কে?—তুমি?" চাঁছা গলায় বলল কোঝিন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল সে। আবার যখন মুখ খুলল, গলার স্বরটা প্রথমে নরম আর বিদ্রূপভরা হলেও ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠতে লাগল ঃ

"এখানে কম্যাণ্ডার কে শুনি? জানতে দেবে দয়া করে?...আমি কি এতক্ষণ তাহলে গর্দভদের সঙ্গে কথা বলেছি, জিজ্ঞেস করি?.....তাহলে এখনই আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা জার্মান আর গাইদামাকদের হাতে মরো, লুটে নিক সব ওরা!" (একরাশ অশ্লীল গালাগাল বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে) "তোমাদের কি কোনো শৃঙ্খলাই নেই? এই এক কারণে কতো মাথা নিজের হাতে লুটিয়ে দিয়েছি জান? ফৌজী দলে যখন যোগ দিয়েছ তখন পুরোদস্তুর আতামানের বাধ্য হয়ে থাকার শপথ নিতে হবে—কোনো শর্তটর্ত নেই এতে। আর নয় তো থেকে যাও পেছনে। গান করো, ফুর্তি করো, কিন্তু আতামান যেই বলবেন 'চালাও ঘোড়া!'

আর যদি নেহাতই তেমন দরকার পড়ে তবে তোমাদের মতোই রাইফেল কাঁধে তুলে নেব।..."

সেমিয়ন মেঝেতে পা দাপিয়ে একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল।

"ছুঁড়ির কি তেজ দেখেছ? হায় ভগবান!"

"যাও!"

বাতাসে শাল উড়িয়ে মাত্রিয়োনা দরজার কাছে ছুটে গেল, নগ্ন পা দুখানি বুটের মধ্যে চালান করে দিয়ে দুমদাম করে হেঁটে বেড়ালো খানিক, তারপর চলে গেল বাইরে—গাইগরু তদারক করবার জন্যই নিশ্চয়। মাথা নেড়ে নেড়ে কেবলই হাসছিল সেমিয়ন ও আলেক্সি আর খালি বলছিল ঃ "ছুঁড়িটাকে দেখলে?—রীতিমত একটি আতামান!"

ভোর হবার ঠিক আগেই যে বাতাসটা বইতে থাকে আজ তা খোলা জানলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে, রবার গাছের পাতাগুলোকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, টুকরো টুকরো কথা আর বিদেশী গানের কলিও ভেসে আসছে সে-বাতাসে। ওদের সেই জার্মান অতিথিটি, জমিদার-বাড়ি থেকে ফিরছে মাতাল হয়ে আর রাজ্যের ধুলো ছড়াচ্ছে বুটের গুঁতোয়। রাগে জানলা বন্ধ করে দেয় আলেক্সি।

"ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ছ না কেন, সেমিয়ন?"

"ভয় পেলে নাকি?"

"ওই মাতাল শয়তানটা কোথায় কি গোল বাধিয়ে বসে, ঠিক আছে? তুমি ওকে সেদিন মারতে গিয়েছিলে সে কথা ও ভোলেনি।"

"আবার একদিন গিয়ে বসিয়ে দেব।" সেমিয়ন দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন নিজের ঘরের দিকেই যাবে সে। "আলেক্সি! আলেক্সি, তোমাকে ঠেলে তোলা এত কঠিন বলেই বোধ হয় বিপ্লবটা ধ্বসে যাচ্ছে..কর্নিলভকে দেখেও কি যথেষ্ট আক্কেল হয়নি? গাইদামাক আর জার্মানগুলোকে দেখেও কি তোমার সাধ মেটেনি? এর পরেও তুমি আর কি চাও বল তো?" (হঠাৎ তার গলার স্বর পাল্টে গেল) "কি হল ওখানে?"

উঠোনের দিক থেকে ভেসে এল একটা চাপা বিড়বিড়ানি আর সেই সঙ্গে একজোড়া বুটের এলোমেলোভাবে চলে বেড়াবার আওয়াজ। একটি স্ত্রীলোকের রুদ্ধ গলা শোনা গেল ঃ "ছেড়ে দাও বলছি!" তারপরেই ধ্বস্তাধ্বস্তি আর ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ। এবার আরো তীব্রকণ্ঠে যেন যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল মাত্রিয়োনা, "সেমিয়ন, সেমিয়ন!"

সেমিয়ন ধনুকের মতো বাঁকা পায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল ঘরের বাইরে। আলেক্সি দাঁড়িয়েই থাকলো নিজের জায়গায়, বেঞ্চিটা আঁকড়ে ধরে। মানুষ ক্ষেপে গেলে তার যে কী অবস্থা হয় তা সে জানে। কাল দরজার কাছে কুড়ুলটা রেখে দিয়েছিলাম—ওই সেটা কাজে লাগাবে, ভাবল আলেক্সি। বাইরের উঠোনে সেমিয়নের ক্রুদ্ধ বন্য চীৎকার শোনা গেল। তারপরেই এল একটা আঘাতের শব্দ, হিস্‌হিসিয়ে উঠল কে যেন, গলায় ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হতে থাকল, তারপর ঝুপ্‌ করে কি একটা ভারি জিনিস পড়ে গেল মাটিতে।

হয়ে পড়া সত্ত্বেও এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ নভোচেরকাস্কের মাইল তিরিশেক দূরে ইয়েগর্লিৎস্কায়া ও মেচেতিন্স্কায়া গ্রামের আশেপাশের এলাকায় ভলান্টিয়ার বাহিনী সদলবলে ঢুকে পড়ল। সেখানে এসে যখন তারা খবর পেল যে রস্তভ শহর এখন জার্মানদের হাতে আর নভোচেরকাস্ক্ও আতামান-পরিচালিত দন কসাকদের খপ্পরে পড়েছে তখন যেন অপ্রত্যাশিত আনন্দে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। .....এদিকে লাল বাহিনী করল কি, ভলান্টিয়ারদের না ঘাঁটিয়ে আর একটি ফ্রন্ট খুলে বসল নতুন শত্রু জার্মানদের বিরুদ্ধে।

ভলান্টিয়ারদের এবার সুযোগ হল বিশ্রামের। আহতদের দেখাশোনা করা, নতুন করে শক্তি সমাবেশ করার মওকা মিলল তাদের। সৈন্যবাহিনীর সাজ-সজ্জার পুনর্বিন্যাস করাই হল এখন তাদের প্রাথমিক প্রয়োজন।

রস্তভের উপর অভিযান চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল লাল বাহিনী—তিখরেৎস্কায়া থেকে শুরু করে বাতায়িস্ক্ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রেল স্টেশন জমজমাট হয়ে আছে সামরিক রসদপত্রের ঠাসাঠাসিতে। সেনাপতি মারকভ বোগায়েভ্স্কি ও এরদেলির বাহিনী তিন সারিতে ভাগ হয়ে লাল বাহিনীর পশ্চাৎভাগে সবচেয়ে কাছাকাছি অংশগুলোর উপর আক্রমণ শুরু করল; ক্রিলভ্স্কায়া, সসিকা ও নভো-লিউশ্কভ্স্কায়া রেলস্টেশনের সৈন্যবাহী ট্রেনগুলো ধ্বংস করে, সাঁজোয়া ট্রেন একখানা উড়িয়ে দিয়ে, প্রচুর পরিমাণে লুটের মাল সংগ্রহ করে তারা আবার পশ্চাদপসরণ করল স্তেপ অঞ্চলে। লাল বাহিনীর অভিযান রুদ্ধ হয়ে গেল।

লড়াই করতে গিয়ে কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল রশচিনের, তাছাড়া সামান্য ছড়েও গিয়েছিল এখানে সেখানে। এখন সেরে উঠেছে সে অনেকটা। শান্ত নিস্তব্ধ গ্রামটিতে গত কয়েকদিন কাটিয়ে শরীরের জোর ফিরে পেয়েছে সে, সূর্য কিরণে ঝরঝরে হয়ছে দেহ, আর প্রাণভরে খাওয়া-দাওয়াও করেছে সে।

যে-সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিল রশচিন, আজ তা সিদ্ধ হয়েছে—সেই মস্কো ছাড়ার সময় থেকেই একটি মাত্র চিন্তা মানসিক ব্যাধির মতো তাকে ক্রমাগত যন্ত্রণা দিচ্ছিল ঃ বলশেভিকদের হাতে লাঞ্ছনার শোধ যেমন করে হোক তুলতে হবে। আজ তার উদ্দেশ্য সফল। প্রতিশোধ সে নিচ্ছে। কিন্তু একটি মুহূর্তের কথা তার স্মৃতিপটে চিরকালের মতো মুদ্রিত হয়ে থাকবে। রেললাইনের বাঁধের দিকে ছুটে যাচ্ছিল সে...জয়লাভ হয়েছে।...হাঁটু কাঁপছিল, রগদুটো দপ্দপ করছিল তার। বেয়নেটের ফলা মুছবার জন্য অজ্ঞাতসারেই সে মাথার নরম টুপিটা খুলে ফেলেছিল পেশাদার সৈনিকদের মতো অভ্যস্ত ভঙ্গীতে—হাতের অস্ত্রটি ওরা সব সময় ওইভাবে পরিষ্কার করে রাখে। মনের সেই উন্মাদ ঘৃণা তখন আর ছিল না। মাথাটাকে কঠিন সীসের পাত দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে চেপে-ধরার মতো সেই অনুভূতিটা, চোখে রক্তোচ্ছ্বাস জেগে ওঠার সেই অসহ্য অনুভূতিটা তখন মিলিয়ে গিয়েছিল। একজন শত্রুকে স্রেফ ধরাশায়ী করে বেয়নেটটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল তার দেহে, তারপর টেনে বার করে নিয়ে রক্তটা মুছে ফেলেছিল সে। ঠিক কাজই

করেছিল রশচিন তা হলে! কোনো ভুল করেনি যা-হোক! তারপর তার মন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসে, বুঝতে চেষ্টা করে সে—সত্যিই কি ঠিক কাজ করেছে সে? কোনো ভুল হয়নি তার? তাই যদি হয়, তা হলে এ প্রশ্ন তার মনে জাগছে কেন? কেন অনবরত সে জিজ্ঞাসা করছে নিজেকে—ঠিক কি ভুল?

দিনটা ছিল রবিবার। গ্রামের গির্জায় উৎসবানুষ্ঠান চলেছে। রশ্‌চিনের দেরি হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। প্রবেশদ্বারে এসে দেখে সৈনিকদের ঠেলাঠেলি ভীড়। সদ্য-কামানো মাথা ওদের। রশচিন বেরিয়ে গিয়ে গির্জার পিছনে পুরনো গোরস্তানটার মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখে ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুল ফুটেছে। ঘাসের একটা ডাঁটি তুলে নেয় সে চিবোবার জন্য। তারপর একটা ঢিবির ওপর গিয়ে বসে। ভাদিম পেত্রোভিচ্‌ মানুষটা সৎ, আর কাতিয়ার ভাষায় বলতে গেলে—ভালোমানুষ।

আধ-খোলা, মাকড়সার জাল-ঢাকা জানলাটার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসে ছেলেমেয়েদের গানের আওয়াজ। ওদেব সঙ্গে সঙ্গে ডিকনের ভরা-গলার দোহার শুনে মনে হয় যেন তার রোষভরা নির্মম কণ্ঠস্বরের দাপটেই বুঝি ভয়ে ছুটে পালাবে শিশুদের নরম গলা। ভাদিম পেত্রোভিচের চিন্তা আপন খেয়ালেই যেন চলে যায় সুদূর অতীতে, যেন উজ্জ্বল কিছু, নিষ্পাপ কিছু খুঁজে বেড়ায় অতীতের মাঝে।.....

নিছক আনন্দেই যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে সে। উঁচু জানালার ঝলমলে শার্সি ভেদ করে তার দৃষ্টি চলে গেছে বসন্তের নীল আকাশে—এমন আকাশ তো সে কোনোদিনও দেখেনি আগে! বাগান থেকে গাছের মর্মরধ্বনি ভেসে আসছে তার কানে। সাদা ছিটফোটওয়ালা একটা নতুন সাটিনের শার্ট ঝুলছে বিছানার ধারে চেয়ারটার ওপর। জামাটায় কেমন যেন একটা 'সাবাথ'-দিনের গন্ধ। শুয়ে শুয়েই ভাবছে সে, কেমন করে কাটাবে এত বড়ো দিনটা, কার সঙ্গে দেখা করবে আজ—আর এমনি ভাবে শুয়ে শুয়ে ভাবতেও এমন মজা লাগে, এমন টেনে নিয়ে যায় মনটাকে, যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও এই ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারে।.....মাথা তুলে দেয়ালমোড়া কাগজের দিকে তাকায় সে। ঢেউ-তোলা ছাদওয়ালা চীনের প্যাগোডা আঁকা রয়েছে তাতে। একটা পিঠ-কুঁজো পুলও রয়েছে, আর আছে ছাতা-মাথায় দুজন চীনা। আরেকজন চীনা পুলটার ওপর বসে মাছ ধরছে, মাথায় তার বাতির ঢাকনার মতো টুপি। একই ছবি আঁকা আছে পর পর অসংখ্যবার। বেচারি ওই মজার চীনেগুলো, নদীর পাড়ের ওই প্যাগোডায় কতো সুখেই না বাস করে তারা।.....এই বুঝি বারান্দায় শোনা যাচ্ছে ওর মায়ের গলার আওয়াজ : 'ও ভাদিম, যাবে না? আমি কিন্তু তৈরি।' প্রশান্ত মধুর গলার স্বরটি যেন তার সারা জীবনটাকে সুখময়, কল্যাণময় করে তোলে। সাদা ফুটকিওয়ালা নীল শার্টটা গায়ে দিয়ে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায় সে। ওর মা পরেছেন চমৎকার একটা সিল্কের পোশাক। ওকে চুমু খেয়ে মা তাঁর নিজের মাথা থেকে চিরুণীটা খুলে নেন। ওর চুলগুলো আঁচড়ে দিয়ে বলেন : 'বাঃ এই তো চমৎকার হয়েছে! চলো এবার.....'

যাচ্ছে নির্মমভাবে, অনিবার্যভাবে, প্রতিমুহূর্তে কালের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে—তার দয়িতার মুখে বলিরেখা এঁকে, চুলে রুপোলির ছোপ লাগিয়ে।.....রশচিনের মনে হল কাতিয়াও যদি না ঘুমিয়ে থাকে তো নিশ্চয় এই একই কথা ভাবছে ঘড়ির আওয়াজটা শুনতে শুনতে। তারপর তার কানে এল কাতিয়ার পায়ের শব্দ—ক্ষীণ, বিচলিত, যেন ওর চটিজুতোর একটা থেকে হীল খসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ও নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে। তারপর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। রশ্‌চিনের কেমন যেন ভয় করতে লাগল, দেয়াল ভেদ করে যেন সে কাতিয়ার ভাবনার নাগাল ধরতে পেরেছে। দরজা ক্যাঁচ করে উঠল। খাবারঘরে প্রবেশ করেছে কাতিয়া। সাইড বোর্ডের একটা পাল্লা খুলে ফেলেছে, ঝনঝন করে উঠেছে কাঁচের গ্লাসগুলো। রশচিন খাড়া হয়ে উঠল, যে কোনো মুহূর্তে ছুটে যাবে সে কাতিয়ার কাছে। ক্যাঁচ্‌ করে আবার দরজাটা খুলল কাতিয়া। 'কে তুমি? লিজা?' উটের লোমের ড্রেসিং গাউন পরেছিল কাতিয়া। এক হাতে একটা মদের গ্লাস, অন্য হাতে একটা ছোট্ট শিশি। এই পথই শেষে বেছে নিয়েছে সে সকল দুঃখ জয় করবার, নিঃসঙ্গতার বোঝা এড়াবার জন্য, অবধারিত কালচক্রের হাত থেকে, সবকিছু থেকেই মুক্তি পাবার জন্য!..... ধূসর চোখের সঙ্গে তার লম্বা মুখখানিকে দেখাচ্ছিল পথহারা শিশুর অসহায় মুখের মতো। তাকেই যে আজ নিয়ে যাওয়া দরকার চীনের প্যাগোডায়।.....ভাদিম পেত্রোভিচ বলল কাতিয়াকে ঃ 'আমার সমস্ত জীবন আমি সঁপে দিলাম তোমায়!' কাতিয়াও বিশ্বাস করে গ্রহণ করল তাকে, ভেবেছিল রশচিনের মমতায়, রশচিনের প্রেমে তার সব একাকীত্ব ঘুচে যাবে, জীবনের বাকী সময়টুকু একেবারেই গলে মিশে যাবে রশচিনের সমবেদনার আর্দ্রতায়।.....

হা ভগবান, হা ভগবান! বরাবর রশ্‌চিন জেনে এসেছে কাতিয়া এক মুহূর্তও তাকে ছেড়ে চলে যায় নি—এমন-কি যখন ঘৃণার সেই কঠিন সীসের পাতটা তার মাথার খুলিকে চেপে ধরেছে প্রবল আক্রোশে, তখনও নয়, লড়াইয়ের সেই ভয়ানক দিনগুলোতেও নয়। উন্মত্ত চীৎকারে গলা ফাটিয়ে সে যখন লাল-ফৌজের সৈনিকটির কোটের মধ্যে বেয়নেট চালিয়ে দেয় তখন তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল কাতিয়ারই ছায়ামূর্তি, যেন বাহু দুটো প্রসারিত করে অনুচ্চারিত কণ্ঠে প্রাণভিক্ষা চাইছিল সে, আর রশচিনও সেই দুরপনেয় প্রেতমূর্তিটাকে ভেদ করেই চালিয়েছিল বেয়নেট। তারপর টুপি খুলে মুছতে গিয়েছিল বেয়নেটের ফলা।.....

গির্জার অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। রোদ-পোড়া চেহারার একদল ক্যাডেট আর অফিসার বেরিয়ে এলেন গির্জা থেকে। ডাকসাঁইটে জেনারেলরা মন্থর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন বাইরে, চোখে তাঁদের দস্তুর-মাফিক কঠোরতাভরা দৃষ্টি, সামরিক অর্ডার আর ব্রুশ-চিহ্নে অলঙ্কৃত তাঁদের ইস্তিরি-করা ধোপদুরস্ত উর্দি ঃ লম্বা পাতলা গড়নের ওই 'কার্তিক'টি যিনি দাড়ি পাট করে আঁচড়ে মাথার টুপিটা একদিকে হেলিয়ে দিয়েছেন কাপ্তানের মতো, উনি হলেন এরদেলি; নোংরা ফার-টুপি পরা উস্কো-খুস্কো চেহারার লোকটি হলেন রগচটা মারকভ; থ্যাবড়া-

তেপলভ তখনো রাগে ফুঁশছিল, কর্ণেল রশ্চিনের সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছিল সব সবিস্তারে বলল সে ঝোলা গোঁফটায় তা দিতে দিতে।

ওনোলি বলল, "ক্যাপ্টেন, আপনি যে দেখছি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। আমি তো গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা গোয়েন্দা।"

"যেতে দাও ভাল্‌কা!" ফন মেক চোখ মটকালেন সজোরে—ফলে মুখের বাঁদিকটা কুঁচকে গেল আগাগোড়া : "জেনারেল মারকভ ওকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, তা তো জানো? ওকে ঘাঁটাতে হলে একটু নরম রাস্তা ধরতে হবে। তবে হ্যাঁ, যা খুশি বাজি রেখে বলতে পারি রশ্‌চিন হচ্ছে বলশেভিক, ও হচ্ছে একটি উকুন.....'

উত্তর ককেশাসের এদিকটা মে মাসের শেষ দিক পর্যন্ত মোটামুটি ঠাণ্ডাই ছিল। দু'পক্ষই তৈরি হচ্ছিল চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য। ভলান্টিয়ারদের আশা ছিল প্রধান প্রধান রেল জংশনগুলো দখল করে ওরা ককেশাসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, আর শ্বেত কসাকদের সাহায্যে সমগ্র এলাকাটা মুক্ত করবে লাল বাহিনীর কবল থেকে। কুবান ও কৃষ্ণ-সাগরীয় প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি তৈরি হচ্ছিল তিনটি ফ্রন্টে লড়াই দেবার জন্য : জার্মানদের সঙ্গে, শ্বেত কসাকদের সঙ্গে, আর সদ্য পুনরুজ্জীবিত "দেনিকিন দল"-গুলোর সঙ্গে।

লাল ককেসীয় বাহিনীর মধ্যে বেশির ভাগই প্রাক্তন জারতন্ত্রী ট্রান্স-ককেসীয় বাহিনীর প্রবীণ যোদ্ধা, বহিরাগত বসবাসকারী আর ভূমিহীন কসাক তরুণ; সংখ্যায় তারা প্রায় এক লাখ হবে। ওদের প্রধান অধিনায়ক আভতোনমভ্‌কে কুবান-কৃষ্ণসাগরীয় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সন্দেহ করত একচ্ছত্র ক্ষমতালোলুপ বলে, আর গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সেও অনবরত ঝগড়া করত। তিখরেৎস্কায়াতে এক বিরাট জনসমাবেশে সে প্রকাশ্যেই কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিকে জার্মান গোয়েন্দার দল, 'প্ররোচক দালাল' বলে অভিহিত করেছিল। জবাবে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি আভ্‌তোনমভ ও তার অন্তরঙ্গ অনুগামী সরোকিনকে 'চিহ্নিত' করে দস্যু ও জনশত্রু হিসাবে, তাদের নিন্দাবাদ করে, চিরকলঙ্কের পাত্র করে তোলে।

এই সব কলহের ফলে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল ফৌজ। যে-সময় ভলান্টিয়ার বাহিনীকে একবারে মুঠোর মধ্যে পেয়ে তারা তিনটি ইউনিটের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করতে পারত ওদের বিরুদ্ধে, ঠিক সেই সময়টায় লাল ফৌজের মধ্যে চলছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। হরদম সভাসমিতি হচ্ছিল, বরখাস্ত হচ্ছিল কম্যান্ডাররা। ফৌজের পক্ষে তখন যেটুকু করবার যোগ্যতা ছিল তা হল বীরত্বের সঙ্গে বিপর্যয়ের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া—এর চেয়ে বেশি কিছুর সামর্থ্য তার ছিল না।

অবশেষে মস্কো থেকে নির্দেশ আসার ফলে স্থানীয় কর্তাদের একগুঁয়েমি রোখা সম্ভব হল। রণাঙ্গনের পরিদর্শক নিযুক্ত হল আভ্‌তোনমভ্‌। ফৌজের উত্তর আঞ্চলিক গ্রুপের অধিনায়কত্ব দেয়া হল কর্নেল কাল্‌নিন নামে একজন গোমড়া-

মুখো ল্যাটাভিয়ানের হাতে। সরোকিন যেমন ছিল তেমনি পশ্চিম আঞ্চলিক গ্রুপের অধিনায়কই রয়ে গেল।

ঠিক এমনি সময়ে কর্নেল দ্রজ্‌দভ্‌স্কি তিন হাজার বাছাই-করা অফিসারের একটি ফৌজী-দল সঙ্গে নিয়ে এসে যোগ দিলেন ভলান্টিয়ার বাহিনীতে। গ্রামাঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে এসে জুটতে লাগল ঘোড়সওয়ার কসাকরা। পেত্রোগ্রাদ থেকে, মস্কো থেকে, সারা রাশিয়া থেকে এসে হাজির হল অফিসাররা, একা একা অথবা দল বেঁধে;—কপোলকল্পিত এক 'তুষার অভিযানের' গুজব শুনে বড়ো উৎসাহিত হয়েছিল তারা। আতামান ক্রাস্‌নভ কিছুটা সাবধানতার সঙ্গেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা সরবরাহ করতে লাগলেন। দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল ভলান্টিয়ার বাহিনী; সেনাপতি ও আন্দোলনকারীদের কুশলী প্রচারের গুণে, স্থানীয় সোবিয়েত শাসকদের আনাড়ির মতো কাজকর্মের ফলে, এবং উত্তর দিক থেকে 'প্রত্যক্ষদর্শীরা' এসে যেসব বিচিত্র কাহিনী পরিবেশন করত তারই কল্যাণে ভলান্টিয়ারদের মনোবল ছিল রীতিমত চাঙ্গা।

মে-মাসের শেষ দিকটায় স্থানীয় লাল বাহিনী ভলান্টিয়ারদের ধ্বংস করার চেষ্টা ত্যাগ করল। ভলান্টিয়াররা এবার আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে তর্গোভায়া-তে কর্নেল কাল্‌নিনের উত্তর-আঞ্চলিক গ্রুপের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো।

"কি হল, গান বন্ধ করলে যে দোস্তরা?"

"গেয়ে গেয়ে গলা বলে ভেঙে গেল!"

"দেখি, পাইপটা ধরাবার জন্য যদি একটুকরো কয়লা পাওয়া যায়।"—বলল ইভান ইলিয়িচ তেলেগিন। শিবির-আগুনের পাশেই বসেছিল সে। রেলওয়ের বেড়ার তক্তাগুলো নির্বিবাদে পুড়ে যাচ্ছিল আগুনে। পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে তেলেগিন বসল ওদের গান শুনবার জন্য।

রাত অনেক হয়ে গেছে। রেল লাইনের পাশে পাশে সমস্ত আগুনের কুণ্ডই প্রায় নিভে গেছে। রাতের হাওয়াটা বেজায় ঠাণ্ডা। আকাশে ঘন হয়ে ছেয়ে আছে অগণন তারা। বেগুনি-বাদামী রঙের বিধ্বস্ত ভাঙা মালগাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে আগুনের আলোয়, রেলওয়ে বাঁধের একেবারে উপরে। গাড়িগুলো এসেছিল প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে, উত্তর মেরু অঞ্চলের জলাভূমি থেকে, তুর্কিস্থানের মরুভূমি থেকে, ভল্‌গা থেকে, উক্রেইন থেকে। প্রত্যেকটা বগির গায়ে লেখা "অবিলম্বে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে।" কিন্তু এ-সব শর্তটর্তের মেয়াদ অনেকদিন হল ফুরিয়ে গেছে। অনেক জল-ঝড়-সওয়া এই গাড়িগুলো তৈরি হয়েছিল শান্তির সময়ে যাতে কাজের ধকল সইতে পারে সেইভাবে,—কিন্তু আজ? অ্যাক্সেলের দাঁড়ে তেল নেই, গাড়ির দু'পাশ ভেঙে তুবড়ে গেছে। তারকাখচিত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ভবিষ্যতের গর্ভে ওদের জন্য রয়েছে নানা চমকপ্রদ দুঃসাহসী অভিযান। গোটা একেকটা ট্রেন যথাসর্বস্ব নিয়েই হয়তো লাইন-চ্যুত হয়ে যাবে;

একটা জীর্ণ টুপি ঠেলে দিয়েছে মাথার পেছন দিকে, সরু কাঁধের ওপর ঝুলছে একটা সামরিক লম্বাকোট। কোটের নীচে কোমর পর্যন্ত আর কোনো আবরণ নেই গায়ে। শার্টটা পড়ে ছিল এক পাশে, একটু আগে বোধহয় উকুন বাছছিল সেটা থেকে। কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে সে আস্তে আস্তে মাথাটা তুলল, তারপর শিশুসুলভ একটা ধীর হাসিতে ভরে ফেলল মুখটা।

তেলেগিন তাকে চিনতে পেরেছিল। ওর নিজের কোম্পানিরই লোক—মিশ্‌কা সলোমিন। এলেৎস্‌ এলাকার চাষীঘরের ছেলে, লাল বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। ককেশাসে এসেছে সিভার্স-এর ফৌজের সঙ্গে।

এক মুহূর্তের জন্য তেলেগিনের চোখে চোখ মিলতেই সে নামিয়ে নিল দৃষ্টি, যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে,—ইভান ইলিয়িচের তক্ষুনি মনে হল মিশ্‌কা সলোমিন তো আবার কোম্পানির মধ্যে কবি আর কড়া মদখোর হিসেবে নাম কিনেছে! তবে মাতলামি করতে তাকে কেউ বড়ো একটা দেখেনি। মিশ্‌কা অলসভাবে তার কোটটা টেনে নামালো কাঁধ থেকে, তারপর গায়ে চড়াতে শুরু করল শার্টটা। রেলের বাঁধ ধরে ধরে ইভান ইলিয়িচ ততক্ষণে প্যাসেঞ্জার গাড়ির দিকে উঠে গেছে। রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার সার্গি সার্গিয়েভিচ্‌ সাপোঝ্‌কভ যে-কামরাটায় থাকতো তার জানলায় তখন প্রহরীর মতো জ্বলছিল একটা তেলের বাতি। বাঁধের উঁচু জায়গাটা থেকে আকাশের তারাগুলোকে আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, নীচে শিবির-আগুনের মুমূর্ষু শিখাগুলো তখন লালচে একেকটি বিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

"ভেতরে এসো হে তেলেগিন, প্রচুর গরম জল রয়েছে"—জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল সাপোঝ্‌কভ। ওর দাঁতের ফাঁকে বাঁকা নলচেওয়ালা একটা পাইপ।

দেয়ালে-বসানো তেলের বাতিটা থেকে একটা ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়ছিল জরাজীর্ণ সেকেণ্ড-ক্লাস কামরাটায়—হুকের ওপর ঝুলছে কয়েকটা রাইফেল, এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে কেতাবপত্র, সামরিক মানচিত্র। গায়ে একটা ময়লাটে ক্যালিকো শার্ট আর কাঁধে পাতলুনের ফিতে চড়িয়েছে সাপোঝ্‌কভ। তেলেগিন ঢুকতেই তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও।

"পান-টান করবে নাকি কিছু?"

বাঙ্কের এক কিনারায় বসল ইভান ইলিয়িচ। খোলা জানলা দিয়ে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল—সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা 'কোয়েল' পাখির গলা। পাশের গাড়িটা থেকে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে বেরিয়েছিল একজন সৈনিক, আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ভারি ভারি পায়ে সে জানলার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কোমল সুরে বাজছিল একটা বালালাইকা। খুব কাছেই কোথায় যেন মোরগ ডেকে উঠল—রাত দুপুর গড়িয়ে গেছে।

"কি ডাকল? মোরগ?"—কেতলি নাড়াচাড়া বন্ধ করে সাপোঝ্‌কভ বলে উঠল। চোখদুটো জ্বলে উঠেছে তার, শীর্ণ গাল দুটোর ওপর জেগে উঠেছে লাল দগ্‌দগে ছোপ। পিছনের আসনটার ওপর হাতড়াতে হাতড়াতে প্যাঁশনেটা

খুঁজে বের করল সে, তেলেগিনকে ভালো করে দেখবার জন্য চোখে এঁটে নিল সেটা।

"কী ব্যাপার—রেজিমেন্টের মধ্যে জ্যান্ত মোরগ এল কি করে?"

"রিফিউজি এসেছে আবার—কমিসারকে রিপোর্ট করেছি। কুড়ি গাড়ি বোঝাই মেয়ে আর বাচ্চাকাচ্চা। এ এক জঘন্য ব্যাপার!"—মগের চা নাড়তে নাড়তে বলল তেলেগিন।

"কোথা থেকে এল?"

"প্রিভল্‌নায়া থেকে। পুরো এক ট্রেন ঠাসা হয়ে আসছিল, কিন্তু মাঝপথে কসাকরা হামলা করে ওদের ওপর। সবাই ভিনদেশী, ভয়ানক গরীব। গাঁয়ের লোকদের নিয়ে একটা ফৌজী দল তৈরি করেছিল দু'জন কসাক অফিসার, রাতে হামলা চালিয়ে তারা গ্রামের সোবিয়েত ভেঙে দিয়েছে, কয়েকজন লোককে ফাঁসিও দিয়েছে।..."

"অর্থাৎ এক কথায় সেই একই বস্তাপচা গল্প,"—প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করল সাপোঝ্‌কভ। মদে একেবারে চুর হয়ে আছে মনে হল,—তেলেগিনকে ডেকেছিল সে স্রেফ মনের বোঝা হাল্কা করে সব খুলে বলবার জন্য।...ইভান ইলিয়িচের মনে হচ্ছিল সারা শরীরটা যেন তার ক্লান্তিতে ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কিন্তু গদী-আঁটা আসনে বসে চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে এত আরাম যে সে আর নড়লো না সেখান থেকে—যদিও সার্গি সার্গিয়েভিচের সঙ্গে আলাপে তার বিশেষ কোনো লাভ নেই জানতো সে।

"তোমার বউ কোথায় তেলেগিন?"

"পিতার্সবুর্গে।"

"অদ্ভুত ছোকরা দেখছি। শান্তির সময় হলে তোমাকে মানাতো ঘর-গেরস্ত-করা খাঁটি সংসারী লোক হিসেবে, সঙ্গে সতীসাধ্বী গৃহিণী, লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে দুটি, আর একটি গ্রামোফোন।. .কোন্ দুঃখে লাল ফৌজে এলে হে? মারা পড়বে, তা জেনো..."

"আগেই তো বলেছি তোমাকে।..."

"পার্টির মধ্যে ঢোকার ফিকিরে এ-সব চাল ধরোনি তো?"

"যদি আদর্শের প্রয়োজনে তা করতে হয়, তা হলে নিশ্চয়ই পার্টিতে যোগ দেব।"

ঝাপ্‌সা কাঁচের আড়ালে সাপোঝ্‌কভের চোখজোড়া কুঁচকে গেল। বলল ঃ

"তিন তিনবার আমায় যদি গরম জলে সেদ্ধও করো তবু আমায় কমিউনিস্ট বানাতে পারবে না।"

"অদ্ভুত যদি কেউ থাকে, সে তুমি, সার্গি সার্গিয়েভিচ্।"

"মোটেই না। সোজা কথা হল আমার মাথায় ডায়ালেকটিক্স্ ঢুকবে না। আমি হলাম আসলে একটি বুনো, যে কোনো সময়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে যাবার জন্য তৈরি। হুম্! তুমি তা হলে আমাকে অদ্ভুত ভেবেছ!"

মনে হল একটা পরিতৃপ্তির আওয়াজ করল সে মুখ দিয়ে। "সেই অক্টোবর থেকে আমি সোবিয়েতের পক্ষে লড়াই করছি। হুম্। ক্রপৎকিন পড়েছ তুমি?"

"না, পড়িনি।"

"সে তো বোঝাই যাচ্ছে।...সবকিছু এমন বিরক্তিকর, বুঝলে হে বুড়ো... বুর্জোয়াদের দুনিয়াটা তো নরকের ইতরামি আর একঘেয়েমিতে ভরা। আর আমরা যদি জিতি তা হলে কমিউনিস্ট দুনিয়াটাও হবে একঘেয়ে, শুধু তাই নয়, নেহাৎই আটপৌরে—কেবল ভালোমানুষিতা আর ক্লান্তিকর একঘেয়েমি।...কিন্তু বুড়ো ক্রপৎকিন ছিলেন ভারি চমৎকার লোক..... কেবল কবিতা, স্বপ্ন আর শ্রেণীহীন সমাজের ভাবনা।...বড়ো উঁচু-নজরের খানদানী আদমি ছিলেন তিনি। বলতেন: 'মানুষকে নৈরাজ্য স্বাধীনতা দিয়ে দাও, দুনিয়ার সবচাইতে বড়ো পাপ—বড়ো-বড়ো শহরগুলোর শেকল আল্‌গা করে দাও, দেখবে শ্রেণীহীন মানুষ কেমন করে খোলা আকাশের নীচে সহজিয়া স্বর্গ গড়ে তোলে। তুলবেই তো, কারণ মানুষের মূল প্রবৃত্তিই যে প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম...' হাঃ—হাঃ!"

সাপোঝ্‌কভ তীব্রকণ্ঠে হেসে উঠল যেন অদৃশ্য কোনো প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপ করে; ওর প্যাঁশনে-জোড়া নেচে উঠল নাকের গোড়ার উঁচু হাড়টার ওপর। হাসতে হাসতেই সে মাথা নিচু করে আসনের তলা থেকে বার করল মদ-ভর্তি একটা টিনের ক্যানেস্তারা। পেয়ালায় খানিকটা ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল, তারপর এক-টুকরো চিনির দলা ভেঙে নিল মট্ করে।

"আমাদের এই রুশ বুদ্ধিজীবীগুলোর ট্রাজেডিটা কি জানো তো? আমরা বেড়ে উঠেছিলাম ভূমিদাসপ্রথার শান্তিময় পক্ষপুটে; তারপর যখন বিপ্লব এল, আমরা যে শুধু ভয়ে আধমরা হয়ে গেলাম তাই নয়, শিরোঘূর্ণন জাতীয় রোগও দেখা গেল আমাদের মধ্যে।...ভয়-কাতুরে এই মানুষগুলোকে সত্যিই এতটা বিশ্রী রকম ঝাঁকুনি দেওয়া উচিত হয়নি, তাই না? আরামের কুঞ্জবনে বসে আমরা পাখির ডাক শুনতাম আর নিজেদের মনেই বলতাম: 'আচ্ছা, সবাইকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখবার একটা উপায় খুঁজে পেলে বেশ হ'ত না এই সময়?' এই ধরনের লোকই তো আমরা।...পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু বড়ো চালাক লোক, তারা হল বুর্জোয়াদের একেবারে ক্ষীরা-শটুকু। বড়া নিয়মে বাঁধা তাদের কাজকর্ম—বিজ্ঞান ও শিল্পকে উন্নত করো, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দাও ভাব-বাদের ঘুমপাড়ানি মোহজাল।.. ...ওখানকার বুদ্ধিজীবীরা জানে তারা কি জন্য বেঁচে আছে। আর এখানে—রাম বলো! কার সেবা করছি আমরা? আমাদের কর্তব্য কাজটা কি? একদিকে আমরা হলাম 'স্লাভোফিল'-দের সঙ্গে হরিহর-আত্মা * —ওদেরই

---

* স্লাভোফিল (স্লাভ-প্রেমিক)—উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাশিয়ার এক বিশেষ চিন্তাজগতের প্রতিনিধিত্ব করত এরা। রাশিয়ার নেতৃত্বে স্লাভ-জাতি যাতে ঐক্যবদ্ধ হয় তারই জন্য এরা ওকালতি করত। এরা ছিল (পশ্চিম-ভক্ত) 'অক্‌সিডেন্টোফিল্'-দের উল্টো। এরা বলতো যে রুশ জাতির বিকাশের এক

মিলিয়ে যাচ্ছে।' এই আওয়াজই ছড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল জনতার মধ্যে, ঠিক ঐ রাস্তাতেই যাতে বুদ্ধিজীবীরা ভাবে, সেইরকম তালিম দেওয়া উচিত ছিল তাদের।.....কিন্তু আমরা তখন আনন্দাশ্রুর বিলাস-বন্যায় গা ভাসিয়ে দিলাম ঃ 'অহো, কি বিশাল এই রুশভূমি, সকল দেশের সেরা! মুক্তবায়ুর মতো স্বাধীন দেশের মুঝিকরা, তুর্গেনিভের মানস-কন্যাদের প্রাসাদ আবাসে কারুর কলুষস্পর্শ পড়ে নি, রহস্যময় এদেশের মানুষের আত্মা,—অর্থলোলুপ পাশ্চাত্যের মতো নয়.....।' আর এই ধরনের সব স্বপ্নকেই আমি এখন লাথিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছি।....."

সাপোঝকভ আর বলতে পারল না। জ্বালা ধরেছে ওর মুখে। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল ও আসলে যা বলতে চেয়েছে তা প্রকাশ করতে পারে নি। তেলেগিন হাঁ করে বসে ছিল ওর কথার তোড়ে হতভম্ব হয়ে, হাঁটুর ওপর রাখা মগের মধ্যে চা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। করিডোরে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল, বিশাল-বপু কেউ এগিয়ে আসছে বলে মনে হল। কামরার দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে নাতিদীর্ঘকায় একজন চওড়া-কাঁধ লোক, প্রশস্ত কপালের ওপর লেপটে আছে কালো চুল। বাতিটার নীচে এসে নিঃশব্দে বসল সে, হাঁটুর ওপর রাখল প্রকাণ্ড বাহুদুটো। জলে-রোদে পোক্ত মুখের ওপর অল্প-অল্প ভাঁজ পড়েছে কাটা দাগের মতো, গভীর চোখের কোটর আর সামনে-ঝুলে-পড়া ভুরুর ছায়ায় চোখজোড়া সহসা নজরেই পড়ে না। লোকটি হল কমরেড গিম্‌জা, রেজিমেণ্টের বিশেষ বিভাগের অধিকর্তা।

"আবার মদ ধরেছে তো?" কোমল অথচ গম্ভীর গলায় বলল সে ঃ "একটু সাবধান হও, কমরেড।....."

"মদ? নিকুচি করেছে! দেখতে পাচ্ছ না চা খাচ্ছি দু'জনে মিলে?" বলল সাপোঝ্‌কভ।

গিম্‌জা আসনে স্থির হয়ে বসেই গম্‌গমে ভারি গলায় বলে উঠল ঃ

"মিছে কথা বলে আরও খারাপ করে দিচ্ছ ব্যাপারটা। তোমার কামরার মধ্যে তো বেশ গন্ধ পাচ্ছি মদের, মাইলখানেক দূর থেকেও পাওয়া যায় গন্ধটা। মালগাড়িতে বসে সৈন্যরাও উশখুস্‌ করছে, ওরাও তো গন্ধ পেয়েছে।.....তোমার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে এ নিয়ে যেন এর আগে যথেষ্ট গোলমাল পোয়াতে হয় নি আমাদের! তার ওপরে আবার ঘাঁটিয়ে তুলেছ তোমার ওই রাবিশ-মার্কা দর্শনের কথা—তাই পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তোমার এখন রঙ ধরেছে।"

"বেশ তো, মাতাল হয়েছি.....এবার গুলি করে মারো আমায়?"

"অনায়াসেই তোমায় গুলি করে মারার ব্যবস্থা করতে পারি, সে তুমিও ভালো করেই জানো; মারছি না যে তার কারণ হল তোমার লড়াইয়ের ক্ষমতা।....."

"তামাক ছাড়ো তো খানিকটা"—বলল সাপোঝ্‌কভ।

রাজকীয় ভঙ্গীতে গিম্‌জা পকেট থেকে একটা সুতীকাপড়ের থলি বের করল। তারপর তেলেগিনের দিকে ঘুরে গম্ভীর ভারি গলায় বলতে শুরু করল ঃ

বিশেষ বিভাগেরই একজন কমরেড, সদর দপ্তর থেকে সদ্য ফিরেছে। এখন তো বুঝতে পারছ গিম্‌জা কেন অমন মাথায় ঘা-ওয়ালা ভালুকের মতো করছে?.....”

ভোরের আকাশের তারা এতক্ষণে ম্লান হয়ে এসেছে। গাড়িগুলোর মধ্যে আবার মোরগটা ডেকে উঠল। ঘুমন্ত শিবিরের ওপর শিশির পড়ছে। তেলেগিন তার নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে বুটজুতো জোড়া খুলে ফেলল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গা এলিয়ে দিল বাঙ্কের ওপর, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠল স্প্রিংগুলো।

একেক সময় তেলেগিনের মনে হয়েছে, তার জীবনে ক্ষণিকের জন্য যেটুকু সুখ এসেছিল, সবুজ স্তেপ-প্রান্তরের বুকে তা যেন সামান্য স্বপ্নের মতোই, ঘূর্ণ্যমান চাকার তালে তালে এগিয়ে চলেছে।...এক সময় তার জীবনটা ছিল শান্তিময়, সাফল্যভরা ঃ ছাত্রজীবন, পিতার্সবুর্গের সেই অপার অগাধ পরিসর, নিজের কাজের তাড়া, ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপে তার ফ্ল্যাটটিতে যে-সব বন্ধুপাগলদের সে পুষতো তাদের সেই নিরুদ্বেগ ভাবনাহীন আড্ডা। ভবিষ্যৎকে তখন মনে হত বুঝি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভাবেই নি কোনো দিন। মাথার ওপর দিয়ে এক-এক করে বহু বছর কেটে গেছে নির্ঝঞ্ঝাট অলস গতিতে। ইভান ইলিয়িচ জানতো, তারই মতো আরও হাজারটা লোক যেমন করেছে সেও তেমনি বিচারবুদ্ধিসহকারে তার ভবিষ্যতের ইতিকর্তব্য সমাধা করবে, এবং তারপর যখন তার চুলে পাক ধরবে, পিছনপানে ফিরে সে তার কাজের হিসেব-নিকেশ নিতে গিয়ে দেখবে যে এক দীর্ঘপথ সে অতিক্রম করে এসেছে কোনো বিপজ্জনক চোরাবালিতে পা না বাড়িয়ে। তারপর এল দাশা, ওর ছাঁপোষা গদ্যময় জীবনের বেড়া ভেঙে প্রবেশ কবল সে প্রতাপ-মণ্ডিতা হয়ে, তার মেঘ-মেদুর চোখের দ্যুতিতে এক ভীতিপ্রদ আনন্দের ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু তখনও, ওর অন্তরের অন্তস্তলে মুহূর্তের জন্য উঁকি দিয়েছিল ছোট্ট একটু সন্দেহ ঃ হয়তো ওর ভাগ্যে সুখ নেই! যা হোক্‌, এ সন্দেহকে ও মন থেকে তাড়িয়ে দেয়, ওর বাসনা ছিল যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাশার সঙ্গে ও সুখের নীড় বাঁধবে। তারপর যখন সাম্রাজ্যের প্রাসাদ-হর্ম্য ভেঙে পড়ল, যখন চারদিকে বিশৃঙ্খলা, যখন পনের কোটি লোক যন্ত্রণা ও ক্রোধে অধীর হয়ে গর্জে উঠেছে, তখনও ইভান ইলিয়িচ কল্পনা করে চলল—ঝড় তো শেষ হবেই, দাশার দুয়ারের সামনের আঙিনাটাও নিশ্চয়ই বর্ষণের পর আবার শান্তির পরিবেশে ঝল্‌মল্‌ করে উঠবে।

তারপর,—সেই ইভান ইলিয়িচ এখনও আগের মতো আবার সৈন্যবাহী ট্রেনের একখানি বাঙ্ক দখল করে চলেছে—তার পেছনে লড়াই গতকালের, সামনে লড়াই আগামীকালের। এখন বেশ পরিষ্কার যে অতীতে আর ফিরে যাওয়া চলবে না। এখন তার ভাবতে লজ্জা করে, এক বছর আগে সে কামেনভো-অস্ত্রভ্‌ স্ট্রীটের সেই ফ্ল্যাটটা সাজানোর ব্যাপার নিয়ে মিছিমিছি কতো হৈ-চৈই না করেছিল, দাশার জন্য মেহগনি কাঠের খাটটা এনেছিল নেহাৎ ওর মরা বাচ্চাটির সেবায় লাগবে বলেই বুঝি।

দাশাই প্রথম জড়িয়ে পড়ে ঘূর্ণিপাকের মধ্যে। 'সামার পার্কের' কাছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'লাফানে গুণ্ডারা', মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল মরা শিশুটির : দাশার কাছে বিপ্লবের অর্থ হল এই! ক্ষুধা, অন্ধকার, আর নানা-রকমের হুকুমনামা যার প্রতিটি ছত্র ঘৃণা আব রোষে ভরা—দাশার কাছে বিপ্লব এইসব অর্থই বহন করে এনেছে! বিপ্লব বলতে দাশা বুঝেছে ছাদের ওপর বাতাসের অবিশ্রান্ত শোঁসানি। হিম-জমা জানলার শার্সিতে তুষার-ঝড়ের ঝাপটায় সে শুনেছে বিপ্লবের কণ্ঠস্বর—'আমাদের-কেউ-নয়-এরা-আমাদের-কেউ-নয়!' পিতার্সবুর্গের এক মেঘলা বসন্ত-দিনে ইভান ইলিয়িচ বাড়ি ফিরল শরীফ মেজাজে। ভিজে বাতাস বইছিল, কার্নিশ বেয়ে ঝরছিল জল। জীর্ণ পাইপগুলো থেকে ঝুপ্-ঝুপ্ করে পড়ছিল বরফের কণা। ইভান ইলিয়িচের কোটের বোতাম খোলা। দাশার দিকে ও তাকিয়ে রইল অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে। ওর দৃষ্টির সামনে যেন কুঁকড়ে গেল দাশা। শাল দিয়ে থুতনি অবধি ঢেকে রেখেছিল সে। বলল : "ইচ্ছে হয়, ইভান, দেয়ালে ঠুকে ঠুকে থেঁতলে ফেলি মাথাটা, যাতে ভুলতে পারি সবকিছু, চিরকালের মতো।.....তখন হয়তো তোমার সঙ্গিনী হতে পারব আবার। রোজ রাতে ওই ভয়ানক বিছানাটায় গিয়ে আশ্রয় নেয়া, আর রোজ সকালে উঠে একেকটা অভিশপ্ত দিনের মুখ দেখা—এ আর সইতে পারছি না আমি।...একেবারেই পারছি না সইতে।...ভেবো না যে আমি ভালো ভালো জিনিস আর এটা-সেটার কাঙাল হয়ে উঠেছি।..... আমি চাই একটুখানি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে।...উচ্ছিষ্টে ভক্তি নেই আমার।.....তোমাকে আমি আর ভালবাসতে পারছি না, আমায় ক্ষমা করো।"

কথা শেষ করেই দাশা ঘুরে দাঁড়াল।

চিরকালই দাশা আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে একটু কঠিন। কিন্তু আজ সে রীতিমত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।

"কিছুদিনের জন্য আমাদের আলাদা হয়ে থাকাই বোধহয় ভাল, দাশা।"—বলল ইভান ইলিয়িচ।

তারপর, পুরো শীতকালটার মধ্যে সেই প্রথম সে লক্ষ্য করল দাশার ভুরুদুটো কেমন আনন্দে উঁচু হয়ে উঠেছে, চোখে একটা অদ্ভুত আশার আলো; ওর পাংশু শীর্ণ মুখের ওপর একটা বেদনাময় কম্পনের রেখা খেলে গেল...

"আমারও মনে হয় আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই ভাল, ইভান....."

তারপর থেকে রুবলেভের মারফত ইভান সমানে দরখাস্ত করে এসেছে লাল-ফৌজে ভর্তি হবার জন্য। অবশেষে মার্চ মাসের শেষে একটা সৈন্যবাহী ট্রেনে চেপে সে রওনা হল দক্ষিণের দিকে। 'অক্টোবর' স্টেশনে ওকে বিদায় দিতে এসে আকুলভাবে কাঁদছিল দাশা, ওর কামরার জানলাটা যখন দাশার পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তখন সে শাল দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কতো শত মাইল পথ অতিক্রম করেছে ইভান ইলিয়িচ, কতো যুদ্ধ, কতো ঝড়ঝাপ্টা গেছে তার ওপর দিয়ে, কতোবার অবসন্ন

"যাও তাহলে, তাই চেষ্টা করো",—একটা অলক্ষুণে ধরনের জোর দিয়ে গিম্‌জা বলল কথাটা। (সবাই তাকিয়ে রইল তার দিকে)। "কি করতে হবে আমি বলছি আপনাদের—চারজন লোককে নিন, এই তেলেগিনকেও সঙ্গে নিন, তারপর ট্রলিতে চেপে ছুটে চলে যান সদর দপ্তরে। হুকুম না নিয়ে ফিরবেন না যেন। সাপোঝ্‌কভ্‌, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ সরোকিনকে একটা চিঠি লিখে দাও তো।"

একটা ঘেসো ঢিবির চুড়োয় দাঁড়িয়ে একজন ঘোড়সওয়ার; হাতের আড়াল থেকে সে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল রেল লাইনের দিকটা—ধুলোর একটি মেঘ এগিয়ে আসছিল সেদিক থেকে।

মেঘটা যখন একটা কাটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে, ঘোড়সওয়ারটি প্রথমে তার সামনের পা দিয়ে ঘোড়াটাকে স্পর্শ করল, তারপর রেকাবটা ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাদামী রঙের রোগা মর্দা ঘোড়াটা ঝাঁকড়া-মাথা দুলিয়ে ঘুরে নেমে গেল ঢিবি থেকে। ঢিবিটার নিচে দু'দিকেই ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর অফিসারদের একটা পল্টন ইতস্তত ছড়িয়ে শুয়ে আছে টাটকা তৈরি মাটির স্তূপের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে।

জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে ফন মেক বলল—"একটা ট্রলি।" ঘোড়াটার হাঁটুর ওপর চাবুকের বাঁট দিয়ে গুঁতো মেরে সে হুকুম করল শুয়ে পড়বার জন্য। একগুঁয়ের মতো ঘোড়াটা প্রথমে খুর দিয়ে মাটি ঘষল, কানদুটো নাড়লো, তারপর অবশ্য বশ মেনে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শুয়ে পড়ল—মুখের বন্ধনীটা মাটি স্পর্শ করেছে। রোগা ঘোড়াটার একপাশ ক্রমাগত ফুলে উঠছিল আর চুপসে যাচ্ছিল।

ফন মেক তখন ঢিবিটার ওপরে গিয়ে রশ্‌চিনের পাশে বসেছে। ঠিক সেই সময় কাটা পাহাড়ের আড়াল থেকে আবার দৃষ্টিপথে এল সেই ট্রলিটা—এখন পরিষ্কার দেখা গেল গ্রেটকোট-পরা ছ'জন লোককে বসে থাকতে।

"লালগুলো এসেছে!" ফন মেক বলল : "ওই রকমই আন্দাজ করে-ছিলাম!" বাঁ দিকে মাথা ঘুরিয়ে হুকুম করল সে : "স্কোয়াড!" ডান দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে বলল : "প্রস্তুত হও! চলন্ত জিনিসটার ওপর দ্রুত গুলি চালাতে হবে। ফায়ার!"

ঢিবিটার আশেপাশের বাতাস একটা প্রচণ্ড আর্তনাদে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, মনে হল যেন একটা কলপ-দেওয়া সুতীর কাপড় পড়্‌পড়্‌ করে চিরে ফেলা হল। ধোঁয়ার মেঘের আড়াল থেকে দেখা গেল একটি লোক ট্রলি থেকে ছিটকে পড়েছে, একদম গড়াতে গড়াতে নেমে যাচ্ছে রেল লাইনের পাশের ঢালু জমি বেয়ে, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে ঘাসগুলো।

দ্রুত-বিলীয়মান ট্রলিটা থেকে পাঁচজন লোক একসঙ্গে গুলি চালাল—তিনটে রাইফেল আর দুটো রিভলবারের গুলি। আর মাত্র একমিনিট বাদেই ট্রলিটা আরেকটা কাটা পাহাড়ের আড়ালে সিগন্যাল-বাক্সের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ফন মেক তার ঘোড়ার চাবুকটা সাঁই-সাঁই করে ঘুরিয়ে পাগলের মতো চীৎকার করে উঠল :

সৈনিকটি চোখ খুলল। একঘেয়ে তন্দ্রাতুর অবসাদে নিষ্প্রভ চোখদুটো। নেয়াড়াগোছের থ্যাবড়া-নাক। সকলোভ্স্কিকে সে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল—ওর মুখ, ওর কাপড়-চোপড়, ইস্তক বুটজোড়া। তারপর দেখল তেলেগিনকে, ওই একইরকম ভাবে। অধৈর্য হয়ে কমিসার এগিয়ে গেল তার দিকে।

"উত্তর দাও কমরেড, দয়া করে। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই খুব জরুরি প্রয়োজনে।"

"কর্তব্যরত শান্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার হুকুম নেই", কপাল-ঢাকা চুলওয়ালা যুবকটি বলল।

"উঃ ভগবান! এমন একেকটি কেতা-কানুনওয়ালা শুয়োরকে সদর দপ্তর-গুলোয় না রাখলে যেন ওদের চলে না!"—খেপে গিয়ে বলল সকলোভ্স্কি : "শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আর্জি করছি কমরেড : কমরেড সবোকিন কি ভেতরে আছেন?"

"বলতে পারি না।"

"তাহলে চীফ-অব-স্টাফ কোথায়? তিনি কি অফিসে?"

"হ্যাঁ—অফিসেই আছেন।"

সকলোভ্স্কি ইভান ইলিয়িচের জামার হাতা ধরে সিঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। শান্ত্রীটা কিন্তু চেয়ার ছেড়ে না উঠেই, একপাশে ঝুঁকে পড়ল। দুই হাঁটুর মাঝখান থেকে টেনে বার করল রাইফেলটা।

"কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?"

"কোথায়? চীফ-অব-স্টাফের কাছে!"

"পাস আছে সঙ্গে?"

ট্রলিতে চেপে তারা ছুটে এসেছে কোন্ কাজের তাড়ায়, শান্ত্রীর কাছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমিসারের মুখ দিয়ে বিলক্ষণ গাঁজলা উঠে এল। শান্ত্রীটা আগাগোড়া চুপ করে তার কথাগুলো শুনল—কেবল তার চোখজোড়া একবার মেশিন-গানের ওপর, একবার দেয়ালে টাঙানো নির্দেশনামা, হুকুম, নোটিশ ইত্যাদির ওপর ঘুরতে লাগল।

অবশেষে সে বিরক্তিভরে বলে উঠল : "আপনাদের মতো শিক্ষিত লোক, আপনাদের অন্তত ভালো করে জানা উচিত ছিল! যদি সঙ্গে পাস থাকে তাহলে যেতে পারবেন, যদি না থাকে তাহলে কুকুরের মতো গুলি করে মারতে বাধ্য হব।"

মেনে নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না তখন—অবশ্য চত্বরটার উল্টো দিকে নিশ্চয়ই কোথাও পাস বিলি হচ্ছিল, কিন্তু সেখানে গেলেও নিশ্চয়ই তাদের বলা হত যে কম্যাণ্ডাণ্ট সেদিনের মতো বিদায় নিয়েছেন। সকলোভ্স্কি বড়ো হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল নাভি পর্যন্ত চেরা শার্ট গায়ে একটি হ্রস্বকায় মূর্তি চত্বর ছেড়ে দরজার ভেতরে একদৌড়ে ঢুকে গেল প্রচণ্ড বুটের আওয়াজ করতে করতে।

"মিত্কা—সাবান বিলি করা হচ্ছে....."

দিকের হাতাটা দুলিয়ে তিনি সিধে চলে এলেন সকলোভ্স্কি ও তেলেগিনের সামনে। একটা বন্য দৃষ্টিতে তাকালেন ওদের মুখের দিকে। তারপর তিনি ঘুরলেন চীফ-অব-স্টাফের দিকে, রাগে তাঁর নাকের ফুটো কাঁপছে।

"আবার সেই সাবেকী হুকুমতের চাল ধরেছ! এভাবে লোকের কাছে 'চুপ করুন!' বলে চেঁচাবার মানেটা কি? ওঁদের যদি গলতি হয়ে থাকে, তবে ওঁরা গুলি খেয়ে মরবেন।...কিন্তু আপনার এই জেনারেল-মার্কা মেজাজ আমি বরদাস্ত করব না..."

চীফ-অব-স্টাফ চুপচাপ মাথা নিচু করে হজম করে গেলেন তিরস্কারটা। জবাব দেবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর—এ যে স্বয়ং কম্যান্ডার সরোকিন।

"বসুন আপনারা কমরেডস্, শুনছি আমি আপনাদের কথা,"—জানলার নিচের কাঠটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরভাবে বললেন সরোকিন।

সকলোভ্স্কি আবার তাদের আসার কারণটা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল ঃ ভারনাভ রেজিমেন্টের কাছেই 'সর্বহারা' রেজিমেন্টের ঘাঁটি, ওদের অবিলম্বে সাহায্য দেবার জন্য ভারনাভ রেজিমেন্টকে অনুমতি দিতে হবে। বিপ্লবী কর্তব্য তো বটেই, তা ছাড়া সাধারণবুদ্ধিতে দেখতে গেলেও এ-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছেঃ 'সর্বহারা'রা যদি অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে ভারনাভ রেজিমেন্টও মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

সরোকিন সামান্য এক মুহূর্তের জন্যই জানলার কাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপরেই তিনি এক দরজা থেকে আরেক দরজা অবধি পায়চারি করতে শুরু করলেন আর মাঝে মাঝে ছোটখাটো দু'একটা প্রশ্ন ছুঁড়তে লাগলেন। যখনই তিনি সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথার ঘন চুল ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। সৈন্যরা তাঁকে ভালবাসতো তাঁর উদ্দীপনা আর সাহসের জন্য। তিনি জানতেন কেমন করে সভায় বক্তৃতা দিতে হয। তখনকার দিনে সামরিক বিজ্ঞানের বদলে এই ধরনের গুণ থাকলেও চলে যেত। সরোকিন একসময় ছিলেন কসাক অফিসার, ক্যাপ্টেনের পদে। য়ুদেনিচের অধীনে ট্রান্স-ককেসিয়ায় লড়াইও করেছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর কুবানে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের গ্রাম পেত্রোপাভ্লোভ্স্কায়ায় একটি গেরিলা ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলেন। একাতেরিনোদার অবরোধের সময় এই ব্যাটালিয়নটি সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে। অবিলম্বেই তাঁর গ্রহ একেবারে তুঙ্গে উঠে গেল। মান-যশের ঠেলায় তাঁর মাথাটি গেল বিগড়ে। মনের পাশব প্রবৃত্তিগুলো এখন ফেঁনিয়ে উঠে উছলে পড়তে লাগল—লড়াইয়েরও কমতি নেই, মদ-ফুর্তিরও শেষ নেই। আর চীফ-অব-স্টাফও এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে সুন্দরী মেয়েরা তাঁকে সবসময় ঘিরে রাখে, বিলাস আর লাম্পট্যের সব রকম উপচারে তাঁকে যেন ডুবিয়ে রাখা হয়।

"আমার স্টাফের কাছ থেকে কী জবাব পেয়েছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি। সকলোভ্স্কি কথা বন্ধ করল। নোংরা দলা-পাকানো একটা রুমাল দিয়ে উত্তেজনাভরে কপালটা মুছল সে।

গেলেন। যাওয়ার সময় দরজাটা এমন জোরে বন্ধ করে গেলেন যে খানিকটা চুণ-বালির আস্তর খসে পড়ল।

দরজাগুলোয় একের পর এক দুম-দাম করে আওয়াজ হতে লাগল, কম্যান্ডার-ইন-চীফের ক্রুদ্ধ পায়ের শব্দ ক্রমেই দূরে মিলিয়ে গেল।

চীফ-অব-স্টাফ এবার সান্ত্বনার সুরে ভারিগলায় বলতে শুরু করেছেন ঃ

"আমি আপনাদের বলছি কমরেডস্—এই হুকুমনামাটার ওপর যদি আমি সই দিতাম তাহলে আর দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকতো না।"

"দুর্ভাগ্য কেন?"—গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল সকলোভ্স্কি।

অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকালেন চীফ-অব-স্টাফ।

"আন্দাজ করতে পারছেন না আমার বক্তব্যটা?"

"না।"

সকলোভ্স্কির চোখের কোণাদুটো কেঁপে উঠল।

"আমাদের ফৌজের কথাই বলছি.. "

"হ্যাঁ, কী হয়েছে?"

"একজন রেজিমেন্টের কমিসারের কাছে সামরিক গোপন-তথ্য প্রকাশ করার কোনো অধিকার নেই আমার। আপনি তো তা নিজেই জানেন কমরেড, তাই না? এইরকম আচরণের জন্য আপনিই তো প্রথম আমায় গুলি করে মারার ব্যবস্থা করবেন।...কিন্তু এর মধ্যেই তো আমরা অনেকখানি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। বেশ, তাহলে আসুন।...সব দায়িত্ব কিন্তু আপনারই থাকল..."

দেয়ালে একটা মানচিত্র টাঙানো ছিল, ছোট ছোট নিশান আঁটা রয়েছে তাতে। চীফ-অব-স্টাফ এগিয়ে গেলেন সেই মানচিত্রটার দিকে। সকলোভ্স্কি আর তেলেগিনও ততক্ষণে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। চীফ-অব-স্টাফ টিউ-নিকের নিচে তাঁর কাঁধের হাড় দুটো কুঁচকে রইলেন—একেবারে ঘাড়ের কাছে দুটো মুখ থেকে গরম নিঃশ্বাস পড়ছে, স্পষ্টতই তেমন আরামবোধ করছিলেন না তিনি। যাই হোক, পকেট থেকে একটা নোংরা দাঁত-খোঁচানি বের করে তিনি সেটির চিবোনো দিকটা মানচিত্রের ওপর ধরলেন। তারপর দক্ষিণের দিকের ত্রিবর্ণ পতাকাগুলো থেকে শুরু করে ঘন জমাটবাঁধা লাল পতাকাগুলো পর্যন্ত কাঠিটা বুলিয়ে নিয়ে বললেন ঃ

"এই সব জায়গা দিয়ে শ্বেতরক্ষীরা রয়েছে।"

"কোথায়? কোন্ জায়গায়?"

সকলোভ্স্কি মানচিত্রটার উপর একেবারে ঝুঁকে পড়ে অবাক চোখদুটো বুলিয়ে নিল সেটার গায়—"ও, এটি তো তর্গোভায়া..."

হ্যাঁ—তর্গোভায়াই বটে। এ-জায়গাটা যখন হাতছাড়া হবে, শ্বেতরক্ষীদের কাছে রাস্তা তখন প্রায় পরিষ্কার।..."

রুমাল বের করে মোটা লাল গর্দানটা মুছলেন, তারপর দরজায় টোকা দিয়ে সাড়া পাবার অপেক্ষা না রেখেই ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

কামরার মাঝখানটায় খবরের কাগজ-পাতা একটা টেবিল—উচ্ছিষ্ট ডিশ আর মদের গেলাস এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে তাতে। টেবিলের সামনে বসে আছেন সরোকিন, তাঁর সিরকাশিয়ান টিউনিকের চওড়া হাতাটা গুটিয়ে রেখেছেন। সুন্দরপানা মুখটা তখনও আঁধার হয়ে আছে। ভিজে কপালের ওপর এসে পড়েছে এক গুচ্ছ কালো চুল। বিস্ফারিত চোখে তিনি বেলিয়াকভের দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন। তাঁর পাশে একটা টুলের ওপর বসে ছিল জেনা, পায়ের ওপর পা তুলে; তার মোজার গার্টার দুটো ও সেই সঙ্গে লেসের একটু আঁচলাও দেখা যাচ্ছিল। গীটারের তারে আঙুল বুলোচ্ছিল সে। নীল-চোখো তরুণী মেয়েটির ঠোঁট দুটো ভিজে, উগ্রভাবে রং ঘসেছে তাতে। টিকালো একরোখা নাক, মাথার সুন্দর চুল এলো-খোঁপা করে বাঁধা। কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে যে অসুস্থ রেখাদুটি প্রায় নজরেই পড়ে না, সেগুলোই তার কোমল মুখশ্রীতে একটা ক্ষুদে বন্যজন্তুর ভাব এনে দিয়েছে, মনে হয় বুঝি হিংস্র দাঁত লুকানো আছে সে মুখের আড়ালে। পাসপোর্টের পরিচয় অনুসারে ও ওম্স্কের লোক, একজন রেলকর্মচারীর মেয়ে; কিন্তু কেউ অবশ্য তা বিশ্বেস করে না—এমন-কি তার যে আঠারো বছর বয়েস আর নাম জেনাইদা কানাভিনা, তাও কেউ বিশ্বেস করে না। কিন্তু মেয়েটি চমৎকার টাইপ করতে জানে, ভদ্কা খেতে, গীটার বাজাতে, আর তোফা গানও গাইতে পারে। সরোকিন তাকে ভয় দেখিয়ে রেখেছেন, যদি সে সদর-দপ্তরের মধ্যে শ্বেতরক্ষীদের পচা-গলা নোংরামি ছড়ায় তাহলে নিজের হাতে তাকে গুলি করে মারবেন। আর তাই কারো কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

"বাঃ—বা! বেশ মজার লোক দেখছি!"—মাথা নেড়ে গোঁ-গোঁ করে বললেন বেলিয়াকভ। নিরাপত্তার খাতিরে দরজার একেবারে গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। "কী বিপদেই ফেলেছিলে আমাকে ভেবে দেখতো! দু'জন লোক এসেছে—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির লোক,—মিটিং করার ভয় দেখাচ্ছে তারা, আর তুমি কিনা চট্ করে ওদের দলে ভিড়ে গেলে? তার চেয়ে সোজা 'মর্স্'-টেলিগ্রাফের যন্ত্রটার কাছে গিয়ে একাতেরিনোদারে তার পাঠালেই পারতে?—ওরাও সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিত ছোট্ট ফুটফুটে একটি ইহুদীকে, তোমার স্টাফ গড়তো সে, বিছানায় তোমার শয্যাসঙ্গিনী হত, তোমার সঙ্গে পায়খানা অবধি যেত, আর তোমার প্রত্যেকটা ভাবনার ওপর নজরও রাখতো সেই সঙ্গে! ওঃ, কী ভয়ানক হতো তা হলে! কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ সরোকিনের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের দিকে ঝোঁক রয়েছে . বেশ তো, যাও না তাহলে। তাই করো! গুলি করেই মারো না হয় আমাকে, কিন্তু নিচু-পদের কর্মচারীদের সামনে তোমার ঐ রিভলবারের তড়পানি আমি বরদাস্ত করবো না। এর পরে আর কী করে শৃঙ্খলা থাকতে পারে, বলতে পারো? কী ঘোড়ার ডিম থাকবে তাই বলো!"

চীফ-অব-স্টাফের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই সরোকিন তাঁর প্রকাণ্ড

শেষ অবধি জেনা অবশ্য নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল। গীটারটা তুলবার জন্য যখন ও ঝুঁকে পড়েছে, ওর সারা মুখটা তখন লালে লাল। সুন্দর চুলের জটের ফাঁক দিয়ে ওর চোখ-জোড়া জ্বলছিল। ফুলে-ওঠা ঠোঁটের ওপর একবার জিভের ডগাটা বুলিয়ে নিল ও।

"যাঃ! বড়ো ব্যথা দিয়েছ!"

"শোনো হে কমরেডস, একটা বোতল আমি অন্য জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি..."

বেলিয়াকভের গলা দিয়ে বাকি কথাগুলো আর বেরুলো না। আঙুলগুলো চাগিয়ে তাঁর হাতখানা যেমন ছিল তেমনি শূন্যে উঁচোনো রইল। জানলার বাইরে একটা গুলির আওয়াজ হয়েছে, কয়েকটি কণ্ঠেব গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। জেনা তার গীটারটা নিয়ে যেন দমকা হাওয়ার মতোই ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেল। জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন সরোকিন। তাঁর মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন।

"তুমি যেও না কিন্তু, আমিই দেখছি ব্যাপারখানা কি", তাড়াতাড়ি বললেন চীফ-অব-স্টাফ।

সদর দপ্তরের চৌহদ্দির মধ্যে হৈ-হট্টগোল আর বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়ি তো নিত্যকার ব্যাপার। মোটামুটি দু'টো দল নিয়ে সরোকিনের ফৌজটি গড়ে উঠেছে: কুবান এলাকার কসাক দল,—যাদের কেন্দ্রটিকে সরোকিন নিজের হাতেই তৈরি করেছেন এক বছর আগে; আর উক্রেনীয় দল,—যারা উক্রেনীয় লাল বাহিনীগুলোরই হতাবশিষ্ট অংশ। এই বাহিনীগুলোই এক সময় জার্মানদের চাপে পড়ে পশ্চাদপ-সরণ করেছিল। কুবানের কসাকদের সঙ্গে উক্রেনীয়দের ঝগড়া বহুদিনকার। 'বিদেশের' মাটিতে যখন লড়তে হয, উক্রেনীয়রা নাকি তখন বড়ো একটা জান-প্রাণ দিয়ে লড়তে চায় না, গ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে চলে যাবার সময় ওরা নিজেদের জন্য খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে কোনোরকম কসুরই করে না।

হল্লা আর মারামারি রোজই লেগে আছে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যেন একটু বেশি রকমেব গুরুতর। তীব্র চীৎকার করে কসাকরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। লাল ফৌজেব কয়েকটি দল সচকিতভাবে ছুটে আসছিল বেড়া ও বাগানের আড়ালে-আড়ালে। স্টেশনের দিক থেকে বেপরোয়ারকমের গুলির আওযাজ আসছিল। সদর দপ্তরের একেবাবে জানলার নিচে চত্বরটার মাঝে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে একজন আহত কসাক। পাগলের মতো আর্তনাদ করছে সে।

এদিকে সদর দপ্তর ঘাঁটিতে তখন দারুণ আলোড়ন চলছে। সকালের দিকে যে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা একেবারে নিশ্চুপ হয়েছিল, এখন তা থেকে স্রোতের ধারার মতো খবর বেরুচ্ছে—প্রত্যেকটা খবরই আগের খবরটার চেয়ে চমকপ্রদ। এত ডামাডোলের মধ্যে যা বোঝা গেল তা হচ্ছে এই যে, সিসিকা-উমান্স্কায়া লাইন ধরে শ্বেতরক্ষীরা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে; আতঙ্কগ্রস্ত লাল সেনাদলগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে তারা। একেবারে সম্মুখের ইউনিটগুলো ফৌজী সদর দপ্তরে এসে পড়েছে, স্টেশনে ও গ্রামে লুটপাট চালাচ্ছে তারা। কুবান সৈন্যরা গুলি চালাতে শুরু করেছে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

"চোপরাও! তোমরা তো বিপ্লবী ফৌজ নও...তোমরা হচ্ছ একদল ডাকাত, একপাল শুয়োর।.....কোন্ বদমাইশগুলো গুজব ছড়াচ্ছে দেখিয়ে দাও একবার।... কোথায় সেই শ্বেতরক্ষী দালালগুলো!"

হঠাৎ ঘোড়াটাকে দাবড়ে নিয়ে তিনি একেবারে ভীড়ের মাঝখানে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুল দেখিয়ে বললেন :

"ওই একটিকে দেখা যাচ্ছে!"

যাকে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছিল, জনতা অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল—লম্বা, রোগা চেহারার লোক, নাকটা প্রকাণ্ড। একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে লোকটা হাতদুটো ছড়িয়ে এক-পা পেছিয়ে গেল। সরোকিন তাকে সত্যি-সত্যিই চিনতেন কিনা, অথবা প্রথম যে-লোকটার দিকে তাঁর চোখ পড়েছিল তাকেই শিকার বানিয়েছিলেন কিনা, তা আর কোনোদিনই জানা যাবে না।...জনতা রক্ত চাইছিল। বাতাসে সাঁই করে বাঁকা তলোয়ারটা ঘুরিয়ে সরোকিন লম্বা লোকটার ঘাড়ের ওপর বসিয়ে দিলেন এক কোপ। তীব্রবেগে ছিটকে বেরিয়ে এল রক্ত, সরোকিনের ঘোড়ার মুখটা ভিজে গেল।

"বিপ্লবী ফৌজ এই ভাবেই জনতার শত্রুকে শাস্তি দেয়!"

সরোকিন আবার তাঁর ঘোড়াটাকে দাবড়ে নিয়ে গেলেন রক্তাক্ত তলোয়ারটা শূন্যে ঝকমকিয়ে। মুখটা তাঁর পাংশু হয়ে গেছে, দেখলে ভয় করে। ভীড়ের মধ্যে তিনি ছুটতে লাগলেন গালাগাল, শাসানি আর সেই সঙ্গে ওদের প্রবোধ দিতে দিতে।

"কোথাও আমাদের ফৌজ উৎখাত হয়নি...শ্বেতরক্ষীদের স্কাউট আর গোয়েন্দারাই গুজব ছড়াবার চেষ্টা করছে।...ওরাই তোমাদের উস্কাচ্ছে লুটপাট করবার জন্য, ওরাই শৃঙ্খলা ভাঙছে।...কে বলেছে যে আমরা মার খেয়েছি? তোমরা নিজের চোখে হারতে দেখেছ? জানোয়ার সব? কমরেডস্, আমিই তোমাদের বরাবর লড়াইয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি—তোমরা তো আমাকে জানো। জানো আমার দেহে ছাব্বিশটা আঘাতের দাগ রয়েছে! আমার হুকুম, এখুনি লুটপাট বন্ধ করো তোমরা! সবাই গাড়িতে ফিরে যাও! আজই তোমাদের নিয়ে আমি আক্রমণ চালাবো। যারা ভীরু, যারা বেইমান তাদের ওপর এবার ক্রুদ্ধ দেশবাসী চরম শোধ নেবে।..."

জনতা কান পেতে শুনল কথাগুলো। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফকে একটিবার দেখবার জন্য তারা উৎসাহের আতিশয্যে একজন আরেকজনের কাঁধে চড়ে বসল। সামান্য দু'একটি কণ্ঠে গররাজির ভাব প্রকাশ পেলেও, বেশির ভাগই যে লড়াইয়ের জন্য উৎসুক সেটা বোঝা গেল। চারিদিকেই এক কথা : "যা বলেছেন ঠিক কথাই বলেছেন! আমাদের উনি নেতৃত্ব দিন তাহলে! আমরা ওঁর পেছনে রয়েছি।... কোম্পানি কম্যান্ডাররা এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, এবার তারা গুঁড়ি মেরে ফিরে এল। সৈন্যরাও নিজের নিজের সারিতে গিয়ে সামিল হল। সরোকিনের টিউনিকের বুকটা ছেঁড়া, কাটা ঘায়ের দাগ দেখাবার জন্য তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন জায়গাটা।...মুখটা

মধ্যে চেলিয়াবিন্স্কের ঘটনার কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। তারপর যখন আগুনে ঘি ঢালার মতো এই ঘটনার পরে পরেই আবার প্রজাতন্ত্রের উচ্চতম সামরিক সংসদের সভাপতির তরফ থেকে একটা বেইমানী হুকুমনামা প্রচারিত হল তখন তো শুরু হল রীতিমতো বিস্ফোরণ। হুকুমনামাটি ছিল এইরকম ঃ

"চেকদের নিরস্ত্র করিবার জন্য সমস্ত সোবিয়েতকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। এই হুকুম পালন করিতে গাফিলতি হইলে সোবিয়েতগুলিকে দায়ী করা হইবে। রেলপথের উপর কোনও চেককে সশস্ত্র অবস্থায় দেখিলে তাহাকে গুলী করিয়া মারিতে হইবে, কোনও সৈন্যবাহী-ট্রেনে একজন মাত্র সশস্ত্র চেক থাকিলেও আরোহী সমস্ত চেককেই গাড়ি হইতে নামাইতে হইবে এবং তাহাদের যুদ্ধবন্দী শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে।"

কিন্তু চেকদের যেমন চমৎকার শৃঙ্খলাবোধ, সংহতি আর লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা, ওদের মেশিনগান আর কামানও তেমনি অপর্যাপ্ত—অথচ এদিকে সোবিয়েতগুলির হাতে যে-সব লাল ফৌজীদল রয়েছে তাদের না আছে যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র, না আছে মাথার ওপর অভিজ্ঞ নেতৃত্ব। তাই ব্যাপার দাঁড়ালো উল্টো। সোবিয়েতরা চেকদের নিরস্ত্র না করে, চেকরাই বরং সোবিয়েতদের নিরস্ত্র করতে লাগল। এইভাবে তারা পেন্জা থেকে আরম্ভ করে ওম্স্ক পর্যন্ত সমগ্র রেলপথটার ওপরই কর্তৃত্ব কায়েম করে বসল।

প্রথম বিদ্রোহ শুরু হল পেন্জায়। চোদ্দ হাজার চেকের বিরুদ্ধে সেখানে সোবিয়েতরা পাঠালো পাঁচশো লালরক্ষী। লালরক্ষীরা রেলস্টেশন আক্রমণ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল। পেন্জা থেকে চেকরা অভিযাত্রী বাহিনীর ছাপার মেশিনটা দখল করে নিয়ে গেল নোট ছাপাবার জন্য। বেজেনচুক ও লিপিয়াগির কাছাকাছি এলাকায় এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে তারা লাল রক্ষীদের হারিয়ে দিল। তারপর দখল করল সামারা।

এইভাবে গৃহযুদ্ধের সময় আর এক নতুন রণাঙ্গনের উদ্ভব হল—ভল্গা এলাকা, উরাল ও সাইবেরিয়ার বিশাল অঞ্চল জুড়ে দ্রুত বিস্তৃত হল এই নতুন রণাঙ্গনের পরিধি।

খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন ডাক্তার দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্ বুলাভিন। কামানের গোলার গুরুগুরু আওয়াজ কান পেতে শুনছিলেন তিনি। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। ম্রিয়মান সূর্যের আলো নিষ্করুণভাবে এসে পড়েছে নিচু ঘরগুলোর দেয়ালের ওপর। খালি দোকানঘরের ঝুলকালিমাখা জানলা, দরজার ওপরকার অব্যবহার্য সাইনবোর্ড আর চুণের গুঁড়ো ছড়ানো অ্যাস্ফালটের রাস্তার ওপর রোদ এসে পড়েছে।

ডানদিকে যেখানে ডাক্তারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেখানে একটা কাঠের শীর্ষ-ফলক মাথা জাগিয়েছিল, দ্বিতীয় আলেকজান্দারের স্মৃতিস্তম্ভের ওপর যে বিবর্ণ নেকড়ার ফালিটা ঝুলত তাই জড়িয়ে আছে ওটার মাথায় পাশেই রয়েছে একটা

"ভগবানের দোহাই, বন্ধ করুন জানলাটা। আমাদের ওপর নজর রেখেছে ওরা।" খাবার ঘরটার দিকে যেতে যেতে ফ্যাঁস্-ফ্যাঁস্ করে চাপা গলায় বললেন গভিয়াদিন ঃ "পর্দাগুলো টেনে দিন। আচ্ছা, না, না, থাক, যেমন আছে ঐ ভাল! হ্যাঁ, দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্, আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে.."

"এ বান্দা তো আপনাদেরই সেবায় হাজির!"—বিদ্রূপভরা গলায় বললেন ডাক্তার। ময়লা, পোড়া-দাগ-লাগা অয়েলক্লথে মোড়া টেবিলটার একপাশে বসলেন তিনি ঃ "তা দাঁড়িয়ে কেন, বসতে আজ্ঞা হোক। কী বলবার আছে সব বলুন তাহলে।"

গভিয়াদিন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাতে। একটা পা নিচে গুটিয়ে নিয়ে ফিস্ফিস্ করে ডাক্তারের কানে বর্ষণ করতে লাগলেন তাঁর ভাঙা গলার দমক-ভরা কথাগুলো ঃ

'দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ্! 'সংবিধান-সভা' কমিটির এক গোপন বৈঠকে একটা প্রস্তাব এইমাত্র ভোটে পাশ হয়ে গেছে। আপনাকে জনস্বাস্থ্য বিভাগের আন্ডার-সেক্রেটারির পদটি দেয়া হবে।.. "

"আন্ডার-সেক্রেটারি?" কথার মাঝখানে বলে উঠলেন ডাক্তার। ঠোঁটের কোণা-দুটো তিনি এমনভাবে দু'পাশে ঝুলিয়ে দিলেন যে তাঁর থুতনিটা ঘিরে ভাঁজ পড়ে গেল কয়েকটা। "বেশ, বেশ, তা কোন্ রিপাবলিকের আন্ডার-সেক্রেটারি, শুনি?"

"রিপাবলিকের নয়, গভর্ণমেন্টের।...সংগ্রামের উদ্যোগটা এবার আমরা নিজেদের হাতেই তুলে নিচ্ছি। একটা ফ্রন্ট খুলছি আমরা।...কাগজের নোট ছাপবার জন্য একটা প্রেসও পাচ্ছি। চেকোস্লোভাকিয়ান ফৌজকে সামনে রেখে আমরা মস্কোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।.. একটা সংবিধান সভাও গড়ে তুলছি। আমরা...আমরাই শুধু বুঝতে পারি এই ব্যাপারটা. আজ খুব জোর একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে। এস্-আর ও মেনশেভিকরা দেখি সব পদগুলোই দখল করতে চায়। কিন্তু আমরা জেম্স্ত্ভোব লোকেরা গোঁ ধরলাম আপনাকে নিতেই হবে, শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হিসেবে আপনার নামই রয়ে গেল।..আমার যা গর্ব হচ্ছে তা আর কি বলব! আপনি তা হলে মেনে নিচ্ছেন তো?"

ঠিক এই সময়ে সামারকার ওপার থেকে এমন প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল যে টেবিলের ওপরেব গেলাসগুলো পর্যন্ত ঝন্ঝন্ করে উঠল। গভিযাদিন হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে লাফিয়ে উঠলেন। উৎকণ্ঠ হয়ে বললেন ঃ

"ঐ বুঝি চেকরা এল!"

আবার একটা বিস্ফোরণ হল। মনে হল যেন পাশের বাড়িতেই কোথাও মেশিন-গানেব গর্জন শোনা যাচ্ছে। কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন গভিয়াদিন। আবার বসে পড়ে পা'টা গুটিয়ে নিয়ে বললেন ঃ

"এ হল ওই লাল জানোয়ারগুলো। .গোলাঘরের ওপর মেশিনগান বসিয়েছে! ...কিন্তু চেকরা যে শহর দখল করে নেবে এতে কোনো সন্দেহই নেই. .নেবেই, ওরা নেবেই..."

শহরের লোকজন কেউ ঘুমোয় নি। রহস্যময় সব গোপন কক্ষে নির্বিবাদে সভা চালিয়েছে 'সংবিধান-সভার কমিটি।' অফিসারদের সংগঠন থেকে এসেছে স্বেচ্ছাসেবক। পুরো অস্ত্রশস্ত্র তৈরি রেখে বাড়ির মধ্যে বসে তারা আক্রোশে পাঁয়তারা কষছে। শহরের বাসিন্দারা ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে ঘন নৈশ অন্ধকারের মধ্যে। রাস্তার টহলদার পাহারাওয়ালারা মাঝে মাঝেই হাঁক দিয়ে পরস্পরকে সাড়া জানাচ্ছে। গোলমালের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে পুব-মুখো ট্রেনগুলোর তীক্ষ্ণ বিষণ্ণ সিটি।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দর্শকেরা দেখছিল, আকাশের বুক চিরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঝলকে উঠছে বিদ্যুতের চমক। ভলগার ঘোলা জল ঝক্‌মক্‌ করে নেচে উঠছে। ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে জেটির ধারে বজরা ও স্টীমারের কালো-কালো অবয়ব-রেখা। নদীর অনেকটা উঁচুতে, লোহার ছাদের পাশে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা এলিভেটরের বিরাট আকৃতিটা, লুথারান গির্জার সোজা গম্বুজ, আর কনভেন্টের ঘণ্টা-ঘরটা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ঐ ঘণ্টা-ঘরটা তৈরি করার জন্য নাকি চাঁদা তুলেছিল সুজান্না নামে একজন মঠবাসিনী। একটু বাদে বিজুলির চমক আর রইল না। সবটাই ডুবে গেল অন্ধকারে।.....

মেঘ কেটে গেছে। বাতাস উঠেছে। চিমনিগুলোর মধ্যে হু-হু করে কেঁদে ফিরছে হাওয়া। চেকরা এবার শুরু করল আক্রমণ।

ক্রিয়াঝ্‌ রেল-স্টেশন থেকে পাতলা সারি দিয়ে বেরিয়ে ওরা রেলওয়ে পুল পার হয়ে, চর্বির কারখানাগুলো ঘেঁষে এগিয়ে চলল নদীর পাড়ে শহরতলি এলাকার দিকে। এবড়ো-খেবড়ো মাটি, ক্ষেতের আল, বেগুনি উইলোর ছোট-ছোট ঝোপ ডিঙিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া রীতিমত দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল।

শহরের প্রবেশপথ বলতে মাত্র ঐ দুটো—একটা কাঠের পুল, আরেকটা রেলওয়ে-পুল। এলিভেটরের পেছন দিককার আঙিনা থেকে বলশেভিক গোলন্দাজরা প্রবেশপথ দুটোর ওপর সমানে গোলাবর্ষণ করতে লাগল। এই প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টি আর বিস্ফোরণের ফলেই যা-হোক লাল ডিভিশনগুলোর মনোবল কিছু বজায় রইল, কম্যান্ডারদের সামরিক অভিজ্ঞতার ওপর তারা তেমন ভরসা করতে পারছিল না।

সকালে দিকে চেকরা একটা চালাকি খেলল। এলিভেটরের পাশে যে-সব কুঁড়েঘর ছিল সেখানে পোলিশ উদ্বাস্তুরা বউ-কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে থাকতো। চেকদের সে খবর জানা ছিল। এলিভেটরের ওপর যখন গোলাগুলি ফাটতে শুরু করে, পোলরাও তখন কুঁড়েঘর ছেড়ে এলোপাথাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে ছুটতে থাকে আশ্রয়ের খোঁজে। গোলন্দাজরা ওদের গালাগালি ক'রে, ডাণ্ডার ঘা কষিয়ে কামানের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। 'ছ'-ইঞ্চি' কামানগুলো যখন গর্জে উঠল, উদ্বাস্তুরাও দিগ্বিদিক হারিয়ে কানে-তালালাগা অবস্থায় পাগলের মতো ছুটতে লাগলো চার-

"কি চাই?"

"সরকার বাহাদুর কোথায় গেলেন?" কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ : "তুমি এখন জনস্বাস্থ্য বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছ, খেয়াল রেখো।"

"ওঃ-হো—ডাক্তার বুলাভিন?" সোনালি-চুলো লোকটি বলল : "দুর ছাই, আমি তো...আচ্ছা কী হচ্ছে শহরে বলতে পারেন?"

"ঘটনা এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসেনি, তবে এই হয়ে এল বলে। দ্‌ভরিয়ানস্কায়া স্ট্রীটে এখন চেকরা টহল দিচ্ছে।"

লোকটি দাঁত বের করে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল :

"চমৎকার, চমৎকার! খুব ভালো কাজ হয়েছে সত্যি। যাহোক, আজ কিন্তু কাঁটায়-কাঁটায় বেলা তিনটের সময় সরকার বাহাদুর বৈঠকে মিলছেন। যদি এর মধ্যে কোনো অঘটন না ঘটে তাহলে আমরা সন্ধ্যের দিকেই নতুন কোনো ভালো জায়গায় গিয়ে উঠব।"

দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচের মনে কেমন একটা কুটিল সন্দেহ ছায়া মেলল। বললেন :

"মাফ করবেন, আমি কি কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সভ্যের সঙ্গে কথা বলছি? আপনি তো আভ্‌ক্‌সেন্তিয়েভ, তাই না?"

জবাবে সোনালি-চুলওয়ালা লোকটি এমন একটা অস্পষ্ট ভঙ্গী করল যার মানে দাঁড়ায় : 'যেমন বুঝছেন!' টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল লোকটি। বলল :

"আপনার স্থান হল রাস্তায়, ডাক্তার সাহেব। মনে রাখবেন, কোনোরকম বিশৃঙ্খলা আমরা বরদাস্ত করব না। আপনি তো বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একজন মুখপাত্র—যখন যান তো. ওদের উৎসাহটা একটু প্রশমন করে আসুন।...আর না-হলে" (চোখ টিপে বলে), "পরে ফ্যাসাদ বাধতে পারে।"

ডাক্তাব বুলাভিন বেরিয়ে এলেন। সারা শহরটাই যেন এর মধ্যে রাস্তায় এসে জড়ো হয়েছে। অপরিচিত লোকেরাও একজন আরেকজনকে দেখে নমস্কার জানাচ্ছে—যেন ইস্টারের উৎসব। সম্ভাষণ বিনিময় হচ্ছে, টুকরো-টাকরা খবরও মুখে মুখে প্রচার হচ্ছে।

"বলশেভিকরা তো হাজারে-হাজারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামারকা নদীতে, ওপারে গিয়ে নাকি উঠবে তারা।"

"আর পালে পালে বেটাদেব গুলি করে মারা হচ্ছে—"

"এক গাদা লোক তো জলে ডুবেই মরল!"

"ঠিক ঠিক, শহরের ঠিক বাইরেই সারা ভলগা একেবারে ছেয়ে গেছে মড়ায়।"

"আমি বলছি ভগবানকে সবাই ধন্যবাদ দিন! এতে কোনো পাপ নেই জানবেন।..."

"সত্যি কথা! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!"

"শুনেছেন খবর মশাইরা? সেক্সটনকে নাকি ওরা ঘণ্টা-ঘর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে।"

"কারা দিয়েছে? বলশেভিকরা তো?"

"তা ছাড়া আর কারা? ও-সব ঘণ্টা টণ্টা নাকি বাজানো চলবে না।...ওইভাবেই নাকি ওরা পেছন ফেরার পথ বন্ধ করছে।...তা, তেমন তো আর কেউ-কেটা নয়—কোথাকার এক সেক্স্টন!"

"কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

"এই একটু ওধারটা ঘুরে আসি—একবার গোলাঘরগুলো দেখে এলে মন্দ হত না, আস্ত আছে কিনা কে জানে।"

"পাগল হয়েছ? বলশেভিকরা এখনও জেটিতে রয়েছে যে!"

"এই যে দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ...এ দিনটির মুখ তাহলে দেখতে পেলাম।... কোথায় যাচ্ছেন আপনি এমন গম্ভীর মুখ করে?"

"এই,—ব্যাপার হল...ওরা আবার আমায় জনস্বাস্থ্য বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারি করে দিয়েছে কিনা!"

• "অভিনন্দন গ্রহণ করুন, মাননীয় আণ্ডার-সেক্রেটারি সাহেব।"

"না, না, না, এখনও সময় হয়নি...যতক্ষণ না মস্কো দখল করা হচ্ছে..."

"ওঃ ডাক্তার সাহেব, এবার একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম!"

ভিড়ের মধ্যে চেকদের সোনালি স্কন্ধচিহ্নগুলো যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। যা কিছু পুরনো, সব কিছুর প্রতীক এই চিহ্ন। অফিসারদের একটা ফৌজীদল দৃঢ়পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে, ছোট ছেলেরা ওদের পিছন পিছন দাঁত বের করতে করতে চলছে, সুশ্রী মেয়েরা হেসে ওদের সম্ভাষণ জানাচ্ছে। সাদোভায়া থেকে ভিড়টা ক্রমে দ্ভরিয়ান্স্কায়া স্ট্রীটে এসে পড়ল, সবুজ টালিওয়ালা অদ্ভুত জাঁকজমক-ঘেরা কুর্লিন প্রাসাদের পাশ কেটে চলে এল জনতা। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল .....

"ব্যাপার কি? কী হয়েছে?"

"ও-বাড়ির আঙিনার মধ্যে বলশেভিকরা রয়েছে, অফিসার সাহেব—কাঠের গাদার আড়ালে লুকিয়ে আছে, দু'জন।"

"অ্যাঁ! এগিয়ে যান মশাইরা, এগিয়ে যান!"

"অফিসাররা সব গেলেন কোথায়?"

"ঘাবড়াবেন না মশাইরা, ঘাবড়াবেন না!"

"কয়েকজন 'চেকা'র লোককে ধরেছে ওরা!"

"দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ, সরে আসুন একপাশে—কখন কি হয় বলা যায় না..."

গুলি ছোঁড়ার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টা যেন দুলে উঠল। বেগতিক দেখে লোকে ছুটতে শুরু করল, কোথায় রইল টুপি কোথায় রইল কী! দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে দেখলেন দ্ভরিয়ান্স্কায়া স্ট্রীটেই আবার ফিরে এসেছেন। যে-সব ব্যাপার ঘটছে তার জন্য নিজেকেই দুষতে ইচ্ছে

দিচ্ছেন, রুশভাষায় কয়েকটা খুচরো কথাবার্তাও শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছেন, আর বিদেশীদের কাছে মেয়েরা যাতে প্রীতিপ্রদ হয়ে ওঠেন, শহরটা এবং গোটা দেশটাই যাতে তাদের ভালো লাগে তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করে তাঁরা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ছেন; চেকরা অন্তরীণ হয়ে থাকার সময় যে-আতিথেয়তা রুশরা তাদের দেখিয়েছিল সেই তিক্ত আস্বাদকে এখন মিষ্টি প্রলেপ দিয়ে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

ভয়ানক দেরি করে এলেন দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ ঃ শহরতলী থেকে পালিয়ে সামারকা নদীর পাড়ে যে-সব লাল সৈন্য আশ্রয় নিচ্ছিল, ভলান্টিয়াররা এর মধ্যেই তাদের খতম করে দিয়েছে। যারা কোনোরকমে কাঠের পুলটা পেরিয়ে গিয়েছিল কিংবা তেরছা সাঁরিতে সাঁতরে নদী পার হয়ে গিয়েছিল তারা মরি-বাঁচি করে বজরা কিংবা স্টীমারে উঠে ভলগার উজানে রওনা হয়ে গেছে। স্রোতের কিনারায় অলস ঢেউয়ের মধ্যে খাবি খাচ্ছিল কয়েকটা মৃতদেহ। আরও যে কত অসংখ্য দেহ স্রোতের টানে ভলগায় ভেসে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

পচা কাঠের একটা নৌকো উল্টে পড়ে আছে, তার ওপর বসে রয়েছেন গভিয়াদিন। জামার হাতায় একটা তেরঙ্গা ফিতে বাঁধা, শণের নুড়ির মতো মাথার চুল তাঁর ঘামে জবজবে। নিষ্প্রভ চোখে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন নদীর রৌদ্র-ঝলমল ঢেউয়ের দিকে, চোখের তারাদুটো সুঁচের ডগার মতো তীক্ষ্ন। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে কড়া গলায় বললেন ঃ

"মিলিশিয়ার সহকারী অধিনায়ক, আমি খবর পেয়েছি এখানে নাকি অবাঞ্ছিত কতগুলো ঘটনা ঘটেছে।.....গভর্নমেন্ট চান....."

ডাক্তার কথা শেষ করতে পারলেন না, তাঁর চোখদুটো গিয়ে পড়ল গভিয়াদিনের হাতের ওককাঠের ডান্ডাটির দিকে। জমাট রক্ত আর চুলের গোছা লেগে রয়েছে তাতে। গভিয়াদিন বিড়বিড় করে বললেন ঃ "ওই আরেকজন চলল..." গলার স্বরটা এমন বুজে গেছে যে প্রায় শোনাই যায় না।

ক্লান্তভাবে নৌকো ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন গভিয়াদিন। স্রোতের টানে যে চুল-কামানো মাথাটা একটেরে ভেসে আসছিল সেটাকে একটু ভালো করে দেখবার জন্য তিনি নদীর কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন। কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে পাঁচ-ছ'জন ছোকরা গভিয়াদিনের কাছে এল। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ তাঁর অফিসারদের দিকে ঘুরলেন। ওরা ততক্ষণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ব্যাভেরিয়ান 'ক্ভাস' পান করতে শুরু করেছে। মাথায় রীতিমতো বুদ্ধি খেলিয়ে একজন শুঁড়ি তার মদের গাড়িটাকে টেনে এনেছে এইখানে, আর অফিসাররাও তার সদ্ব্যবহার করছে। লোকটার গায়ের এপ্রনটা এমন পরিষ্কার যে সহজেই নজরে পড়ে। অপ্রয়োজনে নিষ্ঠুরতা দেখানো বন্ধ করা উচিত এই মর্মে অফিসারদের সামনে রীতিমতো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন ডাক্তার। গভিয়াদিন আর ভাসমান নরমুন্ডটার দিকে আঙুল দেখালেন তিনি। তুষার-শাদা উর্দি পরা, লম্বা পা-ওয়ালা সেই ঘোড়-সওয়ারদলের ক্যাপ্টেনটি তার বরফ-ঢাকা গোঁফটা চুমুরে নিল একবার। তারপর

॥ সাত ॥

কাতিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না নিচু ড্রয়িংরুমটায় বসে চিঠি লিখছিল ছোট বোন দাশার কাছে। পাশে রয়েছে রবার-গাছের টব। চোখের জলে ভেজা রুমালখানা তার হাতের মধ্যে দলা পাকানো।

শার্সির বুদ্বুদ-আঁকা চিড়্‌-ধরা কাচে সজোরে এসে পড়ছে বৃষ্টির ছাঁট, বাইরে বাতাসে দুলে দুলে উঠছে এ্যাকেসিয়া গাছগুলো। সুদূর আজভ সাগরের ওপর দিয়ে যে-বাতাস মেঘের দলকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, সেই একই বাতাস এই ঘরের দেয়াল-মোড়া আল্‌গা কাগজগুলোকেও ফরফর করে নাড়া দিচ্ছে।

"দাশা, দাশা," লিখে চলেছে কাতিয়া ঃ "আমি তোকে বলে বোঝাতে পারব না কী দারুণ অসুখী আমি। ভাদিম মারা গেছে। কর্নেল তেৎকিন, যাঁর বাড়িতে আমি এখন রয়েছি, উনিই আমাকে খবরটা দিয়েছেন গতকাল। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম কে তাঁকে খবরটা দিয়েছে। উনি আমাকে ঠিকানা দিলেন ভ্যালেরিয়ান ওনোলি'র। ওনোলি হল কর্নিলভের দলের লোক, সবে ফ্রন্ট থেকে ফিরেছে। সন্ধ্যেয় তার হোটেলে গেলাম। নিশ্চয়ই প্রচুর মদ খেয়েছিল লোকটি। আমাকে তার কামরায় টেনে নিয়ে গিয়ে সে আমায় মদ খেতে অনুরোধ করল।.. কী বিশ্রী ব্যাপার!...এখানকার লোকজন যে কেমন তা তুই ধারণাতেই আনতে পারবি না।...আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'আমার স্বামী কি সত্যিই মারা গেছেন?' ওনোলি ছিল ভাদিমের সহকর্মী অফিসার, ওরই বন্ধু, ওরা পাশাপাশি থেকে লড়াই করেছে।.. ...রোজই ভাদিমের সঙ্গে দেখা-করত সে।.....আমার দিকে তাকিয়ে উপহাস করে বলল ঃ "সে তো মরেই গেছে ওগো কন্যে, আর চিন্তা করে কি লাভ! আমি নিজের চোখে দেখেছি ওর মুর্দার ওপর মাছির ঝাঁক।..." তারপর বলল ঃ "রশচিনকে আমরা সবাই সন্দেহ করতাম —ও যে মরে গেছে সে ওর ভাগ্য!..." কিন্তু কোথায়, কখন, কিভাবে ভাদিম মারা গেল সে সম্পর্কে লোকটা কিছুই বলল না আমায়।.....আমি অনেক সাধ্যসাধনা করলাম, কাঁদলাম, তবু নয়।...চেঁচিয়ে ধমকে বলল ঃ "কে কোথায় মরল সে-সব কি আর ছাই মনে আছে?" তারপর সে আমায় জানালো ভাদিমের বদলে আমি তাকে গ্রহণ করতে পারি কিনা।..উঃ দাশা! কী অসভ্য এই লোকগুলো! আমি হোটেল ছেড়ে তখনই বেরিয়ে পড়লাম, মন তখন আমার একেবারে ভেঙে পড়েছে। ...

"আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারি না দাশা, যে ভাদিম নেই।...কিন্তু খবরটা নিশ্চয়ই সত্যি—আমার কাছে মিথ্যে বলার কোনো কারণ ছিল না সে-লোকটির। কর্নেলও বলছেন খবরটা সত্যিই হবে।...ভাদিম যতদিন ফ্রন্টে ছিল, একটিমাত্র চিঠিই সে লিখেছিল আমায়—চিঠিটাও খুবই সংক্ষিপ্ত, ভাদিমের মতো নয় মোটেই। ইস্টারের দু' হপ্তা বাদে এসেছিল চিঠিটা। শুরুতে কোনো সম্বোধনও ছিল না।

যা লিখেছিল হুবহু বলে যাচ্ছি ঃ 'তোমাকে টাকা পাঠাচ্ছি। আমি আর গিয়ে দেখা করতে পারছি না। যখন আমরা আলাদা হয়ে যাই সে-সময়কার কথাগুলো আমার মনে আছে।...জানিনা লোকে খুনীতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে সত্যিই নিজেকে বাঁচাতে পারে কিনা।...জানিনা কেমন করে আমি খুনী হয়ে দাঁড়ালাম। মন থেকে সব ভাবনা তাড়াবার চেষ্টা করি, কিন্তু না ভেবে যে উপায় নেই তা জানি, কিছু যে একটা করা দরকার তাও জানি। যখন সব ঝামেলা মিটে যাবে, অবিশ্যি যদি সত্যিই কোনো কালে মেটে, তাহলে হয়তো আবার দেখা হবে আমাদের।".....

"ব্যস্ এইটুকুই। দাশা, তুই যদি জানতিস্ কেমন কেঁদেছিলাম চিঠিটা পেয়ে। ও আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল মরবার জন্যই। আমি কেমন করে ওকে রুখতে পারতাম বল্, কেমন করে ফিরিয়ে আনতাম ওকে? কেমন করে বাঁচাতে পারতাম? কী করার সাধ্যি ছিল আমার? খালি বুকের কাছে ওকে টেনে রাখা...ব্যস্! এই তো?...কিন্তু শেষের দিকটায় তো ও আমার দিকে নজরই দিত না। বিপ্লব, বিপ্লব—বিপ্লব ছাড়া আর কিছু ও দেখতেও পেত না, ভাবতেও পারত না। উঃ বুঝতে পারি না কিছু, বুঝতে পারি না! বেঁচে থেকে আমাদের কারুর লাভ আছে কিছু? সবই তো ধ্বংস হয়ে গেছে.....ঝড়ের পাখির মতো পাগলপারা হয়ে সারা রাশিয়া চুঁড়ে বেড়াচ্ছি আমরা। কেন? কি জন্য? যত রক্ত ঝরেছে, যত কষ্ট গেছে, যত পরীক্ষা গেছে মাথার ওপর দিয়ে, এ সবের বিনিময়ে কি আবার ঘর ফিরে পাব? সেই চমৎকার কামরা আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাসের আড্ডা ফিরে পাব?...আর কি কোনো কালে সুখের মুখ দেখব? যা অতীত তাকে আর ফিরে পাবনা, ভাঙা জিনিস কি আর জোড়া লাগে দাশা!... জীবনের আনন্দ আমাদের ফুরিয়ে গেছে, অন্যেরা এখন ভোগ করে নিক, আমাদের চেয়েও যারা শক্ত মানুষ, আমাদের চেয়েও যারা মহৎ..."

কাতিয়া কলম রেখে দলা-পাকানো রুমালটা দিয়ে চোখ মুছে নিল। শার্সি চারটের ওপর অঝোরে ঝরছিল বৃষ্টিজলের ধারা—সেই দিকে তাকিয়ে রইল খানিক-ক্ষণ। একটা এ্যাকেসিয়া গাছ অনবরত মাথা নিচু করে দুলছিল, যেন পাগলা হাওয়ায় কার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। কাতিয়া আবার লিখে চলল ঃ

"বসন্তের শুরুতেই ভাদিম চলে গেল ফ্রন্টে। আমার সারা জীবনটা যেন বুভুক্ষু হয়ে ওর জন্যই প্রতীক্ষা করছিল। কী করুণ, কী ব্যর্থ, একেবারেই ব্যর্থ সেই প্রতীক্ষা!...মনে আছে, জানলার ধারে বসেছিলাম একদিন।.....এ্যাকেসিয়ার ফুল সবে ফুটছে, মোটা মোটা কুঁড়িগুলো পাঁপড়ি মেলছে, উঠোনের মধ্যে একদল চড়ুই পাখি কী সোরগোলটাই না তুলেছে। আর আমি! এমন অভিমানে ভরে গেল মনটা আমার, এমন নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলাম যে কী বলব...এ পৃথিবীতে যেন আমার কোনো স্থানই নেই! লড়াই থেমে গেছে, বিপ্লবও থেমে যাবে। কিন্তু রাশিয়া আর আগের মতো হবে না। আমরা লড়ি, মরি, দুঃখ পাই। কিন্তু গাছগুলো তো গত বসন্তে যেমন এ-বসন্তেও তেমনি ফুলে ভরে উঠেছে, আগেও

ধবল জলবিস্তার, দূরে কয়েকটি নৌকার পাল কাত হয়ে আছে সাগরের বুকে। তাগান্‌রগ কারখানার ঠাণ্ডা চিমনিগুলোও নজরে পড়ে। তারপর একে একে আসে স্তেপ, উঁচু উঁচু ঢিবি, পরিত্যক্ত খনি। খড়িমাটির পাহাড়ের নিচে ছড়িয়ে আছে বড় বড় গ্রাম। নীল আকাশের গায়ে বাজপাখি। ইঞ্জিনের শিটিগুলোকেও মনে হয় এই বিষণ্ণ প্রান্তর-চিত্রের মতোই রোদনভরা।.....বিমর্ষ চাষীরা যাচ্ছে..... স্টেশনে স্টেশনে জার্মানদের লোহার শিরস্ত্রাণ।

বুড়িমানুষের মতো কুঁজো হয়ে বসে কাতিয়া জানলার বাইরে তাকিয়েছিল। নিশ্চয়ই ওর মুখটার মধ্যে অসাধারণ করুণ আর লাবণ্যময় একটা কিছু আছে যার ফলে সামনের আসনে বসা জার্মান সৈনিকটি ওর দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে, অথচ এই রুশ মেয়েটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। জার্মানটির চোখে নিকেল-রীমের চশমা, শীর্ণ ক্লান্ত মুখখানায় কাতিয়ার মতোই বিষাদের ছাপ।

"অপরাধীকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে, গ্নেডিগে ফ্রাউ*, সে দিন এল বলে।" মৃদু স্বরে জার্মান ভাষায় বলল লোকটি : "জার্মানিতেও তাই হবে, সারা পৃথিবীতেই তাই হবে। আসল বিচারক যে সে আসবেই..... তার নাম হল 'সোশিয়ালিৎস্‌মাস্‌'।....."

প্রথমে কাতিয়া বুঝতে পারেনি যে জার্মানটি তাকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলছে। সে শুধু তার বড়ো-বড়ো স্বচ্ছ নিকেল-রীমওয়ালা চশমাজোড়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। জার্মানটি বন্ধুভাবে তার দিকে মাথা নুইয়ে বলল :

"গ্নেডিগে ফ্রাউ কি জার্মান জানেন?"

"হ্যাঁ", বলল কাতিয়া।

"যখন কেউ প্রচণ্ড যাতনা ভোগ করে তখন তার একমাত্র সান্ত্বনা থাকে যে সে ভালো কাজের জন্যই দুঃখ সইছে।"—আসনের নীচে পা গুটিয়ে নিয়ে বলল জার্মানটি। ভুরু নামিয়ে সে চশমার ফাঁক দিয়ে কাতিয়াকে দেখতে লাগল। "মানুষের ইতিহাস আমি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। নিরুপদ্রব শান্তির একটা লম্বা অধ্যায় কাটিয়ে আবার আমরা সংকটের যুগে প্রবেশ করছি। এই হল আমার সিদ্ধান্ত। একটা বিরাট সভ্যতার মৃত্যু হচ্ছে—তারই পূর্বলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমরা। আর্য দুনিয়া এর আগেও এমনি একটা স্তর পেরিয়ে এসেছে। সে হল চতুর্থ শতাব্দীতে, যখন অ-সভ্য বিজাতীয়েরা রোম ধ্বংস করেছিল। রোমের পতনের সঙ্গে আমাদের এই যুগের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পান এমন অনেকেই রয়েছেন। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। রোম আগেই ধ্বংস হয়েছিল খৃষ্টীয় মতবাদের ধাক্কায়। বিজাতীয়েরা তো শুধু রোমের মৃতদেহটাকেই বিকৃত করেছে। আধুনিক সভ্যতার রূপ পাল্টে দেবে সমাজতন্ত্র। তখন ছিল কেবল ধ্বংস, এবার হবে সৃষ্টি। খৃষ্টীয় ভাব-ধারার সবচেয়ে বিধ্বংসী অংশটুকু হল : সাম্য, আন্তর্জাতিকতা আর ধনীর উপর দরিদ্রের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। রোম যখন বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তখন সেই রাক্ষুসে পরজীবীটিকে আহার জোগাচ্ছিল বিজাতীয়দের এইসব ভাব-

*গ্নেডিগে ফ্রাউ—মাননীয়া (সম্বোধনে)।

জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া তাহারা পাথর-বসানো আংটি ও গলাবন্ধ পরিত, প্রকাণ্ড দামী চাদরে ঢাকিত দেহ; এইরূপ এক একটি চাদরের মধ্যে এক ডজন লোক অনায়াসে ঢুকিতে পারে। তাহার উপরে আবার পরিত নানা ধরনের অতিরিক্ত পোশাক যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজের গরিমা জাহির করা। চেহারার মধ্যে একটা সাড়ম্বর রাজসিক ভাব ফুটাইয়া তুলিতে ভুলিত না তাহারা, বোধহয় সাইরাকিউজ-বিজেতা মহান্ মার্সেলাসের পক্ষেও এতখানি করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে অবশ্য তাহারা দুঃসাহসী অভিযানে বাহির হইত, এই যেমন, অসংখ্য ভৃত্য, বাবুর্চি, মোসায়েব ও কুৎসিত-দর্শন বিকৃতচেহারার খোজাদের লইয়া ইতালির জমিদারিগুলিতে গিয়া বুনো মুরগি ও খরগোশ শিকার, ইত্যাদি। হঠাৎ যদি কোনোদিন কোনোক্রমে গ্রীষ্মের দুপুরে নৌকাবিহার করিতে গিয়া তাহারা লুক্রাইন হ্রদ অতিক্রম করিয়া ফেলিত তাহা হইলে তো আর কথাই নাই, পরে এই নৌকা-ভ্রমণের কথা বলিতে গিয়া তাহারা ইহাকে সীজার অথবা আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ের সহিত তুলনা করিত। পাটাতনের উপর যে রেশমের পর্দা টাঙানো থাকিত তাহার ফাঁক দিয়া যদি কোনো গতিকে একটি মাছিও ঢুকিয়া পড়িত, অথবা উহার ভাঁজের মধ্য দিয়া যদি সূর্যের সামান্য একটু কিরণও আসিয়া পড়িত তাহা হইলে তাহারা অশেষ দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া কপাল চাপড়াইত, ভাবিত ইহার চেয়ে বরং চির-অন্ধকারময় 'সিমারিয়ান' দেশে তাহাদের জন্মানো উচিত ছিল। একদল পরগাছা আর তোষামুদে থাকিত এই মহাব্যক্তিদের প্রিয় অতিথি হইয়া, গৃহস্বামীর মুখ হইতে যে-কোনো কথা খসিয়া পড়িলেই তাহারা সাগ্রহে বাহবা দিত। হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত তাহারা গৃহপ্রকোষ্ঠের প্রতিটি মার্বেলপাথরের থাম ও মোজায়িকের কাজ-করা মেঝে লক্ষ্য করিত। খাবার টেবিলে অস্বাভাবিক ধরনের বড়ো-বড়ো মাছ কিংবা মোরগ দেখিলে সকলের যেন বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না, ওজন করিয়া দেখিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আনা হইত দাঁড়িপাল্লা। অতিথিদের মধ্যে যাহারা একটু প্রকৃতিস্থ তাহারা সে সময় একটু ঘুরিয়া বসিলেও, পরগাছাদের দল সোরগোল করিয়া বায়না ধরিত এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার আইনজ্ঞদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা দরকার।'.....

নোটবই বন্ধ করে জার্মানটি বলল :

"হ্যাঁ, ঠিক এমনি আরও অনেক কথাই রয়েছে এই লোকগুলোই পরে দু'মুঠো অন্নের খোঁজে শহরের জীর্ণ রাস্তা আর ভগ্নাবশেষের মধ্যে মাথা কুটে বেড়াত। পূর্বদিক থেকে ঠিক সেই সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে আসছিল বৈদেশিক জাতিগুলো লুটতরাজ আর ধ্বংসলীলা চালিয়ে। বছর পঞ্চাশেকের মধ্যে আর রোম সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্র রইল না। অতবড়ো রোম শহরটা একেবারে ঘাস-জঙ্গলে ভরে গেল, প্রাসাদের পরিত্যক্ত আঙিনায় ছাগল চরে বেড়াতে লাগল। প্রায় সাত শতাব্দীর মতো ইউরোপ একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেল। আর তার একমাত্র কারণ, খৃষ্টধর্ম শুধু ধ্বংসই করতে জানত, কিন্তু শ্রমিককে সংগঠিত করবার মতো ধারণা তার ছিল না। গোটা 'শাস্ত্রীয় আজ্ঞা' খুঁজে আপনি শ্রম সম্পর্কে

বিশৃঙ্খলা, লোকটির কাছে তাকেই মনে হয়েছে বহুপ্রতীক্ষিত এক নতুন যুগের অরুণোদয়!

সারা বছরটা কাতিয়া কেবল শুনেছে নিষ্ফল আক্রোশ আর নির্বীর্য হতাশার দীর্ঘশ্বাস; বিকৃত মুখ আর মুষ্টিবদ্ধ হাত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় নি,—কেবল মনে পড়ে তার বাপের বাড়ির সেই মার্চ মাসের সকালটির কথা। কর্নেল তেৎকিন অবশ্য দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেন না, দাঁতে দাঁতও ঘষেন না, কিন্তু তাঁর নিজের বক্তব্য অনুসারে তিনি একটি 'ধর্মের ভাঁড়' বিশেষ, ন্যায়ের প্রতি নেহাৎই একটা স্বকল্পিত নির্বিচার মোহের বশে তিনি বিপ্লবকে আবাহন জানিয়েছেন।

কাতিয়ার আশে-পাশে যারা ছিল সবাই বিপ্লবকে দেখেছে রাশিয়ার সর্বনাশ, রুশ সংস্কৃতির সর্বনাশ, জীবনবিধ্বংসী, স্বতঃস্ফূর্ত এক ব্যাপক অভ্যুত্থান হিসেবে—ধর্মশাস্ত্রের উপসংহারের সেই অন্তিম ভয়ংকর দিনের আবির্ভাব হিসেবে বিপ্লবকে জেনেছে তারা। এক সময় এমন এক সাম্রাজ্য তারা দেখেছে যার চাল-চলন বুঝতে তাদের কষ্ট হয়নি, সবকিছুই মনে হয়েছে নির্ঝঞ্ঝাট, পূর্বনির্দিষ্ট। চাষীরা লাঙল চষত, খনিমজুররা কয়লা তুলত, কারখানায় তৈরি হত শস্তা দরকারী জিনিস, ব্যবসাদাররা বাজার গরম রাখত আর কেরানিরা মন-প্রাণ দিয়ে খাটত—মোটের ওপর সবকিছুই চলত ঘড়ির কাঁটার মতো স্বচ্ছন্দে। উপরের তলার মানুষরা তাদের বিলাসিতার আরাম আহরণ করত এরই ওপর নির্ভর করে। কেউ কেউ বলত এ এক অন্যায় ব্যবস্থা। কিন্তু স্বয়ং ভগবানেরই যখন এইরকম ইচ্ছে তখন আর কি করা যেতে পারে? তারপর হঠাৎ দেখা গেল সব ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো, সাম্রাজ্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা খোলা উইয়ের ঢিবি। সাদাসিধে ভদ্রলোকেরা হোঁচট খেয়ে খেয়ে চললেন, ভয়ার্ত বিবর্ণ চোখে তাঁদের ধাঁধা লেগে গেল যেন.....

একটা ছোট মফঃস্বল স্টেশনে এসে অনেকক্ষণ ধরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণ নীরবতার মধ্যে। কাতিয়া জানলার বাইরে মুখটা বের করল। লম্বা একটা গাছের পাতা অন্ধকারে শিরশিরিয়ে উঠছে। তারা-ভরা আকাশ যেন নিঃসীম বিস্তারে ছেয়ে আছে অদ্ভুত এই অপরিচিত দেশটার ওপর।

খোলা জানলায় কনুই ভর করে ঝুঁকে রইল কাতিয়া। পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ, আকাশের তারা, আর মাটির উষ্ণ সুবাস তাকে মনে করিয়ে দিল আর একটি রাতের কথা। প্যারিসের কাছে একটা পার্ক.....গুটিকত মানুষ এসেছে দুটো গাড়িতে চেপে, সবাই ওদের বন্ধুবান্ধব, সবাই পিতার্সবুর্গের লোক।.....লেকের মধ্যে যে জলটুঙ্গী সামারহাউসটা ছিল সেখানে সবাই রাতের আহার সেরে নিয়েছে। ভারী চমৎকার সেই জায়গাটি। রুপোলি মেঘের মতো লেকের জলে ঝুঁকে পড়েছে উইলো গাছগুলো—পাতায় পাতায় তাদের বাতাসের কান্না।

দলের মধ্যে একজনের পরনে সান্ধ্য পোশাক, মাথায় টুপি নেই। কাতিয়া তাকে চিনত না। লোকটি জার্মান, কিন্তু ফরাসী বলত চমৎকার, অনেকদিন হল রাশিয়ায় আছে। রোগা চেহারা, লম্বাটে মুখটায় স্নায়বিক অস্থিরতার চিহ্ন, প্রশস্ত ঢালু কপাল, মাথার চুল সেখান থেকে যেন পেছনে হটে গেছে, আর চোখের পাতা-

"সুন্দরী মেয়েরা নিশ্চয় আপনাকে খুব ভুগিয়েছে, তাই বুঝি আপনি এত ঘেন্না করেন ওদের?" বলল কাতিয়া। আরেকবার মৃদুকণ্ঠে হেসে উঠল বটে, কিন্তু সে ভাবছিল একেবারে অন্য কথা.....অন্যকিছুর কথা যা এই রাতটির মতোই আঁধার-ঘেরা, অস্পষ্ট, কুসুমে পল্লবে মধুগন্ধা এই রাতটির মতোই যা সুবাসস্নিগ্ধ; গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে এ-রাতের তারাগুলো ঢেলে দিচ্ছে আলো, মুকুলিত প্রেমের মাধুরীস্পর্শে তন্দ্রা এনে দিচ্ছে ওর চোখে। সে প্রেম এই নব-পরিচিত মানুষটির জন্য নয়,—কিংবা হয়তো-বা তারই জন্য,—সে-ই তো ওর মনে জাগিয়ে তুলেছে কামনা। কিছুক্ষণ আগেও যে জিনিসটিকে মনে হয়েছে কষ্টসাধ্য, এমন-কি অসম্ভবই, সেই জিনিসটিই শেষে এত সহজে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল!...

প্যারিসের সেই দিনগুলোতে আরও কত কী যে ঘটতে পারত কে জানে?.. কিন্তু এক নিষ্ঠুর আঘাতে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।.. বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।...কাতিয়ার সঙ্গে সেই জার্মানটির আর দেখা হয়নি কখনো।.....লোকটি কি জানতো যে যুদ্ধ আসন্ন? নাকি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিল সে? মনে আছে কাতিয়ার, কিছুক্ষণ বাদে পাথরের রেলিং-এর থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল লোকটি। ওখান থেকে প্যারিসের আলো দেখা যাচ্ছিল দিগন্তের কালো রেখায় ঝলমলে মুক্তাবিন্দুর মতো। জার্মানটি তখনো একইভাবে যেন একটা সুকঠোর নৈরাশ্যের সঙ্গে বলে চলেছিল আসন্ন ঝড়ের অনিবার্যতার কথা। এই ভাবনা যেন ভূতে পাওয়ার মতো পেয়ে বসেছিল লোকটিকে—সবকিছুই ব্যর্থ, রাতের এই সৌন্দর্য, কাতিয়ার এই মোহিনী-মায়া, সবই।

কাতিয়া তাকে কী বলেছিল ওর মনে নেই, কিন্তু বোকার মতো আজে বাজে কিছু বলে বসেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতেই বা কি আসে-যায়? পাথরেব থামটার ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়িযেছিল লোকটি, কাতিয়ার কাঁধে তার গালের ছোঁয়া এসে লাগছিল প্রায়। কাতিয়া জানতো সে-রাতের বাতাস যেন ভরে গেছে ওরই সুগন্ধির সৌরভে, ওর কাঁধ ওর চুলের সুবাসে।. লোকটি তার প্রকাণ্ড হাত-খানা যদি ওর কাঁধের ওপরও রাখতো তবুও নিজেকে ও সরিয়ে নিত না নিশ্চয়ই—অন্তত এখন তো তাই মনে হয়।...কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না।...

বাতাসের ঝাপটা লাগছে কাতিয়ার গালে, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অতীত থেকে আবার সে ফিরে এল বর্তমানে। ইঞ্জিন থেকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে জ্বলন্ত কয়লার ফুল্‌কি। স্তেপ পার হচ্ছে ট্রেনটা। জানলার কাছ থেকে সবে এল কাতিয়া, কিছুই আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এখন। এক কোণে গিয়ে বসল জড়োসড়ো হয়ে। ঠাণ্ডা হাতদুটো ঘষে নিল একবার।

হঠাৎ মনে একটা তীব্র দংশন অনুভব করল কাতিয়া। তাই তো, এসব কী ভাবছে সে? মাত্র এক হপ্তাও হয়নি ভাদিমের মৃত্যুর খবর পেয়েছে, অথচ এর মধ্যেই সে এমন একটা কাজ করতে পারল যা বিশ্বাসঘাতকতার চেয়েও খারাপ।... এমন এক মানুষকে নিয়ে সে দিবাস্বপ্নের জাল বুনছিল যে কোনোকালেও তাকে ভালোবাসেনি!...নিশ্চয়ই জার্মানটি আর বেঁচে নেই...রিজার্ভ সৈন্যের অফিসার

একটার পর একটা গল্প হতে লাগলো—ভয়াবহতার দিক থেকে একটা কাহিনী আরেকটা কাহিনীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমন সব ঘটনার কথা বলা হচ্ছে যা শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায়। বেশ বোঝা যাচ্ছে, যে-অঞ্চলটার মধ্যে দিয়ে এখন ট্রেনটা ঢিমেতেতালায় এগিয়ে চলেছে সে-অঞ্চলটা সেরেফ চোর-ডাকাতের আড্ডা। এও পরিষ্কার যে জার্মানরা এসব ব্যাপারের মধ্যে মাথা গলাতে চায় না মোটেই, আগের স্টেশনেই জার্মান শান্ত্রীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আশেপাশের গ্রামগুলোতে পুরুষেরা দিব্যি বীভার কোট গায়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েরা পরে সিল্ক আর মখমলের জামা। এমন একদিনও যায় না যেদিন গুলিগোলা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ থাকে,—হয় মেশিনগানের বুলেট এসে পড়ে ট্রেনের ওপর, নয়তো গাড়ির পেছনদিকের দু'চারটে বগি খুলে নিয়ে লাইনের ওপর আলগা ছেড়ে দেয়া হয়, কিংবা যখন পুরোদমে ট্রেন চলছে তখন হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে যায় আর কামরার মধ্যে ঢোকে দাড়িওয়ালা একদল লোক, হাতে তাদের কুড়ুল আর করাতে-কাটা বন্দুক; বলে : হাত তোলো! রুশদের অবশ্য তারা শুধু কাপড় খুলে ন্যাংটো করে ছেড়ে দেয়, কিন্তু ইহুদিদের হাতে পেলে...

"ইহুদি? ইহুদি আবার কী করল এর মধ্যে?"—আর্তনাদ করে উঠলেন নীল সার্জের স্যুট-পরা একজন মুণ্ডিত-শ্মশ্রু ভদ্রলোক। ইনিই একটু আগে কিয়েভ শহর নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। "যে কোনো ব্যাপারেই ইহুদিদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হবে?"

আর্ত চীৎকার করে ভুতুড়ে আবহাওয়াটাকে একটা চূড়ান্ত রূপ দিলেন ওই ভদ্রলোক। প্রত্যেকের গলাই মিইয়ে গেছে। কতিয়া আবার চোখ বুজলো। চুরি করার মতো কোনো জিনিস ওর কাছে নেই—খালি ওই ফিরোজা পাথরের আংটিটা। কিন্তু তবু কেমন যেন একটা ভয় ওকে পেয়ে বসেছে, স্নায়ুগুলো ওর দুর্বল হয়ে পড়ছে। বুকটা ভয়ানক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে, তাই নিজেকে চাঙ্গা করবার জন্য ও প্যারিসের সেই অচরিতার্থ রাতটির কথা ভাববার চেষ্টা করে আবার। কিন্তু নির্জন শূন্যতার বুকে ও শুনতে পায় শুধু চাকার অবিরাম ছন্দ : "কা-তেং-কা, কা-তেং-কা, কা-তেং-কা, ভেবো না, সব খতম, সব খতম..."

হঠাৎ ট্রেন থেমে যায়, যেন পাথরের কোনো দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। ব্রেকগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করে চীৎকার করে ওঠে, শিকল কাঁচ সব ঝন্‌ঝন্‌ করে, উপরের তাক থেকে গড়িয়ে পড়ে দু'চারটে ভারি বাক্স। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কেউ ভয়ে ঢোঁক পর্যন্ত গেলে না। আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে যাত্রীরা এদিক ওদিক তাকায়, কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে। কথাবার্তার কী প্রয়োজন—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা গোলমালের মধ্যে পড়া গেছে।

অন্ধকারের মধ্যে রাইফেলের কয়েকটা আওয়াজ হল। নীল সার্জের স্যুট-পরা দাড়ি-চাঁছা ভদ্রলোকটি ছুটে বেরিয়ে এলেন কামরা থেকে, লুকোবার একটা জায়গা খুঁজে বের করবার জন্য এদিক উদিক চুঁড়তে লাগলেন। লাইনের পাশে

পাশে উঁচু করে মাটি ফেলা হয়েছিল, তারই ধার দিয়ে গাড়ির জানলা ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছিল একদল লোক। দুম্-দুম্.....চোখ ঝল্সে গেল, কানে তালা লেগে যায় আর কি।.....একটা ভয়ংকর গলা শোনা গেল : "জানলা থেকে সরে দাঁড়াও!" সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতবোমা ফাটলো। দুলে উঠল গাড়িটা। যাত্রীদের দাঁতকপাটি লাগার উপক্রম, ঠকঠক করে কাঁপছিল তারা।...গাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল একদল লোক। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে দরজা খুলে হাতবোমা উঁচিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল ন'দশজন। ভিড়ে ওদের রাইফেলে রাইফেলে ঠোকাঠুকি, ঘোঁত ঘোঁত করে নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই।

"তল্পিতল্পা গুটিয়ে এবার বাইরে চলে এস তো!"

"গা-গতর একটু তোলো মশাইরা, নয়তো.. ..."

"মিশ্কা, বুর্জোয়াগুলোর ওপর ছাড়্ তো হাতবোমা!"

যাত্রীরা বিষম ঘাবড়ে যায়। কটা-চুলো গুণ্ডা ধরনের এক পাঁশুটে চেহারার ছোকরা হাতবোমা উঁচিয়ে সামনে এগিয়ে আসে, এক মুহূর্ত মাথার ওপর হাতটা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

"যাচ্ছি গো যাচ্ছি, যাচ্ছি আমরা।" ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বলে ওঠে যাত্রীরা। আর একটিও উচ্চবাচ্য না করে ওরা গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে পড়ে ট্রেন ছেড়ে—কেউ সঙ্গে নেয় সুটকেস, কেউ কেউ আবার শুধু একখানা কেতলি কিংবা বালিশ সম্বল করে বেরোয়।...চোখে প্যাঁশনে-আঁটা একটি ভদ্রলোকের দাড়িগাছ একপাশে ট্যারা হয়ে গেছে, কিন্তু তবু এই ডাকাতদের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসার সময় তাঁর মুখে এক ঝিলিক হাসি ফোটে।

রাতের হাওয়াটা বড়ো ঠাণ্ডা। স্তেপের আকাশে তারার দল যেন মনোরম এক চাঁদোয়া বিছিয়ে দিয়েছে। পাঁজা করে রাখা কতকগুলো পচাকাঠের রেল-স্লিপারের ওপর কাতিয়া তার বাণ্ডিলটা নিয়ে বসল। শুরুতেই ওরা যখন খুন-খারাপি আরম্ভ করেনি, তখন হয়তো আদৌ মারবে না ওদের। নিজেকে কাতিয়ার এমন দুর্বল মনে হতে লাগল যেন কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার পর এইমাত্র সে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। এখানে এই স্লিপারগুলোর ওপর ঘুমোনোও যা, একাতিরোনোস্লাভের রাস্তায় রাস্তায় খালি পেটে ঘুরে বেড়ালেও তো সেই একই কথা হত, ভাবলো সে। কাঁধে যেন ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগছে। একবার হাই তুলল সে। ঢ্যাঙা একদল চাষী ট্রেনের মধ্যে মালপত্র-রাখা তাকগুলো থেকে বাক্স-পেঁটরা টেনে নামাচ্ছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে জানলার বাইরে। প্যাঁশনে-আঁটা ভদ্র-লোকটি এবার হাঁ-হাঁ করে ছুটে যেতে চেষ্টা করলেন ট্রেনের কামরার দিকে—"ও মশাই, মশাই, ভগবানের দোহাই একটু সাবধানে ছুঁড়বেন, ওর মধ্যে আমার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে যে, বড্ড নরম জিনিস..."

অন্যরা সবাই হিস্-হিস্ করে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিল, ওয়াটারপ্রুফ জামাটা ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঘোড়সওয়ারী ফৌজীদল অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে এল রেকাবের টুংটাং আর

"ও, তুমি বুঝি নিজেকে খাটো করতে চাও না? ভেবেছ ডাকাতের সঙ্গে আবার কী আলাপ করবে! খুব খারাপ, বুঝলে হে ক্ষুদে লেডি! এসব খানদানী চাল-চরিত্তির ছেড়ে দিতে হবে। সময় যে পালটে গেছে..."

পিছন ঘুরে হঠাৎ সে রাইফেলখানা খসিয়ে নিল কাঁধ থেকে। বন্দীদের দল থেকে আলাদা হয়ে পিছনে সরে যাচ্ছিল একটা অস্পষ্ট মূর্তি। তার দিকে তাকিয়ে রুদ্ধ গলায় হেঁকে উঠল সে ঃ "এই শুয়োর! পেছনে পড়ে যাচ্ছিস যে। গুলি করে সাবড়ে দেব!"

মূর্তিটা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। চাপা গলায় আত্ম-প্রসাদের হাসি হাসল ছেলেটি।

"পালিয়ে যেন যেতে পারত আর কি, গাধাটা! প্রকৃতির কাজটা সেরে আসতে চাচ্ছিল বোধ হয়, তাই হবে। এই হল জীবন, বুঝলে গো ক্ষুদে ভদ্রমহিলা—তুমি তো আমার সঙ্গে কথাবার্তাই কইবে না ভেবেছ, কিন্তু মুখ বুজে থাকলে যে আরও খারাপ লাগবে।...ঘাবড়িও না, মাতাল হইনি আমি।...মাতাল হলে বড়ো বিচ্ছিরি হয়ে যাই।...যাক, তাহলে আমাদের পরিচয়টা হয়ে যাক!" টুপির ডগায় দু' আঙুল ছুঁয়ে বলল সে ঃ "মিশ্‌কা সলোমিন! লাল ফৌজের একজন পলাতক সৈনিক। স্বভাবটাই খুব সম্ভব ডাকতের মতো। বদ মানুষ। সে তুমি ঠিকই ধরেছ..."

কাতিয়া বলল ঃ "কোথায় চলেছি আমরা?"

"গাঁয়ের দিকে, রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে। ওরা তোমাদের সওয়াল-টওয়াল করবে, খোঁজখবর নেবে—কয়েকজনকে গুলি করে মারবে, বাদবাকি ছেড়ে দেবে। তুমি জোয়ান মেয়ে—তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই।...তা'ছাড়া আমি তো রয়েছি তোমার সঙ্গে।"

"মনে হয় আপনাকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।" তির্যক চোখে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল কাতিয়া।

ও ভাবতে পারে নি যে ওর এই সামান্য কথায় ছেলেটির অতোখানি লাগবে। সোজা হয়ে সে হঠাৎ ফোঁস্ করে খানিকটা নিঃশ্বাস টেনে নিল। তারার আবছা আলোয় তাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, লম্বা মুখখানার মধ্যে অসংখ্য ভাঁজ ফুটে উঠল। চাপা গলায় বলল "কুত্তী কাঁহাকা!" কিছুক্ষণ চুপচাপ এগিয়ে চলল ওরা। হাঁটতে হাঁটতেই মিশকা একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে আগুন ধরাল।

"তুমি হয়তো নিজের পরিচয় ঢাকবার জন্য মিথ্যে বলতে কসুর করবে না, কিন্তু আমি ধরতে পেরেছি তুমি কে। তুমি হলে অফিসার লোকের ঘরণী।"

"হ্যাঁ, তাই।" জবাব দিল কাতিয়া।

"স্বামীটি নিশ্চয়ই শ্বেতরক্ষী দলে। তাই না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু উনি মারা গেছেন।..."

"লোকটি যে আমার বুলেটে মরেনি সে-কথা অবশ্য হলপ করে বলতে পারি না।"

মুখটা ওর বড়ো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, অনেকটা মেয়েলি ধরনের। গ্রেটকোটের পকেটে হাত দুটো একদম চালান করে দিয়েছে। কথা বলছে যেন কাতিয়ার সঙ্গে নয়, সামনেই যেন কোনো অশরীরী ছায়ামূর্তি রয়েছে, তারই সঙ্গে কথা বলছে সে।

"লেখাপড়া.....ও সবের নাড়ীনক্ষত্র জানা আছে আমার. ....মনটা আসলে আমার জংলীর মতো। . ...আমার ছেলেপিলেরা অবশ্য লেখাপড়া শিখবে। কিন্তু আমি এখন যা, বরাবর তা-ই রয়ে যাব—মানে বদ লোক আর কি! এই আমার কপালের লেখা।.....ওরা তো বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কতো কতো বই লেখে—কী চমৎকার সব কথা লেখে! কেন, আমাকে নিয়ে কেউ একটা বই লিখতে পারে না? ভেবেছ বুদ্ধিজীবীরা একাই বুঝি পাগলামি করতে পারে? আমিও ঘুমের মধ্যে চিৎকার শুনি.....তারপর জেগে উঠে আবার নতুন করে তৈরি হই খুনখারাপি করবার জন্য।....."

অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে এল একদল সওয়ার। দূর থেকে ওরা চেঁচাচ্ছিল : 'থাম! থাম!' মিশকা রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে বলল : 'তোমরা থাম শালা! নিজেদের লোককে চিনতে পারছ না, না?" কাতিয়ার, পাশ থেকে সরে ও ঘোড়সওয়ারদের দিকে এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে কী সব কথাবার্তা হল ওদের মধ্যে।

বন্দীরা এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্নভাবে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছিল। কাতিয়া মাটিতে বসে পড়ে হাঁটুতে মাথা গুঁজে রইল। পুবের আকাশে দেখা দিয়েছে ভোরের ফিকে সবুজ, এক দমক ভিজে হাওয়া বয়ে এল সেদিক থেকে—বাতাসে গোবর-ঘুঁটের ধোঁয়া, স্তেপ গাঁয়ের চিরাচরিত গন্ধ।

তেপান্তরের মাঠের অন্তহীন রাতের তারাগুলো এখন ম্লান হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কাতিয়াকে আবার উঠতে হয়, আবার শুরু হয় যাত্রা। একটু বাদেই শোনা যায় কুকুরের ডাক। একে একে নজরে আসে খড়ের গাদা, পাতকুয়োর হাঁসকল, ঘরের ছাদ। মাঠের ওপর ঘুমন্ত হাঁসগুলোকে দেখলে মনে হয় যেন বরফের চাঁই পড়ে রয়েছে। পুকুরের নিথর জলে প্রবাল-রঙা ভোরের আকাশ ছায়া মেলেছে। মিশকা হাঁটতে হাঁটতে ভুরু কুঁচকে বলে : "ওদের সঙ্গে যেও না তুমি, আমিই তোমার দেখাশোনা করব।"

"বেশ তো", জবাব দেয় কাতিয়া। মিশকার গলা যেন অনেকদূর থেকে ওর কানে ভেসে আসে।

কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কাতিয়া—এখন একটু শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারলেই হল।.....

আধ-বোজা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে কাতিয়া দেখতে পেল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্যমুখী ফুল, তার ওপাশে সবুজ খড়খড়ি, তাতে ফুলপাতা-পাখী আঁকা। জানলার ঝাপসা কাঁচে নখের ডগা দিয়ে টোকা মারল মিশকা। কুটিরের সাদা দেয়ালের গায়ে দরজা, ধীরে ধীরে স্লেটি খুলে গেল। ঝাঁকড়া-চুলো একজন চাষী

দাঁড়িয়ে পড়তেই তার ভেড়ার চামড়ার টুপিটা ছাদ ছোঁয় আর কি! একদল হল্লাবাজ লোককে সঙ্গে নিয়ে সে গট্‌গট্‌ করে বুক ফুলিয়ে চলে গেল ঘরের বাইরে।

জানলার বাইরে তখন হট্টগোল আর ব্যস্ততা। জিনের ওপর চেপে একদল লোক গাড়ির দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চাবুকের শব্দ, চাকার ক্যাঁচ-ক্যাঁচানির সঙ্গে শোনা যাচ্ছে অশ্রাব্য গালাগালি। ঘরটা একদম খালি হয়ে গেছে এর মধ্যে। একটু আগেই যে-লোকটি ভারিক্কি চালে অথচ মেয়েলি সুরে হাঁক দিচ্ছিল তাকে কেন যে কাতিয়া তখন দেখতে পায়নি এবার তা বুঝল—আসলে লোকটি বেজায় খাটো। কাতিয়ার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে টেবিলের সামনে বসেছিল সে, কনুইয়ের নীচে একটা মানচিত্র।

লোকটির সোজা সোজা লম্বা বাদামি রঙের চুল, ছোট ছেলের মতো সরু ঘাড়টার ওপর এসে পড়েছে। কালো ওভারকোটের ওপর টোটার স্ট্র্যাপ আড়া-আড়িভাবে ঝোলানো, দু' দুটো রিভলবার আর একটা তলোয়ার চামড়ার বেলটে গোঁজা, চটকদার রেকাব-আঁটা বুট, টেবিলের নিচে পায়ে পা রেখে বসেছে। মাথাটা এপাশ ওপাশ দুলিয়ে, কাঁধের ওপর তেল-চকচকে চুলগুলো নাড়তে নাড়তে সে যেন কী লিখে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি, কলমের কালি একেবারে ছিটকে পড়ছে, কাগজ যাচ্ছে ফুটো হয়ে। কাতিয়াকে বিছানা ছেড়ে দিয়েছিল যে-চাষীটি সে এবার সাবধানে পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুকল। লালচে মুখটায় যেন মাপ চাইবার ভঙ্গি, চুলে লেগে আছে খড়-কুটির টুকরো। বোকার মতো চোখ পিট্‌পিট্‌ করে সে টেবিলের উল্টোদিকে একটা বেঞ্চিতে বসল। হাত দুটো টেবিলের নিচে গুটিয়ে নিয়ে সে খালি পা দুটো ঘষাঘষি করতে লাগল।

"সব সময় খালি ব্যস্ত আর ব্যস্ত, আর এদিকে আমি ভেবেছি নেস্তর ইভানোভিচ—আপনি হয়তো ডিনারের জন্য থেকে যাবেন। কাল একটা বাছুরও মেরেছিলাম.... আপনি আসবেন, আগে থাকতেই আন্দাজ করে ফেলেছিলাম হয়তো।....."

"আমার সময় নেই.....এখন আর ঝামেলা কোরো না তো... .."

"ওহো!" (চাষীটি চুপ করে গেল, চোখের পিট্‌পিটুনিও বন্ধ হয়েছে। চোখ দুটো এবার যেন ভারি ভারি আর শেয়ানা হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ ধরে সে কেবল লোকটির কলম চালানো লক্ষ্য করল)।

"নেস্তর ইভানোভিচ! আপনি কি আমাদের গাঁয়েই লড়াই দিতে চাচ্ছেন নাকি?"

"দেখা যাক্‌....."

"যুদ্ধের কথা অবশ্য কিছুই বলা যায় না।.....আমি শুধু ভেবেছিলাম লড়াই যদি হয়ই নির্ঘাত, তাহলে গরু ভেড়াগুলো নিয়ে কি করা যায়।.....আমরা কি ওগুলোকে খামারের মধ্যে ছেড়ে দেব?"

লম্বা-চুলো লোকটি কলম ছুঁড়ে ফেলে এবার তার ছোট ছোট আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালাতে চালাতে পড়তে লাগল কী লিখেছে এতক্ষণ। দাড়ি আর বগল

কুট্‌কুট্‌ করতে থাকায় চাষীটি এদিক চুল্‌কে নিল খানিকটা। তারপর যেন হঠাৎ কী মনে পড়েছে এমনিভাবে বলল :

"নেস্তর ইভানোভিচ, আমাদের ভাগের মালটা কী হল? কাপড় তো দিয়েছেন—অবিশ্যি কাপড়টা ভালই।.....এক নজরেই চেনা যায়, ফৌজী কাপড়। ছ' গাড়ি মাল ছিল.....।"

"কেন, ওতে কি কুলোচ্ছে না? মন ভরেনি? বড্ড কম হয়ে গেছে?"

"না না, কুলিয়ে তো গেছে।.....কতখানি ধন্যবাদ যে দেব আপনাকে ভেবে পাচ্ছি না। সে কথা নয়। আপনি তো ভাল করেই জানেন—গাঁ থেকে আমরা চল্লিশ জন লোককে পাঠিয়েছিলাম আপনাদের কাছে, লড়াই করবে বলে। আমার নিজের ছেলেটিও গিয়েছিল। ও বলেছিল : 'বাবা, চাষীদের জন্যই আমি আজ রক্ত দিতে যাচ্ছি।' এতেও যদি না হয় তাহলে অবশ্য আমরা বুড়োরাও যাব লড়তে।.....লড়ুন না আপনারা, আমরা তো যাচ্ছিই।.....আর কাপড়ের কথা যে বলছেন, জার্মানরা যদি—ভগবান না করুন—আমাদের ওপর ঝাঁপিয়েই পড়ে, তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে, আপনিই বলুন? তখন আমরা কী করব? লড়াইয়ের হারজিতের কথা কি কেউ হলপ করে বলতে পারে?"

লম্বা-চুলো লোকটির পিঠ সোজা হয়ে উঠল। মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে সে টেবিলের কিনারা চেপে ধরল। নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে রইল সে। চাষীটি আস্তে আস্তে বেঞ্চি ধরে ধরে সরে গেল ওর কাছ থেকে। টেবিলের তলা থেকে হাতটা গুটিয়ে নিয়েই চট্‌ করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

লম্বা-চুলো লোকটি যে চেয়ারে এতক্ষণ বসেছিল সেটি একদিকে হেলে পড়তেই এক লাথি দিয়ে সে সরিয়ে দিল আপদটাকে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এতক্ষণ বাদে কাতিয়া লক্ষ্য করল কালো আধা-সামরিক উর্দিপরা বেঁটে মানুষটির মুখখানা। লোকটিকে দেখাচ্ছিল ছদ্মবেশ-পরা পাদরির মতো। সবল ভুরুর নিচে দুটো গভীর কোটর, তার ভেতর থেকে জ্বলন্ত মর্মভেদী চোখের দৃষ্টি ঠিকরে এসে পড়ল কাতিয়ার ওপর। ফ্যাকাশে মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, দাড়ি গোঁফ ভাল করে কামানো—খানিকটা মেয়েলি ধরনের হলেও, মুখটার মধ্যে কেমন যেন একটা ভোঁতা আর উগ্র ভাব, অনেকটা চোদ্দ বছরের ছেলের মতো। কিন্তু চোখ দুটো প্রবীণ লোকের মতোই বুদ্ধিদীপ্ত।

কাতিয়া হয়তো আরো বেশি কেঁপে উঠতো যদি ও জানতো যে স্বয়ং মাখনো এখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে। মাখনো দেখল, বিছানার ধারে বসে আছে একটি যুবতী, পায়ে ধুলোমাখা বুট, সিল্কের পোশাকটা যদিও কুঁচকে গেছে কিন্তু জেল্লা আছে, কালো শালটা বেঁধেছে চাষী মেয়েদের কায়দায় : সে বুঝে উঠতে পারল না এ আবার কোন্‌ পাখীটি উড়ে এল চাষীর কুঁড়েঘরে। উপরের চওড়া ঠোঁটটা তার কুঁচকে গেল হাসিতে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল এক সারি ছরকুটে দাঁত।

কাটা কাটা কথায় জিজ্ঞেস করল : "তোমার মালিকটি কে?"

কাতিয়া কিছু বুঝতে না পেরে কাঁপতে লাগল শুধু। মাখনোর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, তার বদলে যে ভাবটা ফুটে উঠল তাতে কাতিয়ার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবার জোগাড়।

"কে তুমি? বেশ্যা মেয়ে নাকি? সিফিলিস্ থাকলে কিন্তু গুলি করে মারব। অ্যাঁ? রুশভাষা বোঝো না? অসুখ-টসুখ আছে, না সুস্থ?"

"আমি বন্দী," এমনভাবে বলে কাতিয়া যে প্রায় শোনাই যায় না।

"কাজ জানা আছে কিছু? নখ-টখ কাটতে পারো? যন্ত্রপাতি দেব না হয়।"

"আচ্ছা বেশ," এবার আরও আস্তে জবাব দেয় কাতিয়া।

"কিন্তু ফৌজের মধ্যে লুচ্চামি করা চলবে না।.... .শুনতে পেয়েছ কি বললাম? থাকতে পারো। লড়াইয়ের পর রাতে ফিরে আসব আমি—আমার নখ-টখগুলো একটু কেটে দেবে আর কি।"

মাখনোর সম্পর্কে নানা রকম কিংবদন্তী বাজারে চালু। শোনা যায়, আকাতুইয়ের কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় সে বহুবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত একবার অবশ্য সে পালাতে পেরেছিল, কিন্তু একটা গুদামঘরের মধ্যে ধরা পড়ে যায়—ধরা পড়বার সময় সে সেপাইদের সঙ্গে লড়াই করে একখানি কুড়ুল মাত্র সম্বল করে। রাইফেলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে খেয়ে যখন সে আধমরা, তখন তার হাতে আবার কড়া পড়ে। শিকল-বাঁধা অবস্থায়ই সে তিনটে বছর কাটিয়ে দেয় বেজীর মতো চুপচাপ, আর দিনরাত বৃথাই চেষ্টা করে কব্জি থেকে লোহার হাতকড়া খুলবার। সশ্রম কারাবাসের এই সময়টাতেই সে অ্যানার্কিস্ট আর্শিনভ-মারিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, তার সাগরেদ হয়।

নেস্তর মাখনো হল একাতেরিনোস্লাভ এলাকার গুলিয়াই-পলিয়ে গ্রামের লোক। ওর বাপ ছিল ছুতোর মিস্ত্রি। একেবারে বাচ্চা বয়েসে গ্রামের একটা ছোট দোকান ঘরে কাজ করত সে। সেখানে তার কপালে জুটত হরদম হাতে-দাঁড় আর গলাধাক্কা। ওর নাম দেওয়া হয়েছিল "বেজী' কারণ ওর স্বভাবটা ছিল ভয়ঙ্কর বুনো আর চোখদুটো বাদামি। দোকানের একজন বয়স্ক কর্মচারী একবার ওকে উত্তম-মধ্যম দিয়েছিল বলে ও তার গায়ে গরম জল ঢেলে শোধ নেয়, ফলে ওই অতটুকু বয়েসেই তার চাকরিটি খোয়াতে হয়। তারপর একদল সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে শুরু করে নানা রকম উপদ্রব—তরমুজের খেত, ফলের বাগানে নিয়মিত হানা দেয় আর বখাটে ছেলেদের মতো বেপরোয়া দিন কাটাতে থাকে। তারপর অবশেষে ওর বাবা ওকে একটা ছাপাখানার কাজে ঢুকিয়ে দেয়। সেখানেই নাকি সে প্রথম অ্যানার্কিস্ট ভলিনের নজরে পড়ে যায়, আঠারো বছর বাদে এই ভলিন লোকটিই মাখনোর প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপতি পরিষদের প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ভলিনের নাকি ছেলেটিকে বেজায় পছন্দ হয়ে যায়, ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে অ্যানার্কিস্ট-তত্ত্বে দীক্ষা দেয় সে, পরে ওকে পাঠায় ইস্কুলে। এইভাবেই নাকি মাখনো ইস্কুলের শিক্ষক হয়। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সত্যি নয়। মাখনো কোনো জন্মেও ইস্কুল মাষ্টারি করেনি, আর ভলিনের সঙ্গেও খুব সম্ভব তার পরিচয় হয়েছিল অনেক

সেদিন ছিল হুইটসান পরবের দিন। স্তেপ অঞ্চলের একজন ডাকসাইটে জমিদার মির্‌গরোদ্‌স্কি তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিলেন হেৎমানের এক কর্নেলের সঙ্গে। আশেপাশের জমিদারদের মধ্যে যাদের ভয়ডর একটু কম তারা সাহস করে এই বিপদ-আপদের দিনেও স্তেপের রাস্তায় ঘোড়া হাঁকিয়ে এসেছিলেন বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে। জেলার সুদূর প্রান্ত থেকে, এমন-কি কিয়েভ থেকেও নিমন্ত্রিতেরা এসেছিলেন।

মির্‌গরোদ্‌স্কির মহলবাড়ি পাহারা দেবার জন্য সেপাইশান্ত্রীর কড়া ব্যবস্থা হয়েছিল। মালিকের ঘরের চিলেকোঠায় মেশিনগান বসানো হয়েছিল একটা, আর বরের সঙ্গে তার অফিসার ভাইরাও এসেছিল পার্শ্বচর হিসেবে—লম্বা চওড়া লোক সবাই, পরনে নীল তুর্কী পাজামা। পাজামাগুলোও সাবেকী কায়দায় এমন ঢোলা-ঢোলা যে মাটি ঝাঁট দিয়ে যায়। গায়ে তাদের লাল কাপড়ের জামা, মাথায় আস্ত্রাখান টুপি, তা থেকে সোনালি ঝালর নেমে এসেছে একেবারে কোমর অবধি। চওড়া মরোক্কো চামড়ার বুটে এসে ঠোকর খাচ্ছে পাশে ঝোলানো বাঁকা তলোয়ারগুলো।

কনেটি সদ্য ফিরেছে ইংলণ্ড থেকে। সেখানে মেয়েদের এক বোর্ডিং-এ থেকে সে পড়াশুনা শেষ করেছে। উক্রেইনীয় ভাষাও কিন্তু এর মধ্যে খানিকটা রপ্ত করে ফেলেছে সে। তা ছাড়া, ছুঁচের কাজ-করা ব্লাউজ, পুঁতির মালা, চুলের ফিতে আর উঁচু লাল বুটজুতোও পরতে শিখেছে। ওর বাপ, সর্দার মিরগরোদ্‌স্কি, কিয়েভ থেকে সবে আনিয়েছেন ফারের ঘেরা-দেয়া একটা অর্ডারী মখমলের পোশাক—হেৎমান মাজেপ্‌পা-র সেই বিখ্যাত ছবিটার হুবহু অনুকরণ। পুরনো কেতায় যাতে বিয়ের উৎসবটা হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছে। একশো বছরের পুরনো মধুর শিরকা অবশ্য এই গোলমালের দিনে উক্রেইনে খুঁজে পাওয়া শক্ত, কিন্তু চর্বচোষ্যের বিপুল আয়োজনে যা কিছু প্রয়োজন তার কোনো কিছুরই ঘাটতি হয়নি।

স্তোত্রপাঠের পর বাগানের মধ্যে দিয়ে কনেকে নিয়ে যাওয়া হল পাথরের তৈরি নতুন গির্জাঘরে। সঙ্গিনী মেয়েরা সবাই সুন্দরী, অপ্সরার মতো। ওরা যখন গান গেয়ে গেয়ে কনেকে নিয়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কসাকদের প্রাচীন লোক-গাথারই কোন্‌ এক নায়িকা বুঝি প্রাণ পেয়ে ফিয়ে এসেছে আবার। বরের বন্ধুরা বেড়ার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে : "আহা-হা! উক্রেইনের বুঝি সেই সাবেকী আমল আবার ফিরে এল রে!" বিয়ের মন্ত্র পড়ার পর নব-দম্পতি যখন গির্জার প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়াল, ওদের গায়ে মুঠো মুঠো ওট্‌স্‌ ছুঁড়ে দিতে লাগল সবাই। মাজেপ্‌পার মতো পোশাক-পরা মেয়ের বাপ এসে আশীর্বাদ করলেন তাদের, মেঝিগোরিয়ের পুরনো ক্রুশমূর্তি হাতে নিয়ে। তারপর শুরু হল শ্যাম্পেন, সোল্লাস শুভকামনায় গেলাস ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে ভাঙল অনেক গেলাস। মোটরগাড়িতে চেপে নবদম্পতি স্টেশনমুখো রওনা হল। নিমন্ত্রিতেরা সব রয়ে গেল পানভোজন ফুর্তির জন্য।

বাড়ীর সামনের বড়ো আঙিনাটায় যখন রাত নেমে এল, সেপাই আর চাকর-

হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তেমনি তাড়াতাড়ি স্বেচ্ছাসেবকরা যে যার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে নিজেদের হাতিয়ার লুকিয়ে রাখে। তারপর যখন জার্মানদের গোলন্দাজ-বাহিনী 'শত্রুর' খোঁজে সশব্দে গাঁয়ের রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ায়, তখন ওরা যেন কিছুই জানে না এমনি গোবেচারা ভাব করে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদাস-ভাবে গা চুলকোয়। মাথনোকে খুঁজতে গিয়ে জার্মান আর অস্ট্রিয়ান বাহিনীর বেফজুল হয়রানিই হয়. ওকে যে পাওয়া যাবে না সে তো জানা কথাই—সর্বত্র বিরাজমান এই শয়তানটা যেন ফাঁকি দিয়ে সব সময় ওদের পেছন দিকেই রয়ে গেছে মনে হয়। পুরাকালের সেই তাতার-মোংগলদের মতোই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় এমন লড়াই গেরিলারা সযত্নে এড়িয়ে চলে,—কেবল চেঁচামেচি, হুইস্‌লের আওয়াজ, গোলাগুলি ছোঁড়া ইত্যাদি ক'রে ঘোড়ার পিঠে কিংবা গাড়িতে ক'রে তারা বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, তারপর গিয়ে জড়ো হয় এমন একটি জায়গায় যেখানে তাদের উপস্থিতির কথা কেউ ভাবতেই পারে না—সেখান থেকে তারা আবার হয়তো শুরু করবে হামলা।

গ্রামটা এখন জনশূন্য। ফৌজের পিছনে পিছনে চলেছে মাখনো,—তিন-ঘোড়ায় টানা একটা বগিগাড়িতে চড়ে। গাড়ির মেঝেতে কার্পেট পাতা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মোটাসোটা একটি চাষী মেয়ে কচি ডালের মুড়ো-ঝাঁটা দিয়ে ঘরের আঙিনা সাফ করছিল—স্কার্টটা উঁচুতে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে সে, কেঁদে কেঁদে মুখটা তার ফুলে ঢোল হয়েছে। খোলা জানলার কাছে বসে আছে বাড়ির কর্তা, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। ওই পাহাড়গুলোর অ ড়ালেই অদৃশ্য হয়ে গেছে পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার সৈন্যের সারি, পাহাড়ের চূড়োয় এখন দেখা যাচ্ছে শুধু দুটো বায়ুকল—পরম নিশ্চিন্তে পাখা ঘুরিয়ে চলেছে তারা। নাঃ, মাখনোর সঙ্গে কথাবার্তার পরও সে যে আশ্বস্ত হতে পারেনি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

কাতিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে কুয়োর কাছে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে কাপড়-জামা ঠিকঠাক করে নিল। বাড়ির কর্তা ওকে ডেকেছে প্রাতরাশের জন্য। দু'রকম সেদ্ধ-তরকারী আর খানিকটা দুধ খেয়ে নিল সে। এরপর কী করতে হবে, কী তার গতি হবে কিছুই সে জানে না বলে চুপচাপ বসে রইল জানলার কাছে। ভয়ানক গরম পড়েছে। রাস্তায় একদল মুরগি চরে বেড়াচ্ছে, টাটকা গোবরের গাদা থেকে খুঁটে-খুঁটে কি খাচ্ছে। বেড়ার ওপাশে সূর্যমুখী ফুলের সোনালি মাথাগুলো নুয়ে পড়েছে, ফলের ভারে নিচু হয়ে গেছে চেরি গাছ। আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজপাখি। বাড়ির কর্তা গলা খাঁকারি দিয়ে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

"হ্যাঁ, ঘাগরাটাকে আরও তোল্ মাথার ওপরে, বেহায়া হতচ্ছাড়ি!"—কাঁদো-কাঁদো-মুখ মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল সে: "তোর গায়ে যদি ওরা হাত দিয়েও থাকে, সে আর বিচিত্র কী? তুই তো আর পয়লা নোস্!"

কান্নায় ফোঁস্-ফোঁস করতে করতে মেয়েটি ঝাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলল একপাশে।

আরেকবার একটা গুর্‌গুর্‌ আওয়াজ গাঁয়ের মাটি কাঁপিয়ে দিল। কাতিয়াও ঘরের মধ্যে আর বসে থাকতে না পেরে বেরিয়ে এল দুপুরের রোদে। গুমোট হাওয়াটা গোবরের গন্ধে ভরে গেছে একেবারে।

ঠিক সেই সময় রাস্তায় এসে জুটল গতকালের ট্রেনযাত্রীদের একটা দল—ভয়ানক উদ্বিগ্ন তারা। সকলের সামনে রয়েছেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অব্‌রুচেভ মশাই, প্যাঁশ্‌নের ওপরের ফাঁকটা দিয়ে তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিক। গায়ে চাপিয়েছেন একটা রবারের ম্যাকিনটশ্‌ আর পায়ে গালোশ্‌। তাঁকে দেখলে মনে হয় তিনি এখন বিলক্ষণ নেতা ব্যক্তি, বাদবাকি সকলের আস্থাভাজন।

কাতিয়াকে ডেকে বললেন, "তুমিও এস আমাদের সঙ্গে!"

কাতিয়া গেল ওদের কাছে। সকলের উশ্‌কোখুশ্‌কো শীর্ণ চেহারা। দু'জন বয়স্কা মহিলা খুব কেঁদেছেন বোঝা গেল চোখ দেখে। ছদ্মবেশ-ধারী ফাটকাবাজটিকে আর দেখা যাচ্ছে না।

"আমাদের দলের একজন খসে পড়েছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না, নিশ্চয়ই গুলি খেয়ে মারা গেছে,"—ফুর্তির সঙ্গে বললেন অব্‌রুচেভ : "যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় না করতে পারলে আমাদের কপালেও অবশ্য তা-ই লেখা আছে; বন্ধুরা! সময় নষ্ট না করে আমাদের ঠিক করে ফেলতে হবে : যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আমরা অপেক্ষা করব, না, আমাদের ওপর পাহারার বন্দোবস্ত দেখা যাচ্ছে না বলে সেই সুযোগে পায়ে হেঁটে রেলরাস্তার দিকে রওনা হব? জবাবের জন্য প্রত্যেক বক্তাকে এক মিনিট করে সময় দেয়া হল।"

সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কেউ বলল, খোলা মাঠের মধ্যে যদি ডাকাতরা ওদের হাতে পায়, তা হলে তো সর্বনাশ—নিঃসন্দেহে সবাইকে ওরা কোতল করবে। কেউ কেউ আবার বলল, পালাবার চেষ্টা করলে তবু বাঁচবার খানিকটা তো সম্ভাবনা আছে! একেক জনের আবার দৃঢ় বিশ্বাস জার্মানরা জিতবেই; তাই তারা ঝোঁক তুলল, যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাই করা যাক। পাহাড়ের ওপার থেকে আবার যখন গুর্‌গুর্‌ আওয়াজটা ভেসে এল, তখন সবাই চুপ মেরে গেছে, পাহাড়ের দিকটা খুব ভাল করে নজর করে দেখছে তারা, কিন্তু কিছুই ঠাহর হচ্ছে না—বায়ুকলের পাখাগুলোই শুধু অলসভাবে ঘুরছে। অব্‌রুচেভ একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। দলের মধ্যে নানারকম মতের গরমিল, সবগুলোই তিনি এক এক করে জানিয়ে দিলেন বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে। মহিলা দুটি তাঁর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে রইলেন এমনভাবে যেন সাক্ষাৎ কোনো অবতারের মুখনিঃসৃত বাণী শুনছেন। কোনো মীমাংসায় পৌঁছুতে না পেরে সবাই যে-যেমন দাঁড়িয়ে রইলেন শূন্য রাস্তাটার ওপর—মুরগি আর চড়ুইপাখির ভিড়ের মধ্যে। আশ্চর্য, এমন একটি লোকেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না যে তার দেশবাসী ভাইদের ওপর, রুশ ভাইদের ওপর দয়া দেখাতে পারে।.....এমন একটি প্রাণীরও দেখা মিলল না! জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়েছিল ঘোমটা-খোলা একটি স্ত্রীলোক, হাই তুলে ফিরে গেল ভেতরের দিকে। রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হল গোঁয়ার-গোবিন্দ

খানিকটা ঢাকা পড়েছে। চোখ দুটো যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে। কোমরবন্ধনীর মধ্যে হাতবোমা গোঁজা, চামড়ার জ্যাকেটের ওপর আড়াআড়িভাবে ঝুলছে মেশিন-গানের বেল্টটা, পিঠের ওপর ঘোড়সওয়ারী রাইফেল।

"একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না.....আপনি এখানে কী বলে? কার ঘরে রয়েছেন আপনি? ওইটা? মিত্রোফানের বাড়ি? মিত্রোফান তো আমারই খুড়তুতো ভাই. ওরও পদবী ক্রাসিলনিকভ। দেখুন তো—মিশকা বেচারির কি হাল হয়েছে—শ্রাপনেলে মাথার অর্ধেকটাই উড়িয়ে নিয়ে গেছে!"

কাতিয়া গাড়ির পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। লড়াইয়ের পরেও আলেক্সির মেজাজ চড়েই আছে, উত্তেজনার ভাবটা এখনো কাটেনি। চোখ আর দাঁতগুলো যেন ঝিকিয়ে উঠছে.....

"জার্মানগুলোকে আচ্ছারকম শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি।.....বোকা হাঁদাগুলো . . তিনবার ছুটে এসেছিল আমাদের মেশিনগানেব মুখে। হতভাগা শয়তানগুলো এখন চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে মাঠের মধ্যে। বুড়ো কত্তা এখন যা-হোক কিছু উর্দি-টুর্দি পেলেন ফৌজের জন্য।.....আরে এই! মিত্রোফান! গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এস তো! আহত এই বীরটিকে একবার ভেতরে জায়গা দাও। আর আপনি একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন না যেন। আপনার পক্ষে জায়গাটা ততো সুবিধের নয় কিন্তু.. ..."

ঘণ্টাঘর থেকে মৃদু টুং টুং আওযাজ আসছিল। সারা গাঁয়ে একটা চাঞ্চল্য—বেড়ার দরজায় আওয়াজ, খড়খড়ি টানার শব্দ, রাস্তায় ছুটে চলেছে মেয়েরা, চাষীরা পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসছে, যেন আকাশ থেকে এসে পড়ল রীতিমত একগাদা লোকের ভীড়; ওরা সবাই গান গাইতে গাইতে আর কথা বলতে বলতে স্তেপের দিকে চলেছে—মাখনোর বিজয়ী ফৌজকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য।

মিত্রোফানের বাড়ির উঠোনে আধ-মরা মিশকাকে টেনে আনছিল আলেক্সি ক্রাসিলনিকভ—ওকে সাহায্য করবার জন্য কাতিয়াও হাত লাগালো। তারপর ওরা দুজনে মিলে মিশকাকে ঠাণ্ডা ছায়ার মধ্যে এনে শুইয়ে দিল আলেকস্যান্দ্রার খাটে। কাতিয়া ওর ব্যাণ্ডেজ বদলাতে লেগে গেল, চুলের মধ্যে থেকে রক্ত-জমা নেকড়ার ফালি ছাড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। মিশকা দাঁতে দাঁত চেপে রইল—একটা আওয়াজও বের হল না তার মুখ থেকে। কাতিয়া যখন ওর মাথার খুলির ডান দিককার সাংঘাতিক জখমটা ধুয়ে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত, আলেকসান্দ্রা তখন গামলাটা হাতে ধরে গোঙাচ্ছে আর টলছে। গামলাটা ছিনিয়ে নিয়ে আলেক্সি তাকে একপাশে ঠেলে দিল।

"একটা হাড়ের টুকরো বেরিয়ে আছে ওদিকটা থেকে, দেখেছেন তো!" কাতিয়াকে বলল সে। "আলেকসান্দ্রা, ছিছরি-তোলা চিমটেটা নিয়ে এস না. "

"ঘরে একখানাও নেই—সব ভাঙা!"

কাতিয়া হাড়ের ছোট কানিটা আঙুল দিয়ে তুলতে গেল। একটা টান দিতেই ব্যথায় ককিয়ে উঠল মিশকা। নিশ্চয়ই ভাঙা টুকরো। আঙুল পিছলে যাচ্ছিল

তাকিয়ে আছে, তাই মাথা তুলতে পারছে না, পাছে চোখাচোখি হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় আলেক্সি কেন অমন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ওর মাথার দিকে। মিশকাও তাই করেছিল। ক্ষমা করা বা মিষ্টি কথা বলার সময় এখন নয়। কাতিয়া যখন ওদের পক্ষে যোগ দেয়নি তখন সে ওদের শত্রু। জানতে চেয়েছিল কেমন করে ও বাঁচবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিল এমন একজন সৈনিককে যে বিজয়ের উন্মাদনা নিয়ে সবে ফিরেছে লড়াইয়ের ময়দান থেকে, ঘোড়ার জিনের উষ্ণ উত্তাপ এখনো যার সর্বাঙ্গে কেমন করে ও বাঁচবে! প্রশ্নটা এখন কাতিয়ার নিজের কানেই অর্থহীন ঠেকছে। এবং ও যদি জিজ্ঞেস করত কার সঙ্গে থাকবে ও, স্তেপের বুকে কোন্ গাড়িটার পিছু পিছু ও চলবে কোন্ মুক্তির সন্ধানে, তাহলে নিশ্চয় মিলত সাড়া, আন্তরিকতার ঔজ্জ্বল্যে চক্‌চক্ করে উঠতো লোকটির চোখ। ..

কাতিয়া এ সবই বোঝে, তাই বুনো জন্তুর মতো ছটফট করতে থাকে। এতদিনে এই প্রথম সে একবার চেষ্টা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের।

"আপনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারছেন না, আলেক্সি ইভানোভিচ। শুকনো ঝরা পাতার মতো যে আমি সারা দেশটা ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি এ আমার নিজের দোষে নয়। কী ভালবাসব? কী নিয়ে থাকব?—কেউ তো আমায় তা শেখায়নি; তাই আমার কাছেও এ সব জিনিস আশা করবেন না। আগে আমায় শিখিয়ে দিন।" (আলেক্সি এবার হাতবোমাগুলো নাড়াচাড়া করা বন্ধ করেছে, তার মানে সে এখন কান খাড়া করে শুনছে) "আমি চাইনি, তবু ভাদিম পেত্রোভিচ যোগ দিয়েছিলেন শ্বেতরক্ষী ফৌজে। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না যে উনি যান। উনিই বরং আমায় গালাগাল করতেন আমার মনে ঘৃণা নেই বলে। . . সবই বুঝতে পারি, আলেক্সি ইভানোভিচ, সবই দেখতে পাই। কিন্তু আমি তো ..নির্লিপ্ত দর্শক মাত্র। বড়ো অসহ্য মনে হয়। আসলে এটিই আমার বড়ো সমস্যা। সেইজন্যই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কী করব, কেমন করে বাঁচব "

কথা বন্ধ করে এবার সে আলেক্সি ইভানোভিচের দিকে পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে তাকায়। আলেক্সি চোখ পিট্‌পিট্ করে। ওর মুখের ভাবটা এখন একটু অপ্রস্তুত বোকা-বোকা ধরনের। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে সে। মাথার পেছনে হাতটা ওর আপনা থেকেই উঠে যায়, ভাবখানা যেন চুলকোতে যাচ্ছে। নাকটা একটু কুঁচকে নিয়ে বলল ·

"আপনি ঠিকই বলেছেন, ব্যাপারটা রীতিমত নাটকই। তবে আমাদের কাছে এসব জিনিস সহজ সরল। বাড়ির উঠোনে একটি জার্মানকে খুন করে ফেলেছিল আমার ভাই, ওরাও সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে দিল বাড়িটা... ..আমরা তাই চলে এলাম। কোথায় এলাম জানেন? আতামানের কাছে। কিন্তু আপনি তো ভদ্রঘরের মেয়ে ..হ্যাঁ, তা আপনার পক্ষে কঠিন বই কি। "

কাতিয়ার কৌশলে কাজ হয়েছে তাহলে। এদিকে যে-হতচ্ছাড়া সমস্যাটার সমাধান করা এই মুহূর্তেই দরকার বলে আলেক্সি ইভানোভিচের মনে হচ্ছে তা

ছেলেরা নাচানাচি করছে, মেয়েরা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মুখে ফেনা-ওঠা ঘোড়াগুলোর গায়ে ঘাম ঝরছে, দু'পাশ ফুলে ফুলে উঠছে। মাখনোর লোকেরা সামনে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল—মাথার টুপি পেছনে ঠেলে দিয়েছে ওরা, গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে অনেকে, সর্বাঙ্গ ঘাম আর ধুলোয় ভরা।

মাখনো তার ইরানী কার্পেট-ঢাকা গাড়িটায় চড়ে সামনে দিয়ে চলে গেল। গোলাবারুদের একটা বাক্সের ওপর বসে সে এপাশ-ওপাশ দুলছিল। ভেড়ার চামড়ার টুপিটা সে চেপে ধরেছে হাঁটুর ওপর। মুখটা ফ্যাকাশে আর আড়ষ্ট, শুকনো ঠোঁট দুটো চেপে রেখেছে।

মাখনোর পিছনের গাড়িটায় বসে আছে ছ'জন লোক—পরনে ছোট কোর্তা, ফেল্টের টুপি, স্ত্রী'য়ের তৈরি নৌকা-বিহারের টুপি মাথায়। দেখলেই মনে হয় এরা শহরের লোক। প্রত্যেকেরই লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল আর চোখে চশমা। এরা হল সব সদর-দপ্তর আর রাজনৈতিক বিভাগের অ্যানার্কিস্ট সদস্য।

॥ সাত ॥

শূন্য বাড়িতে একা-একাই পাঁচটা মাস কাটিয়ে দিল দাশা। ফ্রন্টে যাবার সময় ইভান ইলিয়িচ ওকে এক হাজার রুব্‌ল্‌ দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর কতদিন? ভাগ্যক্রমে এমনি সময়ে ওদের নিচের তলার ফ্ল্যাটটা খালি হয়ে গেল—পিতার্সবুর্গের এক সরকারী কর্মচারী পরিবার নিয়ে ভেগে পড়লেন, তার বদলে ওই ফ্ল্যাটটিতে এলেন মাৎ নামে একজন বিদেশী ফরিৎকর্মা ভদ্রলোক। তিনি একধার থেকে কিনতে লাগলেন ছবি, আসবাবপত্র, এটা-সেটা যা হাতে পান তা-ই।

দাশা তার ডবল-বেডটা, কয়েকটা ছবি আর সেই সঙ্গে পোর্সিলিনের বাসন-পত্র কিছু বেচে দিল ভদ্রলোকের কাছে। স্মৃতিধন্য এইসব সামগ্রী কাছ-ছাড়া করতে কিন্তু এখন তার একটুও কষ্ট হল না। অতীতকে সে সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে মন থেকে।

বিক্রির পয়সা থেকেই কোনোরকমে চালিয়ে গেল সে বসন্ত আর গ্রীষ্মের দিনগুলো। রোজই শহরটা একটু-একটু করে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। পিতার্সবুর্গ থেকে ট্রেনে মাত্র একঘণ্টার পথ পেরুলেই খাস লড়াইয়ের ময়দান—সেম্ত্রা নদীর ঠিক ওপারটায়। গভর্নমেণ্ট মস্কোতে স্থানান্তরিত হয়েছে। শূন্য, ভাঙা জানলার ভেতর দিয়ে প্রাসাদগুলো যেন তাকিয়ে আছে নেভা নদীর জলের দিকে। রাস্তায় আলো জ্বলে না। বুর্জোয়াদের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখবার মতো যথেষ্ট আগ্রহ মিলিশিয়া-বাহিনীর আর নেই—বুর্জোয়ারা তো মোটের ওপর সাবাড় হয়ে যাবেই। সাংঘাতিক একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে আজকাল রাস্তাঘাটে। তারা জানলা দিয়ে ঘরে উঁকি মারে, অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে, দরজার হাতল ধরে টানাটানি করে। দরজায় এক-ডজন তালা-শেকল না মারলে তো সর্বনাশ! একটু পরে হয়তো শোনা যাবে চুপি-চুপি চলে বেড়াবার শব্দ, তারপরেই ঘরে এসে হাজির হবে অপরিচিত একদল লোক, চেঁচিয়ে বলবে: "হাত তোলো!" ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা ঘরের বাসিন্দাদের ওপর, বিদ্যুতের তার দিয়ে বাঁধবে ওদের, তারপর অবসর মতো বস্তাবন্দী করে টেনে নিয়ে যাবে মালপত্র।

শহরে কলেরা লেগেছিল। জাম গাছে যখন জাম পাকার সময় তখন রোগটা যেন বিকট আকার ধারণ করল—রাস্তায় বাজারে যখন-তখন লোকে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে শুরু করে। তার ওপর আবার নানা-রকমের কানাকানি গুজব আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। অবিশ্বাস্য ধরনের বিপদের আশঙ্কা করে সবাই। লাল ফৌজের সৈন্যেরা নাকি টুপির ফিতের ওপর পাঁচ-মুখো তারা-গুলো উল্‌টো করে পরছে আজকাল—ওটা হল অ্যানার্কিস্টদের চিহ্ন। তার উপর আবার 'লেফটেন্যাণ্ট শ্‌মিট্‌' পুলের তালাবন্ধ উপাসনা-ঘরটার মধ্যে নাকি একটি 'সাদা মানুষ'কে প্রায়ই ঘুরতে দেখা যাচ্ছে,—এ ঘটনার মানে হল সমুদ্রের দিক থেকেই

তাতে বসানো আছে ছোট্ট একটি পালক তার করুণ স্বকীয়তাটুকু বজায় রেখে। দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়েই কাতিয়া একবার ঘুরে দাঁড়াল দাশার কথা ভেবে—দেখল দাশা বসে আছে ট্রাঙ্কটার ওপর। "আমার সঙ্গে চল্ না দাশা..." কিন্তু ও গেল না দিদির সঙ্গে। আর এখন.....প্যারিসে যাবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি সে? প্যারিসকে দাশা জেনেছে কাতিয়ার চিঠির মারফত : সুগন্ধির কৌটোর মতো নীল, রেশমী আর সৌরভস্নিগ্ধ সে শহর।.....সেলাই করতে করতে অজ্ঞাতসারেই দাশার আবেগকম্পিত বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। রাশিয়া ছাড়বে ও! কিন্তু ট্রেন নাকি পাওয়া যায় না, কাউকে নাকি বিদেশে যেতে দেওয়া হয় না।...হয়তো বা পায়ে হেঁটে চেষ্টা করা যায়, ন্যাপ্‌স্যাক কাঁধে ফেলে, বনবাদাড় মাঠঘাট পাহাড়-নদী ডিঙিয়ে একটার পর একটা দেশ পার হয়ে অবশেষে হয়তো গিয়ে পৌঁছনো যায় বেই মনোরম স্বর্গপুরীতে।...চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে দাশার। কী বোকার মতো ভাবছে সে!...যুদ্ধ যে আজ সব জায়গায়! প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কামান থেকে জার্মানরা গোলা ফেলছে প্যারিসের ওপর। স্বপ্ন, সবই স্বপ্ন। একজন মানুষ নিরুপদ্রব সুখী জীবন নিয়ে থাকবে, তাতে বাধা দেওয়াটা কি উচিত? দাশা তাদের কোন্ ক্ষতিটা করেছে? আঙুলস্তান্‌টা আবার গড়িয়ে যায় আরাম-কেদারার নিচে, ওর চোখের জলে ঝিকমিকিয়ে ওঠে রোদ, সোয়ালোগুলো নিচু হয়ে উড়ে যায় করুণভাবে ডাকতে ডাকতে : ওরা তো ভালই আছে, সামান্য কিছু পোকা-মাকড় আর মশা হলেই ওদের চলে।.....'যাব আমি—নিশ্চয় যাব!' ফুঁপিয়ে ওঠে দাশা।

ঠিক এমন সময় দরজার ওপর কে যেন পর পর অনেকগুলো ঘা মারে—যেন কোনো জরুরি তাগিদে। জানলার কাঠের ওপর সুঁচ-সুতো রেখে দাশা সেলাইয়ের কাপড়টা দলা পাকিয়ে তা দিয়ে চোখ মোছে, তারপর আরামকেদারার ওপর সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় কে ধাক্কা দিচ্ছে দেখবার জন্য.

"দারিয়া দ্‌মিত্রেভনা তেলেগিন কি এখানে থাকেন?"

জবাব না দিয়ে দাশা কুলুপের ফুটোয় উঁকি মারে। ওদিক থেকেও তখন কে যেন ঝুঁকে পড়েছে উঁকি দেবার জন্য; সতর্ক কণ্ঠে কুলুপের ফুটো দিয়ে বলল সে : "তার নামে রস্তভ্ থেকে একটা চিঠি এনেছি...।"

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খোলে দাশা। একজন অপরিচিত লোক, ভাঁজ-পড়া সৈনিকের জোব্বাকোট গায়ে, মাথায় জীর্ণ চুড়ো টুপি। চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে আসে লোকটি। ভয় পেয়ে দাশা পিছিয়ে যায় হাত দুটো সামনে ছড়িয়ে। আগন্তুক তাড়াতাড়ি বলে :

"ভগবানের দোহাই. .সত্যি করে বল তো দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না, তুমি আমায় চিনতে পারছ না?"

"না তো... .."

"আমি হচ্ছি কুলিচক্, নিকানর য়ুরেভিচ্ কুলিচক্ ব্যারিস্টার সেম্ভ্রোরেৎস্কের কথা ভুলে গেছ তুমি?"

দাশা হাত দুটো নামিয়ে লোকটির রোগা, দাড়ি-গজানো, টিকলো-নাকওয়ালা মুখটার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে। সতর্ক চঞ্চল চোখদুটো ঘিরে অনেক-গুলো ভাঁজ পড়েছে চামড়ার,—তার মানে সাবধানে থাকাই অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে লোকটির। বাঁকা ঠোঁটদুটোর মধ্যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠুরতার চিহ্ন। বিপদের সন্ধান-পাওয়া বন্যজন্তুর মতো চেহারা মানুষটার।

"তুমি নিশ্চয়ই ভোলোনি দারিয়া দ্মিত্রেভ্না।...আমি ছিলাম তোমার দিদির আগের স্বামী নিকোলাই ইভানোভিচ স্মোকভনিকভের সহকারী।...আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে. মনে পড়ে সে কথা?" হঠাৎ হাসল লোকটি, তার সেই হাসির মধ্যেই যেন লুকিয়ে ছিল যুদ্ধের আগের সেইসব বিস্মৃত দিনগুলোর খানিকটা স্মৃতি, সঙ্গে সঙ্গে দাশার মনে পড়ে গেল সব কিছু: সেই ফ্ল্যাটবাড়ি, সমুদ্র-সৈকত, উষ্ণ তন্দ্রাতুর উপসাগরের বুকে সূর্যের আলোর সেই কুহেলি, ওর নিজের সেই হুল-ফোটানো স্বভাব, পোশাক-আশাকে বালিকাসুলভ রুচি, প্রেমমুগ্ধ কুলিচক্ যাকে ও উদ্ধত কুমারীত্বের অহঙ্কারে ঘৃণাই করত,—সবই মনে পড়ে গেল ওর।...সমুদ্রের বালিয়াড়িতে উঁচু-উঁচু পাইনগাছগুলো দিন-রাত সুগভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছড়াতো তাদের সৌগন্ধ্য...সে কথাও মনে পড়ে।

"অনেকখানি বদলে গেছেন আপনি", কুলিচকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল দাশা। কুশলী হাতে ওর হাতটা ধরে কুলিচক্ চুম্বন করল। সৈনিকের কোট গায়ে থাকা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছিল সে এত বছর অশ্বারোহী দলেই কাটিয়েছে।

"এবার অনুমতি দাও—চিঠিটা তোমার হাতে তুলে দি'। আমায় তুমি অনুমতি দিলে অন্য জায়গায় গিয়ে বুটটা খুলে ফেলি। মাফ করবে, চিঠিটা আমার বুটের মধ্যেই রয়েছে, তাই বলছিলাম. .."

অর্থপূর্ণভাবে এদিক-উদিক চেয়ে সে দাশার পিছন-পিছন একটা খালি ঘরের মধ্যে এল। মেঝের ওপর বসে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে কাদামাখা বুটটা খুলতে লেগে গেল।

চিঠিটা কাতিয়ার। এই চিঠিটাই সে রস্তভে থাকতে কর্নেল তেৎকিনের হাতে দিয়েছিল।

প্রথম লাইনটা পড়েই দাশা আর্তনাদ করে নিজের গলাটা চেপে ধরল। ভাদিম মারা গেছে! চিঠির ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নেয় ও। তারপর আবার উৎসুকভাবে গোড়া থেকে পড়তে শুরু করে। একটা চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পড়ে ও, যেন সম্বিত হারিয়েছে। কুলিচক্ দাঁড়িয়ে থাকে সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রেখে।

"নিকানর য়ুরেভিচ, আমার দিদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?"

"না, দারিয়া দ্মিত্রেভনা। যে লোকটি আমার হাতে চিঠি দেয় সে বলেছিল একাতেরিনা দ্মিত্রেভনা নাকি তার মাসখানেক আগেই রস্তভ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন....."

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দাশা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কুলিচক উপহাসের হাসি হাসে।

"ভেবেছ এই বুঝি শেষ? এ তো সবে আমাদের প্রতিশোধের শুরু! সারা দেশে আগুন জ্বলে যাবে না! সামারা, ওরেনবুর্গ, উফা, গোটা উরাল অঞ্চলটাই এখন জ্বলছে। চাষীদের মধ্যে যারা একটু বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে তারা নিজেরাই গড়ে তুলছে শ্বেত ফৌজ। মধ্য ভলগার গোটা অঞ্চলটাই এখন চেকদের হাতে। সামারা থেকে ভ্লাদিভস্তক পর্যন্ত সারা দেশটা যেন এককাঠ্ঠা হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হতভাগা জার্মানগুলো না থাকলে এতদিনে লিট্‌ল্‌ রাশিয়াও খাড়া হয়ে উঠতো। উত্তর-ভলগা জেলার শহরগুলো তো বারুদের স্তূপ হয়ে আছে, একটু আগুনের ফুলকি পেলেই জ্বলে উঠবে দপ্‌ করে।...বলশেভিকদের আর একটি মাসও টিঁকতে দেয়া উচিত নয়, আমি হলে ওদের আর হাঁফ ছাড়বার সুযোগই দিতাম না।..."

উত্তেজনায় কাঁপছিল কুলিচক। ওকে আর এখন খুদে বুনো জন্তুর মতো দেখাচ্ছে না। ওর কাটা-কাটা নাকমুখের দিকে তাকিয়ে রইল দাশা, স্তেপ-প্রান্তরের হাওয়া লেগে পোক্ত হয়ে গেছে মুখখানা, লড়াইয়ের ময়দানে থেকে থেকে কঠিন হয়ে উঠেছে। দাশার নির্লেপ একাকীত্বের মধ্যে এবার যেন এক ঝলক উত্তপ্ত রক্তোচ্ছ্বসিত জীবনের সবল আবির্ভাব ঘটল। কপালের দুপাশে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছিল দাশা, বুকটাও ভয়ানক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে। কুলিচক কথা বন্ধ করে যখন ছোট-ছোট দাঁতগুলো বের করে কাগজে তামাক জড়াতে শুরু করল, দাশা বলে উঠল:

"আপনারা নিশ্চয়ই জিতবেন। কিন্তু যুদ্ধ তো চিরকাল চলবে না. .তখন কী হবে?"

"তখন?" নিঃশ্বাস নিয়ে সে চোখ দুটো ছোট-ছোট করে জবাব দিল: "তখন—জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ জিতে গেছি, শান্তি কংগ্রেস হচ্ছে, তাতে আমরা বিজয়ী বীরের মতো যোগ দিতে যাচ্ছি, আর তারপর—মিত্রশক্তির সমবেত শক্তি নিয়ে, সারা ইউরোপের শক্তি জড়ো করে রাশিয়ার পুনরুজ্জীবন, শৃঙ্খলা, আইনসঙ্গত আচরণ, পার্লামেণ্ট-পদ্ধতি আর স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন চলছে।..এ হল ভবিষ্যতের কথা...কিন্তু আপাতত..."

হঠাৎ কোটের নিচে বুকের ডান দিকটায় হাতড়াতে লাগল ও কিসের খোঁজে। সাবধানে কার্ডবোর্ডের একটা টুকরো বের কবল, মাঝখানে দু'ভাঁজ-করা একটা সিগারেটের বাক্সের ঢাকনা। আঙুলের মধ্যে বার কয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিল সেটা। আরেকবার দাশার মুখের দিকে কড়া নজরে তাকিয়ে বলল:

"কোনোরকম ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না। বুঝতেই তো পারছ.....এখানকার রাস্তাঘাটে যে-কোনো লোককে তল্লাশি করতে পারে।.....আমি তোমাকে একটা জিনিস দিতে চাই।"

কার্ডবোর্ডটার ভাঁজ খুলে একটা ছোট তেকোণা টুকরো বার করল সে, ভিজিটিং-কার্ড কেটে তৈরি করা হয়েছে জিনিসটা। উপরে লেখা রয়েছে দুটো

লেবে বলেই মনে হচ্ছিল। সংঘের মধ্যে অবশ্য এমন জার্মান-প্রেমিকের সংখ্যা বড় কম ছিল না যারা জার্মান সঙ্গীনের অমিতপরাক্রম ছাড়া অন্য কিছুর উপর ভরসাই করত না, কিন্তু তবু সাধারণ ঝোঁকটা ছিল 'মিত্রশক্তির' পক্ষেই। জার্মানরা কবে মস্কোতে প্রবেশ করবে সে তারিখটা অবধি ঠিক হয়ে গিয়েছিল—পনেরোই জুন। সংঘ তাই ক্রেমলিন ও মস্কো দখলে রাখার বাসনাটা ছেড়ে দিয়ে তার সামরিক ইউনিট হটিয়ে কাজানে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করল। ঠিক হল যাবার সময় তারা মস্কোর আশেপাশে সেতু ও জলাধার উড়িয়ে দেবে; নিঝ্নি, কস্ত্রোমা, রীবিন্স্ক্ ও মুরোমে বিদ্রোহ ঘটাবে; চেকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা প্রাচ্য রণাঙ্গনও খুলবে যাতে উরাল অঞ্চল ও ভলগার সম্পদশালী এলাকাগুলো থেকে রসদের জোগান আসে।

কুলিচক দাশাকে যা-যা বলেছিল তার প্রত্যেকটি কথা ও বিশ্বাস করেছে : রুশ দেশপ্রেমিকরা অর্থাৎ কুলিচকের ভাষায় 'পবিত্র-আত্মার বীর-যোদ্ধারা' লড়াই করছে কেন? না, যাতে ঐ আলুওয়ালা ফিনগুলোর ধাষ্টামো আর সইতে না হয়, পিতার্সবুর্গের রাস্তায় রাস্তায় যাতে আবার উজ্জ্বল আলো জ্বলে ওঠে, কাতারে কাতারে প্রমোদবিলাসী ভদ্রবেশী মানুষ যাতে আবার ভিড় জমাতে পারে, যাতে মনে ক্ষণিকের বৈরাগ্য এলেই মানুষ পালক-গোঁজা টুপিটা মাথায় বসিয়ে প্যারিস্ রওনা হতে পারে.....সামার পার্কে যাতে আর কোনোদিন 'লাফানে' গুণ্ডার উপদ্রব না ঘটে, দাশার মৃত সন্তানের কবরের ওপর যাতে বাতাসের গোঙানি আর শুনতে না হয়।

এক কাপ চা খেতে খেতে কুলিচক এত সব আশার কথা শুনিয়ে দিল দাশাকে। খিদেয় নেকড়ের মতো হন্যে হয়ে উঠেছিল সে, দাশার জমিয়ে-রাখা টিনের খাবার সে অর্ধেকই উড়িয়ে দিল; এমন-কি নুন দিয়ে শুধু-শুধু কাঁচা ময়দাও খেয়ে ফেলল খানিক। তারপর সন্ধ্যে নাগাদ চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল বাইরে, সঙ্গে নিয়ে গেল দরজার চাবি।.....

দাশা শুয়ে পড়েছে। জানলার ওপর পর্দাটা টেনে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে সে। কিন্তু ক্লান্তিকর নিদ্রাহীনতার মধ্যে অনেকক্ষণ সময় কাটালে যেমনটি হয়ে থাকে : নানা চিন্তা, এটা-ওটা কল্পনা, কতো স্মৃতি, হঠাৎ কিছুর আবিষ্কার, কিংবা তীব্র অনুশোচনা, সব যেন একের পর এক পাগলের মতো ভিড় করে আসতে থাকে ওর মনে।.....দাশা খালি ছটফট করছে, পাশ ফিরছে, বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কখনো চিৎ হয়ে, কখনো উপুড় হয়ে শুচ্ছে। ... কম্বলটা যেন গায়ে বিঁধছে, গদির স্প্রিংগুলো যেন দুপাশ থেকে চেপে ধরছে ওকে, বিছানার চাদর যেন খসে পড়ছে হরদম.....

এমন বিশ্রী রাতটা—যেন কাটতেই চায় না। দাশার মনের সেই অন্ধকার ছায়াটা আবার বুঝি প্রাণ পেয়েছে, মস্তিষ্কের কন্দরে কন্দরে তার বিষাক্ত শিকড় চালিয়ে দিচ্ছে আবার। কিন্তু কেন বিবেকের এই দংশন, কেন এই ভয়াবহ অপরাধের অনুভূতি? ভেবে যে থই পায় না সে।

অনেকক্ষণ বাদে, দিনের আলো যখন জানলার পর্দায় নীলাভ হয়ে ফুটে

উঠেছে, দাশা তখন দুশ্চিন্তার এই উদ্ভট গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে অবসন্ন হয়ে পড়ে, দুর্বল হয়ে অবশেষে ধীরমস্তিষ্কে যথাসম্ভব সততা আর সরলতা দিয়ে যাচাই করতে থাকে নিজেকে—বুঝতে পারে যে ওর আগাগোড়া সব কিছুই ভুল।

বিছানাতেই উঠে বসে চুলগুলো জড়িয়ে গিঁট বেঁধে নেয়। রোগা রোগা হাতদুটো হাঁটুর ওপর রাখে আর নিজেকে ছেড়ে দেয় ভাবনার সমুদ্রে।.....নিঃসঙ্গ, স্বপ্নালু, প্রেমাবেগহীন শীতল এক জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচেছে সে।..... সামার পার্কে 'লাফানে গুণ্ডারা' ওকে ভয় দেখিয়ে ভালই করেছিল—তবু সেটাও যথেষ্ট হয়নি—আরও সাংঘাতিক ভয় পাওয়া উচিত ছিল তার। আর এখন তো উধাও হওয়ার পালা. . . .এখন বাতাসের ঝাপটায় নিজেকে সঁপে দিয়ে উড়ে যাও, হে আমার প্রাণ বিহঙ্গ, যেখানে তোমায় টেনে নিয়ে যাবে ঝড়, যেখানে ফেলবে নিয়ে তোমায়।.....তোমার নিজের খুশি বলে কিছু নেই.....আরও হাজার লক্ষের মধ্যে তুমিও একজন.....আহা কী শান্তি, মুক্তির সে কী আস্বাদ!

পুরো দু'দিন কুলিচক বাইরে বাইরেই রইল। ওর অবর্তমানে অনেক ক'জন লোক এসেছিল দাশার ঘরে। সবাই লম্বা, পরনে জীর্ণ কোর্তা, একটু অপ্রতিভ ভাব, কিন্তু সবাই অত্যন্ত ভদ্র। চাবির ফুটোর কাছে ঝুঁকে পড়ে ওরা সংকেতে কথা বলেছে আর দাশা তখন খুলে দিয়েছে দরজা। "ইভান স্ভিশ্চেভ্" বাড়ি নেই শুনেও মনে হল না ওদের কারো ফিরে যাবার তাড়া আছে। একজন তো হঠাৎ নিজের বাড়ি-ঘরদোরের দুরবস্থার কথাই শুরু করে দিল। আরেকজন ধূমপানের অনুমতি চেয়ে নামের আদ্যাক্ষর-লেখা একটা সিগারেট-কেস বের করল, তাতে রয়েছে কতকগুলো জঘন্য সোবিয়েত সিগারেট। "সেপাই আর ইতরজনতার" ডেপুটিদের উদ্দেশে নোংরা গালাগাল ঝাড়তে শুরু করল সে—ফরাসী কায়দায় লোকটা 'র' গুলোকে 'র্-র্' উচ্চারণ করে। আরেকজন আবার দাশাকে তার প্রাণের কথা খুলে বলতে আরম্ভ করল—ক্রেস্তভ্স্কি দ্বীপে নাকি তার জন্য একটা মোটর-লঞ্চ অপেক্ষা করছে, বেলোসেল্স্কি-বেলেজের্স্কি প্রাসাদের ঠিক সামনেই; সিন্দুক থেকে নাকি কিছু গয়নাপত্রও উদ্ধার করতে পেরেছে সে.....তারপর ছেলেমেয়েগুলোর আবার হুপিং কাশি হয়েছে.....কপালই মন্দ!

বড়ো-বড়ো চোখওয়ালা সুন্দরী এই তন্বীটির সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করার সুয়োগ পেয়ে ওরা সর্বাই যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে মনে হল। যাওয়ার সময় দাশার করচুম্বন করেছে ওরা। একটা জিনিস শুধু অবাক করেছে দাশাকে—এরা সবাই বোধহয় দারুণ গোবেচারা-প্রকৃতির চক্রান্তকারী, কোনো উদ্ভট নাটকের চরিত্রগুলো যেমন হয়ে থাকে হুবহু তেমনি।.....সবাই খুব সাবধানে শব্দ বাছাই করে করে জিজ্ঞেস করেছে একটি কথা : "ইভান স্ভিশ্চেভ" খরচ-খরচা বাবদ কিছু টাকা-পয়সা এনেছে কি না। ওদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় ধারণা "মুর্খের মতো বলশেভিকদের এই খেলা" আর দুদিন বাদেই ফুরোবে। "পেত্রোগ্রাদ দখল করতে জার্মানদের তো আর এমন কিছু বেগ পেতে হবে না, মোটের ওপর!"

অবশেষে আবার কুলিচকের আবির্ভাব হয়। আগের মতোই শুকিয়ে-যাওয়া

দাশার উল্টোদিকে দু'জন স্ত্রীলোক বসেছিল মুখ বুজে, নিজেদের ভাবনায় ডুবে। ওদের মাঝখানে বসেছে রোগাপানা একচোখ-কানা একটি চাষী মানুষ, ইয়া গোঁফজোড়া তার, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথায় দিয়েছে স্ট্রয়ের টুপি, চটের বস্তা কেটে তৈরি করেছে গায়ের জামাটা, গলার কাছে বেঁধে রেখেছে ফিতে দিয়ে। বেল্টের মধ্যে গুঁজেছে একটা চিরুণী আর কপিং পেন্সিলের টুকরো, জামার বুকের মধ্যে গুঁজে রেখেছে এক বাণ্ডিল কাগজ।

দাশা প্রথমটায় ওদের আলাপ-আলোচনায় কান দেয়নি। কিন্তু একটু বাদেই সে বুঝলো কানা লোকটি নিশ্চয় দারুণ মজার কোনো ঘটনার কথা বলে চলেছে। এক এক করে সমস্ত মাথাগুলোই ফিবতে আরম্ভ করেছে তার দিকে, কামরাটাও বেশ চুপচাপ হয়ে এসেছে এর মধ্যে। রাইফেল-হাতে একজন সৈনিক বেশ জোর দিয়েই বলল :

"আমি জানি তোমরা কে—তোমরা সবাই পার্টিজান—মানে মাখনোর লোক।"

কানা লোকটা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গোঁফেব তলায় খুব একটা শেয়ানা হাসি হেসে বলল :

"উঁহু—আসল শুয়োরটার কানই যে পাকড়াতে পারলে না ভায়া।"

গিঁট-পড়া হাতখানা একপাশ দিয়ে গোঁফের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে যেন হাসিটাকে আড়াল করাব চেষ্টা কবল সে। খানিকটা গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বলে চলল :

"মাখনো.. .সে তো কুলাকদের দল ...একাতেরিনোস্লাভের কাছাকাছি হল তার আড্ডা। সেখানে তো একশো একরের নিচে কাউকে জমিই চষতে হয় না ভাই। আমরা হলাম অন্য। আমরা লাল পার্টিজান।"

"তা, কী করা হয় আপনাদের শুনি?"—উপরের তাক থেকে আগ্রহভবা মুখে সেই সহযাত্রীটি জিজ্ঞেস কবল।

"আমাদের কাজের এলাকা চের্নিগভ অঞ্চল আর নেঝিন অঞ্চলের উত্তর দিকটা, বুঝেছেন তো? আমরা হলাম কমিউনিস্ট। জার্মানরা, পোলিশ জমিদার, হেৎমানের গাইদামাক আর নিজেদেব গাঁয়ের কুলাকবা—আমাদের চোখে এরা সবাই এক।.. তাই আমাদের সঙ্গে মাখনোর লোকদের গুলিযে ফেলাটা ঠিক নয়, বুঝলেন?"

"আমবা ঠিকই বুঝেছি! ধানেব চালের ভাত খাই তো—যাক্ গে, গল্পটা আগে শেষ করুন দেখি!"

"বেশ শুনুন তাহলে—ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম : জার্মানদের সঙ্গে সেই লড়াইটার পর তো আমরা দমে গেলাম একেবারে। কশেলেভ্ জঙ্গলের দিকে পিছু হটতে শুরু করলাম, ঢুকলাম গিয়ে একেবারে জঙ্গলের মাঝখানে। সেখানে নেকড়ে ছাড়া আর কোনো প্রাণীই থাকে না। সেখানে খানিক জিরিয়ে নিলাম। কাছাকাছি গ্রামগুলো থেকে লোকেরা আসতে লাগল আমাদের কাছে। ওরা বলল জীবন নাকি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জার্মানরা এবার দস্তুরমতো পার্টিজানদের খেদাতে লেগে গেছে। গাইদামাকদের পাঠানো হয়েছে জার্মানদের সাহায্য করবার জন্য। এমন একটি দিনও যায় না যেদিন তারা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে কাউকে-না-কাউকে

আমরা যা কিছু নিতাম তার জন্য নগদ পয়সা দিতে হত, লুঠতরাজের শাস্তি ছিল ফাঁসির দড়ি। আমি তো যাহোক একটা গাড়ি জোগাড় করে রওনা হলাম কশেলেভ বনের দিকে। মারুনিয়া আর আমি নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-টালাপ করলাম। ও আমাকে ধার দিল এক হাজার কেরেন্স্কি রুব্‌ল।...ফিরতি পথে ঝুকভ্‌কা গাঁয়ের পাশের ঢালু পাহাড়ী রাস্তাটার মধ্যে সবে ঢুকেছি এমন সময় ঝুকভ্‌কা বিপ্লবী-কমিটিরই দু'জন টহলদার ঘোড়সওয়ার ছুটে এল আমার দিকে। 'কোথায় চলেছ হে—ওদিকে যে জার্মানরা রয়েছে!' 'কোন্‌দিকে?' 'ওই তো, ঝুকভ্‌কার মধ্যে প্রায় ঢুকেই পড়েছে ওরা!' ঘুরলাম পেছন দিকে...একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গাড়ি থেকে নামলাম। ওদের সঙ্গে বসে গবেষণা শুরু করলাম কী করা যায় এখন। জার্মানদের সঙ্গে এখন মুখোমুখি পুরো লড়াই দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওদের একটা গোটা সারিই এখন ছুটে আসছে, সঙ্গে কামানও আছে।..."

"এক সারি সৈন্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষবে মাত্র তিনজন? এ তো এক মস্ত বড়ো ঝুঁকি!"—বলল সৈনিকটা।

"যা বলেছেন! আমরাও তাই ঠিক করলাম খালি ভয় দেখাবার চেষ্টা করব ওদের। রাইস্কেতের তলা দিয়ে দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগলাম। ঝুকভ্‌কা গ্রামটা দেখতে পাচ্ছিলাম, জঙ্গল থেকে এক সারি সৈন্য এগিয়ে আসছে তাও নজরে পড়ল—প্রায় শ' দুই লোক হবে, সঙ্গে দুটো কামান, কয়েকটা মালটানা গাড়ি, আর খানিকটা এগিয়ে সামনে রয়েছে একজন ঘোড়সওয়ার টহলদার। আমাদের পার্টিজানদের খ্যাতি নিশ্চয়ই ঢোল-শহরতে ছড়িয়ে পড়েছিল, নইলে আর সত্যি-সত্যিই কামান পাঠায় ওরা! শব্‌জিখেতের মধ্যে তো আমরা মাথা গুঁজে পড়ে রইলাম। আমাদের মনের জোরও ছিল যথেষ্ট—মজাদার একটা কিছু ঘটবে এই আশায় হাসি আর ধরে না। টহলদার সওয়ারটা যখন আমাদের সামনেই কয়েকগজ তফাতে এসে পড়েছে, আমি হুকুম দিলাম: 'ব্যাটালিয়ন, চালাও গুলি' * দু' রাউন্ড গুলি চালালাম আমরা।..... একটা ঘোড়া পিছন দিকে উল্টে যেতেই জার্মান সওয়ারটা কাঁটাগাছের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। আবার গুলি চালালাম। রাইফেলের কুঁদো খট্‌মটিয়ে মাটিতে ঠুকে যথাসম্ভব জোর আওয়াজ করতে শুরু করলাম আমরা....."

তাকের ওপরের সেই মুখটা থেকে এবার একজোড়া চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হি-হি করে হাসতে গিয়েই পাছে একটা শব্দও ফসকে যায় সেই ভয়ে অতিকষ্টে হাত দিয়ে মুখ চেপে রইল সে। সৈনিকটি খুশিতে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

"টহলদারটা তখন ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে গেল নিজের সারিতে। জার্মানগুলো ডান দিকে ঘুরেই একজোট হয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়াল। তারপর শুরু করল

---

* ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো কোম্পানি নিয়ে হয় ব্যাটালিয়ন—এতে সৈন্য সংখ্যাও থাকে প্রচুর।

পুরোদস্তুর লড়াই। চোখের পলকে ওরা গাড়ি থেকে কামান দাগতে আরম্ভ করল। শবজিক্ষেতের ওপর গোঁ গোঁ করে উড়ে আসতে লাগলো তিন ইঞ্চি ব্যাসের গোলা। মেয়েরা তখন শবজিক্ষেতে আলু তুলছিল।...একটা গোলা ফাটলো, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠলো এক গাদা মাটি। আমাদের মেয়েরা তো....." (বলতে বলতে এক-চোখো মানুষটা এক আঙুলে টুপিটা ঠেলে দেয় কানের ওপর, ফূর্তি চেপে রাখতে পারছে না আর; ওপরের তাক থেকে লোকটা হো-হো করে হাসে) "আলুক্ষেত থেকে আমাদের মেয়েরা তো মুরগির মতো দৌড়োদৌড়ি করে ছুটে পালিয়ে আসতে থাকে।.. ...এদিকে জার্মানরা তখন ডবল-মার্চ করে এগিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে। সঙ্গীদের বললাম : 'ওহে, মজা যা দেখবার তা তো দেখেই নিয়েছি—এখন এস, কেটে পড়া যাক এখান থেকে!' রাইক্ষেতের মধ্যে দিযে আবার গুঁড়ি মেরে-মেরে ফিরে চললাম খাদটার দিকে। তারপর গাড়িতে উঠেই ছুটলাম দ্রুজ্‌দভ বনের দিকে—অনেক অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা গেছে, আর নয়। পরে যা-যা ঘটেছিল ঝুকভ্‌কার লোকদের মুখেই শুনেছি : জার্মানরা নাকি শবজিক্ষেতের কাছাকাছি একেবারে বেড়ার ধারে এসে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে 'হুররে' বলে! এদিকে বেড়ার এপাশে তো তখন সব ফাঁকা। হাসতে হাসতে গাঁযের লোকদের তখন পেট ফেটে যায় আর কি! যাই হোক, জার্মানরা শেষ পর্যন্ত ঝুকভকা দখল করল বটে, কিন্তু না পেল বিপ্লবী কমিটির দেখা, না পেল গেবিলাদের। তবু তারা জারি করল সামরিক আইন। দু'দিন বাদে দ্রুজ্‌দভের জঙ্গলে বসেই আমরা খবর পেলাম, জার্মানদের বিবাট একটা গোলাবারুদের কনভয নাকি ঝুকভ্‌কায় ঢুকেছে। আর তখন আমাদের কার্তুজেব দারুণ প্রযোজন। ব্যাপাবটা নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা করে সবাই তৈবি হয়ে পড়লাম। ঠিক হল ঝুকভ্‌কায় অভিযান চালিয়ে এই গোলাবারুদ দখল করতে হবে। প্রায় একশোজন লোক জড়ো হলাম আমরা। তিরিশজনকে পাঠানো হল বড়ো সড়কটায়, আমবা যদি সত্যিই জিতি তাহলে জার্মানরা যাতে চের্নিগভের দিকে পালাতে পথ না পায। বাদবাকি সবাই সার বেঁধে মার্চ করে চলল ঝুকভ্‌কার দিকে। বিকেল হলে গাঁয়ের কাছাকাছি এসে রাইক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আমরা গুঁড়ি মেরে চলতে শুরু করলাম। সাতজন লোককে পাঠিয়ে দিলাম পথ-ঘাট তদারক করে ফিরে এসে খবর দেবার জন্য, যাতে রাত হলেই হঠাৎ আক্রমণ শুবু কবা যায। ইঁদুরের মতো চুপচাপ পড়ে রইলাম সেখানে, ধূমপান পর্যন্ত বারণ। টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছিল.....সকলেরই চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু... তার ওপর আবার বিশ্রী স্যাঁত-সেঁতে।...ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা অপেক্ষাই কবছি, এদিকে আকাশ তখন ফর্সা হতে শুরু করেছে। কোনো সাড়াশব্দ নেই কারুর। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। দেখলাম গাঁয়ের মেয়েরা গরুভেড়া তাড়িয়ে নিযে যাচ্ছে মাঠে। এমন সময় গুঁড়ি মেরে ফিরে এল আমাদের সেই সাতজন স্কাউট—বেচারী ছেলেগুলো!... ব্যাপার হয়েছে কি, ওরা সবাই গাঁয়ের মিল-ঘরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য শুয়ে পড়েছিল, তারপরেই দে ঘুম। হতচ্ছাড়াগুলো সারারাত পড়ে ঘুমোলো, তারপর গাঁয়ের মেয়েরা গরু চরাতে চরাতে ওইখানে এসে দেখে সাতজন ঘুমোচ্ছে।

ওর কাহিনী দাশার মনটাকে নাড়া দেয়। কাহিনীর পেছনে যে সত্যটা রয়েছে তাকে তো অস্বীকার করা চলে না। কামরার আর-আর যাত্রীও অনুভব করে সেটা, হতবাক হয়ে তাই শোনে ওর কথা।

দিনের শেষার্ধটুকু, এবং লম্বা রাতটাও অবশেষে কেটে যেতে থাকে। আসনের নিচে পা গুটিয়ে দাশা চোখ বন্ধ করে বসে আছে; ভাবতে ভাবতে ওর মাথা যন্ত্রণায় দপ্‌দপ্‌ করে, ভাবনার এমন একটা প্রান্ত-সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে যে হন্যে হয়ে ওঠার জোগাড়। দুটো সত্য এখানে দেখতে পাচ্ছে সে : একটা সত্য হল ঐ একচোখ-কাণা লোকটির, ফৌজের ঐ সৈনিক আর সাদাসিধে ক্লান্ত মুখওয়ালা ঐ ঘুমন্ত নারী দুটির সত্য; আর অন্যটি হল সেই সত্য যা নিয়ে কুলিচকের অত বাগাড়ম্বর। কিন্তু সত্য তো আর দু' রকম হতে পারে না। এ দুয়ের মধ্যে একটা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, সাংঘাতিক রকম ভ্রান্ত......

দুপুর বেলায় ট্রেন মস্কো এসে পৌঁছোয়। পুরনো একটা ইজ্‌ভজ্‌চিক্‌ গাড়িতে চাপে দাশা। ঝ্যাঁকর-ঝ্যাঁকর করে গাড়িটা মিয়াস্‌নিৎস্কায়া স্ট্রীট ধরে চলে। রাস্তাটা এখন যেমন নোংরা তেমনি জরাজীর্ণ, শূন্য দোকানঘরগুলোর জানলায় কাদার ছিটে। শহরের এই লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা দেখে দাশা হতভম্ব হয়ে যায়—ওর মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা যখন পতাকা হাতে গান গেয়ে গেয়ে অসংখ্য মানুষের ভিড় বরফ-ঢাকা রাস্তাগুলোয় টহল দিয়ে বেড়াতো, রক্তপাতহীন বিপ্লবের নামে জয়ধ্বনি তুলে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতো।

লুবিয়ান্‌স্কায়া স্কোয়ারে ধুলোর ঘূর্ণি পাক খেয়ে-খেয়ে যাচ্ছে। কোমব-বন্ধহীন টিউনিক পরে, গলার কাছটায় কলার খুলে দিয়ে দু'জন সৈনিক পায়চারি করছে স্কোয়ারটার মধ্যে। মখমলের জ্যাকেটপরা দুর্বলদেহ একজন লম্বা-মুখো লোক দাশার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলল, এমন-কি ঘোড়ার-গাড়িটার পেছন পেছন দৌড়লও খানিকটা, কিন্তু তারপরেই আর পারল না, দাঁড়িয়ে পড়ল—ধুলোয় চোখ অন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। মেত্রোপোল হোটেলটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কামানের গোলায় গোলায়. এখানেও ধুলোর ঘূর্ণি; জঞ্জাল-ভরা স্কোয়ারটার ঠিক মাঝখানে কোনো অজ্ঞাত লোক কী এক অজ্ঞাত কারণে কেয়ারি করে সাজিয়ে গেছে বর্ণোজ্জ্বল ফুলের শয্যা—দৃশ্যটা যেন একেবারেই খাপছাড়া।

ত্‌ভেরস্কায়া স্ট্রীটটা তবু একটু প্রাণবন্ত মনে হয়—কতগুলো ছোট ছোট দোকান এখনও খোলা রয়েছে সেখানে। মস্কো সোবিয়েতের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শালু-ঢাকা প্রকাণ্ড এক চৌকো কাঠের টুকরো। ঐ জায়গাটায় একসময় ছিল সেনাপতি স্কোবেলেভের স্মৃতিস্তম্ভ। এই পরিবর্তনটার মধ্যে বীভৎস কিছুর সন্ধান পেল দাশা। গাড়ির বুড়ো কোচম্যান চাবুকের বাঁটটা সেদিকে ঘুরিয়ে দেখাল :

"বীর মানুষটিকে ওরা টেনে নামিয়েছে রাস্তায়। এই তো এত বছর মস্কো শহরে গাড়ি চালিয়ে এসেছি, বরাবরই মূর্তিটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি ওখানে। এখনকার গভর্ণমেণ্ট কিন্তু পছন্দ করে না তাকে, বুঝলেন তো। কেমন করে লোকে

সব আসবাবপত্রের অবয়বরেখা, ব্রোঞ্জের পালিশের ওপর এখানে-ওখানে ঠিকরে পড়েছে আলো। কিন্তু এ-ঘরটাতেও কেমন যেন একটা আবহাওয়া—মনে হয় কতোকাল কেউ বাস করেনি এখানে। দাশাকে নিয়ে একটা সোফার ওপর বসালেন মহিলাটি, তারপর পাশে একটা আসন টেনে নিয়ে নিজেও বসলেন। আগন্তুকের দিকে ভীতিপ্রদ দুটো ভাঁটার মতো চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

"বলুন!"—কর্কশ হুকুমের সুর তাঁর গলায়।

দাশা সাবধানে সবকিছু ভেবেচিন্তে নিয়ে কুলিচক যেমন-যেমন বলেছিল হুবহু তার পুনরাবৃত্তি করল। আংটি-পরা সুন্দর হাত দু'খানা শক্ত হাঁটুর ওপর চেপে ধরে ভদ্রমহিলাটি আঙুলগুলো টান-টান করছিলেন যতক্ষণ না গিঁটগুলো মট্‌মট্‌ করে ওঠে।

"পেত্রোগ্রাদে ওরা তাহলে কোনো খবরই রাখে না?" বাধা দিয়ে বললেন তিনি। গম্ভীর গলার স্বর আবেগে কাঁপছে :

"আপনারা জানেন না কর্ণেল সিদরভের বাড়ি কাল রাতে খানাতল্লাশী হয়ে গেছে!.....শহর থেকে আমাদের সরে যাওয়ার পরিকল্পনা আর দু'একটা জমায়েতের তালিকাও ওদের হাতে পড়েছে।....আপনারা বোধহয় এও জানেন না যে আজ ভোরেই ভিলেন্‌কিন গ্রেপ্তার হয়েছে।"

এক ঝটকায় সোফা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি দরজার উপরকার টানা পর্দাটা সরিয়ে দিলেন একপাশে। দাশার দিকে ফিরে বললেন :

"এ দিক দিয়ে আসুন। একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!"

"সংকেত!"

জানলার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন যে ভদ্রলোকটি তার মুখ থেকে ছোট্ট কথাটা বেরিয়ে এল। দাশা কার্ডবোর্ডের ত্রিভুজটা সামনে এগিয়ে দিল। "কে দিয়েছে ওটা?" (দাশা ব্যাখ্যা করতে যায়) "সংক্ষেপে বল!"

বাঁ হাত দিয়ে মুখের ওপর সিল্কের একখানা রুমাল চেপে ধরেছিলেন উনি। কালচে বাদামী মুখখানা ঢাকা পড়েছে রুমালে—মুখের রঙটা হয় স্বাভাবিক আর নয়তো কৃত্রিমভাবে করা হয়েছে ঐ রকম। চোখের কিনারা হলদে, জোলো-জোলো। দাশার দিকে অধীরভাবে তাকাচ্ছেন। বাধা দিয়ে আবার বলে উঠলেন :

"এ-সংগঠনে ঢুকে তোমার যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে সে খেয়াল আছে?"

"আমি একলা মানুষ, ইচ্ছেমতো চলাফেরা করি", বলল দাশা : "সংঘ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্যই। নিকানর য়ুরেভিচই আমাকে কাজটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বেকার হয়ে বসে থাকা তো আর চলে না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কাজে আমি কখ্‌খনো ভয় পাই না, এমন-কি....."

"তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ।....."

"আমাকে যে দেখেছ সে কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলবে না! কাউকে কখখনো ভুলেও বোলো না যে এখানে তুমি এসেছিলে। এখন যাও।"

ৎভেরস্কায়া স্ট্রীটে দাশা হেঁটেই চলে গেল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, খিদেও পেয়েছে খুব। বুলভারের দু'পাশের গাছগুলো, আর কদাচিৎ দু'একজন গম্ভীর-মুখ পথচারী—যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে সবাই। কিন্তু দাশার মনে এখন শান্তি, ওর সেই যন্ত্রণাদায়ক নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। ঘূর্ণি ঝড়ের মতো তাকে এখন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে দুরধিগম্য ঘটনাস্রোত, তাকে পাক খাইয়ে খাইয়ে টেনে নিয়ে চলেছে এক উদ্দাম জীবনের অভিমুখে।

গাছের বাকলার জুতো-পরা দু'জন স্ত্রীলোক হন্ হন্ করে হেঁটে আসছিল ওরই দিকে। পর্দার ওপর ছায়া পড়লে যেমন দেখায় তেমনি আবছা দেখাচ্ছে ওদের মূর্তি। দাশাকে লক্ষ্য করে একজন চাপা গলায় বলল :

"বেহায়া মাগি—সোজা হয়ে দাঁড়াবার মুরোদ নেই, দেখেছিস!"

একটি দীর্ঘাঙ্গী ভদ্রমহিলা পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, উশ্কোখুশকো চুল এলোমেলো জট পাকিয়ে আছে, ফুলো-ফুলো ঠোঁটের দু পাশে করুণ, কষ্টব্যঞ্জক দুটি রেখা। একসময় তাঁর চেহারাটা নিশ্চয় সুশ্রীই ছিল, কিন্তু এখন তাতে দারুণ একটা হতবুদ্ধিতার ছাপ পরিস্ফুট। পরনের লম্বা কালো স্কার্টটায় অন্য রঙের কাপড় দিয়ে এমনভাবে তালিমারা যে সহজেই নজরে পড়ে। একটা লম্বা শালের নিচে একগাদা বই নিয়ে যাচ্ছিলেন, শালের আঁচলটা মাটিতে ছেঁচড়াচ্ছে। নিচু গলায় দাশাকে বললেন :

"রোজানভের লেখা বে-আইনী বইগুলো আর ভ্লাদিমির সলোভিয়ভের পুরো সেটটা রয়েছে, নেবেন নাকি?"

আরো খানিকটা দূরে তিনজন বুড়োকে পার্কের একটা বেঞ্চের ওপর ঝুঁকে বসে থাকতে দেখল দাশা। সামনে দিয়ে যাবার সময় নজরে পড়ল, আসলে বেঞ্চের উপর দু'জন লালফৌজের লোক গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে আছে, দু'হাঁটুর মাঝখানে রাইফেল দুটো রেখে মুখ হাঁ করে তারা গভীর ঘুমে অচেতন; বুড়ো তিনটি ওদের লক্ষ্য করে চাপা গলায় নোংরা গালিগালাজ করছে।

গাছগুলোর ওধারে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শুকনো বাতাস। শুধু একখানা ট্রাম চলেছে রাস্তায়, তার আবার সিঁড়িটা ভেঙে ঝুলে পড়েছে—পাথরকুচি-গুলোর ওপর ঠকর-ঠকর আওয়াজ করছে ভাঙা সিঁড়ি। গাড়ির হাতল ধরে ঝুলছে ধূসর উর্দি-আঁটা সৈন্যের দল, কেউ কেউ আবার পিছনের ব্রেকের ওপর চড়ে বসেছে। পুশ্কিনের ব্রোঞ্জমূর্তিটার মাথায় ফূর্তিতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কতগুলো চড়ুই পাখি—বিপ্লব সম্পর্কে ওদের চরম নিরাসক্তি।

ৎভেরস্কায়া স্ট্রীটে এসে পড়ল দাশা। এক দমক ধুলোর মেঘ উঠেছে ওর ঠিক পেছনেই, ছেঁড়া কাগজের টুকরো উড়িয়ে নিয়ে আসছে ওর দিকে, কাফে বম্-এর দিকেই যেন ঠেলে দিচ্ছে ওকে। ভাবনাচিন্তাহীন পুরনো জীবনের শেষ

দেখে তো চক্ষুস্থির, ওইখানেই পটল তুলেছে দু'জন।.....আমি আবার অ্যানার্কিস্টদের 'কালো বাজ' দলটার মধ্যেও আছি, তা জানেন তো দারিয়া দেবী।..... আমরা আপনাকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনব দেখবেন 'খন।.....নিমরাজি হয়ে লাভ নেই, আনবই আমরা আপনাকে! আমাদের নেতা কে জানেন? স্বনামধন্য মামন্ত্ দাল্স্কি।.....লোকটার সত্যিই প্রতিভা আছে, দ্বিতীয় কীন বলতে পারেন, সত্যিকারের দুঃসাহসী লোক।.....এই হপ্তাখানেক কি হপ্তাদুয়েক যেতে দিন না, সারা মস্কো আমাদের হাতে চলে আসবে।.....একটা নতুন যুগের গোড়াপত্তন হবে! কালো ঝাণ্ডার নিচে মস্কো শহর! কেমন করে বিজয়োৎসবটা করব তা জানেন তো? ঢালাও হুল্লোড়-ফুর্তির হুকুম দিয়ে দেব.....মদের ভাঁটিগুলো খোলা থাকবে একদম, স্কোয়ারে স্কোয়ারে মিলিটারীর বাজনা বাজবে, আর লাখে-লাখে মুখোশ-আঁটা ফুর্তিবাজের দল বেরিয়ে পড়বে রাস্তায়—ওদের মধ্যে আর্ধেকই যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে হল্লার যোগ দেবে তাতে সন্দেহ নেই? আর আতসবাজি দেখাব আমরা লসিনো-অস্ত্রভ্স্কায়ার গোলাবারুদের ডিপো উড়িয়ে দিয়ে। সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনার নজীর হয়ে থাকবে।"

এ-ক'দিনে যে-সব রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে দাশার পরিচয় ঘটেছে এ হল তার তৃতীয়। এবার সে নেহাৎই ভয় পেয়ে গেছে। এমন-কি খিদে পর্যন্ত মাথায় চড়ে গেছে ওর। সত্যি-সত্যি দাশার মনে দাগ কাটতে পেরেছে দেখে ঝিরভ বেজায় খুশি হয়ে উঠল, আরও বিশদভাবে বলতে শুরু করল এবার।

"একালের শহরগুলোর অসভ্যতা দেখে আপনার রক্ত গরম হয়ে ওঠে না? আমার বন্ধু ভালেৎ, সেই যে সেই প্রতিভাধর আর্টিস্ট্টি—ওর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই?—ও একটা ছক কষেছে—শহরের চেহারা যাতে পুরোপুরি পাল্টে দেয়া যায় তারই নক্শা।. . উৎসবের সেই দিনটার আগে অবশ্য সবকিছু ভেঙে আবার নতুন করে গড়ার সময় পাওয়া যাবে না। . তবে কয়েকটা বাড়ি তো উড়িয়ে দিতেই হবে—এই যেমন ধরুন, ঐতিহাসিক যাদুঘর, ক্রেমলিন, সুখারেভ টাওয়ার, পেৎসভ প্রাসাদ। আমাদের ইচ্ছে রাস্তার দু'পাশ দিয়ে বাড়ি-সমান উঁচু করে তক্তা বসিয়ে দেব—ওগুলোর ওপর আঁকা থাকবে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সব স্থাপত্যের নিদর্শন। . গাছগুলোর ওপর রঙের পিচকারি ছেড়ে দেব—পাতাটাতাগুলোর স্বাভাবিক রং তো আর আমরা থাকতে দিতে পারি না!...ভাবুন না কেন, প্রেচিস্তেন্স্কি বুলভারের দু'পাশে কালো-কালো লাইম গাছ, আর ৎভেরস্কয় বুলভারেরগুলো সব বীভৎস বেগুনি! কি রকম ভয়াবহ দেখাবে! পুশকিনের মূর্তিটাকে সর্বজনীনভাবে প্রকাশ্যে কলুষিত করারও একটা মতলব এঁটেছি আমরা।.... তেলেগিনের ফ্ল্যাটে সেই 'মহান পাষণ্ডাচার' আর 'ঐতিহ্য-বিরোধী সংগ্রামের' কথা মনে আছে আপনার? লোকে তখন আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করত!"

অতীতের কথা বলতে বলতে ঝিরভ উচ্ছ্বসিত হয়ে হি-হি করে হাসছিল, দাশার কাছে সরে এসে হাত নাড়ার ছলে মাঝে মাঝেই ওর প্রায়-দুর্লক্ষ্য স্তনরেখা ছুঁয়ে দিচ্ছিল।.....

যেন হাসি দিয়ে আড়াল করে রেখেছে সে। ওর ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁত-কটা বেরিয়ে পড়েছে একদম।

দাশার সামনে কালো রুটি, সসেজ আর বাদামি রংয়ের কী একটা পানীয় এনে রাখল ঝিরভ।

"আজ রাতের ব্যাপারটা তা হলে?....."

"ক্ষতি কী?" —বিষণ্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে সসেজের একটা টুকরো কামড়ে নিয়ে জবাব দিল দাশা।

রাস্তার ওপরে হোটেল লুক্স-এ ঝিরভের কামরাটা। সেখানে আসবার জন্য অনুরোধ জানালো সে দাশাকে।

"ইচ্ছে করলে আপনি ঘুমিয়ে স্নান-টান করে নিতে পারেন—আমি এই গোটা দশেক নাগাদ এসে আপনার খোঁজ নেব।"

দাশাকে নিয়ে যদিও সে অনেক ঘুরল, হৈ-চৈও করল, কিন্তু তবু যেন দাশার সম্পর্কে কেমন একটা সশ্রদ্ধ ভয় রয়ে গেছে ওর মনে। ঝিরভের ঘরটায় ব্রকেডের পর্দা, গোলাপী কার্পেটও আছে। কিন্তু বিছানোটা দেখলে এমন একটা অনাস্থার ভাব আসে যে সে নিজে থেকেই দাশাকে বলে, এর চেয়ে বরং সোফার ওপর ঘুমোলে ভাল। সোফা থেকে বই-পত্র, পাণ্ডুলিপি, খবরের কাগজ ইত্যাদি হটিয়ে দিয়ে সে একটা চাদর পাতে, কালো ফারের একটা খণ্ডও বিছিয়ে দেয়—বোঝা যায় একসময় ওটা দামী কোটের লাইনিং ছিল। তারপর সে হি-হি করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। জুতোজোড়া খুলে ফেলে দাশা। ওর পা, পিঠ, সারা শরীরটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে। মোটা ফারটার নিচে নাক গুঁজে শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে সে—সুগন্ধী আর ন্যাপথলিনের সুবাস ভেদ করে ওটার মধ্যে থেকে জানোয়ারের গায়ের মৃদু একটা গন্ধ আসতে থাকে। ঝিরভ এসে কোন্‌সময় ওর উপর ঝুঁকে পড়ে দেখে গেছে ওকে, দাশা তা টেরও পায়নি। শুনতে পায়নি—রোমান ছাঁচের চেহারা, লম্বা-চওড়া দাড়ি-কামানো একটি লোক কখন এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে মোটা ভারি গলায় বলে গেছে : 'বেশ, ওকে তাহলে নিয়ে যেও সেখানে—একটা চিরকুট পাঠিয়ে দেব 'খন।'

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে দাশা যখন জাগলো, সন্ধ্যে হয়ে গেছে ততক্ষণে। উল্টোদিকের বাড়িটার ছাদের ওপাশে একটা হলদে চাঁদ উঠেছে, শার্সির উঁচু-নিচু কাঁচের ওপর তারই ভাঙা-ভাঙা প্রতিবিম্ব। দরজার নিচে ইলেকট্রিক বাল্‌বের একখণ্ড আলো এসে পড়েছে। এতক্ষণে দাশার খেয়াল হল কোথায় রয়েছে ও। তাড়াতাড়ি মোজা-জোড়া এঁটে নিয়ে, চুল আর পোশাকটা গুছিয়ে জলাধারটার দিকে এগিয়ে গেল ও। তোয়ালেটা এমন নোংরা যে ভিজে হাতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল হাতটা মুছবে কি না, তারপর স্কার্টের ভেতর দিকের আঁচলাটা উল্টে নিয়ে সে তাতেই হাত দুটো মুছল।

নোংরামি দেখে ওর গা যেন ঘিন-ঘিন করছিল। মনে হচ্ছিল একবার যদি ওর নিজের বাসায় ফিরে যেতে পারতো, পরিষ্কার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একবারটি

জানলার পাশে বসে যখন ও রৌদ্রতাপ-বঞ্চিত লিলিফুলের মতো প্রায় নুয়ে ঝরে পড়ছিল সে সময় ওর স্থির ধারণা ছিল, এই বুঝি সব শেষ, আশা-আকাঙ্ক্ষার বুঝি কিছুই রইল না।—এমনি ধরনের ঐশ্বর্যের কোনো মোহ তখন হয়তো তাকে প্রলুব্ধই করতে পারত না। এখন মনে হচ্ছে ওর আশে-পাশের সবকিছুর মধ্যে যেন জীবনের সাড়া জেগেছে, ওর নিজের অন্তরের যতো কিছু একসময় মনে হয়েছিল স্থবির, মৃত, এখন তা সবই যেন গতিচঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওর এখন এক এক অদ্ভুত মনের অবস্থা, সব কামনা-বাসনা আর অঙ্কুরিত আশা যেন ধেয়ে চলেছে অনাগত দিনের কম্পিত কুহেলি লক্ষ্য করে; আর বর্তমান ওকে ঘিরে পড়ে আছে ভগ্ন অট্টালিকার মতো ধ্বংসস্তূপ হয়ে।

ও যেন নিজের গলাও চিনতে পারে না, অবাক লাগে ওর নিজের আচরণ দেখে, নিজের প্রত্যুত্তর শুনে। আশেপাশের এই উদ্ভট পরিবেশটাকে ও যে কেমন নির্বিকারচিত্তে মেনে নিয়েছে সেইটেই ওর পরম বিস্ময়। মনের সংগোপনে এতদিন যে সহজাত বাসনাটা সুপ্ত ছিল আজ তা জেগে উঠেছে, ওর কানে-কানে বলছে, পাল তুলে দিয়ে ভেসে পড়ার এই তো সময়, অপ্রয়োজনের যত বোঝা সব ফেলে দাও সমুদ্রের গর্ভে।

কালো সেব্‌ল্‌-লোমের একটা কোটের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল দাশা :

"আমাকে ওই জিনিসটা দেবেন?"

ঝিরভ কম্যাণ্ডাণ্টের দিকে তাকাতে লোকটা শুধু একবার গাল ফোলায়। ঝিরভও কোটটা নামিয়ে নিজের কাঁধে ফেলে। দাশা একটা মস্তোবড় খোলা ট্রাঙ্কের ওপর ঝুঁকে পড়েছে—অন্যের পোশাক পরতে হবে ভেবে মুহূর্তের জন্য ওর গাটা ঘিন-ঘিন করে ওঠে—তারপরেই হাতটা ও কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয় এক গাদা অন্তর্বাসের মধ্যে।

"জুতো নেবেন না দারিয়া দেবী? বর্ষা বাদলার দিনে একজোড়া বুট সঙ্গে রাখা ভাল। বল-নাচের পোশাক পাবেন ঐ বড় ঘরটায়। কমরেড কম্যাণ্ডাণ্ট, চাবিটা পাব ও ঘরের? বোঝেনই তো, অভিনেত্রীদের কারবারের আসল পুঁজিই হল বল-নাচের পোশাক।"

"যা দরকার লাগে নিয়ে নিন—আমার তাতে কী আসে যায়।" বলল কম্যাণ্ডাণ্ট।

দাশা দোতলার ঘরে উঠে যায়। ওর প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই আসে ঝিরভ, কাপড়ের বোঝা নিয়ে। একটা ছোট ঘরে ঢোকে ওরা। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে-যাওয়া একটা আয়না রয়েছে ভেতরে। ময়লা কাঁচের গায়ে জালের মতো অগুনতি ফাটলের দাগের মধ্যে উঁকি দিয়ে দাশা দেখতে পায় অন্য এক নারীকে—সিল্কের মোজা আঁটছে পায়ে। সূক্ষ্মতম কাপড়ের একটা শেমিজ পরে নিচ্ছে, ওপরে চড়াচ্ছে লেস্‌-লাগানো অধোবাস, জুতোর ডগা দিয়ে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে তার পুরনো রিফু-সেলাই-করা অন্তর্বাসগুলো। তারপর নিবাবরণ তনু কাঁধদুটোর উপর চাপিয়ে নিচ্ছে ফারের কোটটা।... নিজেকে এখন কী মনে হচ্ছে তোমার?

একজোড়া ভাঁরি সোনার রিমওয়ালা চশমা তাঁর চোখে। কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে করতে তিনি দোহারদের সঙ্গে গলা মিলাচ্ছিলেন। আংরাখার ঢিলে হাতাদুটো দুলছিল দুপাশে। ওঁর ভরা আর দরাজ মোটা গলার আওয়াজে টেবিলের উপকার গেলাসগুলো অবধি ঝন্‌ঝন করে উঠছে। খাস কামরার দেয়ালগুলো টকটকে লাল সিল্কে ঢাকা, দরজায় ব্রকেড পর্দা ঝুলছে। দরজার ঠিক সামনেই তিন-ভাঁজওয়ালা একটা স্ক্রীন খাড়া করা।

স্ক্রীনটার ওপর কনুই রেখে দাঁড়িয়েছিল মামন্ত্‌ দাল্‌স্কি। ওর হাতে এক-জোড়া তাস। আধা-মিলিটারী ধরনের উর্দি পরেছে—নরফোক জ্যাকেট, পেছনে চামড়ালাগানো ডোরা-কাটা ব্রিচেস্‌, কালো ঘোড়সওয়ারী বুট। দাশা যখন ঘরে ঢুকছে সে তখন একটা কঠিন ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে শুনছিল অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীতের বিলাপ।

"চমৎকার দেখতে তো মেয়েটি—একবারে পাগ্‌লা করে দিতে পারে দেখছি!" —পিয়ানোবাদক বলল। দাশা ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দাল্‌স্কি ছাড়া আর সবাই মুখ ফিরিয়ে দেখল ওর দিকে।

"খাঁটি রুশ সুন্দরী।"—বললেন পাদ্রী সাহেব।

"এসো, আমাদের সঙ্গে বস না এসে।"—প্রধান অভিনেতা ভদ্রলোকটি বললেন মিহি গলায়।

"বসুন না, বসে পড়ুন।"—ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল ঝিরভ।

টেবিলের পাশে বসল দাশা। ওঁরা সবাই ভিড় করে ওকে ঘিরে দাঁড়ালেন। তারপর একে-একে ওর হাতে চুম্বন করে সশ্রদ্ধভাবে মাথা নিচু করে এমনভাবে পিছনে সরে আসতে লাগলেন—যেন স্বয়ং মেরী স্টুয়ার্ট এসেছেন ওঁদের সামনে। তারপর আবার শুরু হল গান। দাশার সামনে মাছের ডিম আর চাটনি এগিয়ে দিল ঝিরভ, কী একটা ঝাঁঝ-মিষ্টি পানীয়ও খাইয়ে দিল ওকে। ঘরের মধ্যেটা বড্ড গুমোট, ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। চট্‌চটে আঠালো সেই পানীয়টা গলাধঃকরণ করার পরেই দাশা কাঁধ থেকে ফার কোটটা সরিয়ে দিল, অনাবৃত বাহুদুটো রাখল টেবিলের ওপর। পিয়ানোর বিষাদগম্ভীর ঝঙ্কার আর স্তোত্রসঙ্গীতের সুপ্রাচীন শব্দচ্ছন্দ ওর মনটাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিচ্ছে। মামন্তের ওপর থেকে ও কিছুতেই চোখ সরাতে পারে না। মানুষটির সম্পর্কে সবকিছুই ও শুনেছে ঝিরভের মুখে। এখনও সে দল থেকে আলাদা হয়ে স্ক্রীনটার কাছেই দাঁড়িয়ে। ভয়ংকর চটা মেজ্‌জে আছে, না, মদে চুর হয়ে আছে তা বলা অবশ্য খুবই দুষ্কর।

"কী হল মশাইরা?" গম্‌গমে গলায় ঘরটা কাঁপিয়ে বলে উঠলো দাল্‌স্কি : "কারুর কি খেয়াল মন-টন নেই?"

"তোমার সঙ্গে এখন খেলার গরজ নেই কারুর, আমরা সবাই একটু আনন্দ করছি। তুমি এখন মুখটি বুজে ঠাণ্ডা হয়ে থাক তো।" চ্যাপটা-মুখো ভদ্রলোকটি চড়া গলায় তাড়াতাড়ি বললেন। "এসো ইয়াশা—সাত নম্বরের স্তোত্রটা শুরু করা যাক্‌!"

ঢুকল একজন তাতার খানসামা। হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে সে জানালো—এক বোতল মালও নেই, সবটুকু সাবাড়, চোরা কুঠরির দরজায় তালা পড়েছে, হোটেলের ম্যানেজার সাহেব পলাতক।.....

"বেরিয়ে যাও!" বললো মামন্ত্। টেলিফোনটার কাছে এমনভাবে এগিয়ে গেল যেন বিরাট এক দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি এসে স্পর্শ করছে তাঁকে। টেলিফোনে একটা নম্বর চেয়ে কথা বলতে শুরু করল : "হ্যাঁ.....আমিই...দাল্স্কি বলছি।... পুরো খবরটা চাই। মেত্রোপোল। আমি এখানেই আছি...খুব জরুরি।...হ্যাঁ... চারজন লোক হলেই যথেষ্ট।"

আস্তে আস্তে রিসিভারটা রেখে দেয়ালে সম্পূর্ণ শরীর হেলান দিয়ে হাত-দুটো ভাঁজ করে দাঁড়ালো মামন্ত্। সিকি ঘণ্টা এইভাবেই কেটে গেল। ইয়াশা মৃদু সুরে 'স্ক্রিয়াবিন' বাজাচ্ছে। আওয়াজটা দাশার এত পরিচিত, অতীতের স্মৃতি এমনভাবে জাগিয়ে তোলে মনে, যে শুনে দাশার মাথাটা যেন ঘুরতে থাকে। উধাও হয়ে যায় সময়ের ঠিক-ঠিকানা। ওর বুকের ওপরের রুপোলি ব্রকেডটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠা-নামা করে, কানের কাছে শিরায় শিরায় রক্তের দাপাদাপি শুরু হয়। ঝিরভ ওর কানে-কানে ফিস্ফিস্ করে কী যেন বলছিল, কিন্তু ওর কানেই ঢোকে না সে সব কথা।

মুক্তির আনন্দ-আস্বাদ আর যৌবনের উচ্ছল অনুভূতিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে দাশা। ওর মনে হয় আকাশে উড়ছে ও—বাচ্চা খুকীর পেরাম্বুলেটর-গাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে খেলনার বেলুন যেমন আকাশে ওড়ে, তেমনি অনেক, অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে ও, এত উঁচু যে মাথা ঘুরে যায়.....

থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা সেই ভদ্রলোকটি ওর নিরাবরণ হাতের ওপর আস্তে চাপড় দিয়ে গম্গমে মোলায়েম গলায় বললেন :

"অমন করে ওর দিকে তাকিও না গো, চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।.....সত্যি সত্যিই শয়তানের মতো কিছু একটা আছে ঐ মামন্ত্ লোকটার মধ্যে।..."

ভাঁজ-করা দরজাটা হঠাৎ খুলে যায়। টুপি-পরা চারটে মাথা উঁকি দেয় : স্ক্রীনটার ওপর দিয়ে চারটে হাত বেরিয়ে আসে চামড়ার আস্তিনের ফাঁক দিয়ে, শক্ত করে হাতবোমা ধরে রেখেছে সে হাতগুলো। চারজন অ্যানার্কিস্টই চিৎকার করে হুমকি দেয় :

"খবরদার নড়বে না! হাত তোলো!"

"ছেড়ে দাও! সব ঠিক আছে", গুরুগম্ভীর অবিচল কণ্ঠে বলে মামন্ত্ দাল্স্কি। "ধন্যবাদ, কমরেডরা!" ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্ক্রীনের উপর ঝুঁকে চাপা গলায় ফিস্ফিস্ করে কী যেন বোঝাল ওদের। টুপিগুলো সামনের দিকে ঝুঁকল একবার, তারপর সবাই বেরিয়ে চলে গেল। মিনিট কয়েক বাদেই অনেক-গুলো গলার আওয়াজ ভেসে এল, কে একজন চাপাগলায় আর্তনাদ করে উঠল যেন। ধপ্ করে একটা ভোঁতা গোছের বিস্ফোরণের আওয়াজ হতেই দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল থর্থর্ করে।

মুখ-ভ্যাংচানি হল ওথেলো।.....আর রোমিও জুলিয়েট.....আমি জানি,—তোমার মনের গোপনে যে অমন একটি প্রেমের স্বপ্ন রয়েছে সে আমার ভাল করেই জানা।... কিন্তু এসব তো সেই বস্তাপচা রাবিশ।.....আমরা যে সব ভেঙে গুঁড়ো করে দিচ্ছি, আগাসে গোড়া। সব কেতাবপত্র পুড়িয়ে শেষ করব, যাদুঘরগুলো ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমরা।.....মানুষকে ভুলতে হবে অতীতের ঐতিহ্য।.....মুক্তি বলতে শুধু একটা জিনিসই বোঝায় : স্বর্গীয় অরাজকতন্ত্র.....ইন্দ্রিয়াবেগের সর্বগ্রাসী দাবদাহ।.....না, না! আমার কাছে শান্তি আর ভালোবাসা আশা কোরো না তুমি। আমি তোমায় মুক্তি এনে দেব.....তোমার অজানার বাঁধন আমি আঘাতে আঘাতে ছিন্ন করে দেব।.....তোমার দুই আলিঙ্গনের মাঝে আমি তোমায় উজাড় করে দেব তোমার যা-কিছু কামনার ধন।.....চাও.....এখনই চেয়ে নাও যা চাইবার.. ..কাল হয়তো খুব দেরি হয়ে যাবে।"

উন্মত্ত কণ্ঠের এই আকৃতির আড়ালে দাশা তার সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে টগবগ করে ফুটে-ওঠা এক তপ্ত আবেগের সান্নিধ্য। দারুণ ভয়ে ও বিহ্বল হয়ে যায়, যেন বুকচাপা স্বপ্নের মধ্যে নড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ও, একটা আগুন চোখো দৈত্য যেন স্বপ্নের অন্ধকার কন্দর থেকে বেরিয়ে আসছে ওকে নিচে ফেলে, দু'পায়ে দলে, পিষে ওর প্রাণটা বের করে নেবার জন্য।.....কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক হল আরেকটি অনুভূতি : ওর মধ্যেও যেন এই সঙ্গে সাড়া দিয়ে জেগে উঠছে অজানা, জ্বালা-ধরানো, শ্বাসরোধী এক কামনার হলাহল।.....দাশার মনে হল ও যেন আজ পূর্ণাবয়ব নারী। উত্তেজনার বিহ্বলতায় ওকে নিশ্চয় সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাই প্রধান অভিনেতা ভদ্রলোকটিও ওর দিকে হাত বাড়িয়ে ওর গেলাসের সঙ্গে নিজের গেলাসটা ঠুকে ঈর্ষাভরা গলায় বললেন :

"মামন্ত্, তুমি এই কচি মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছ!"

দাল্স্কি এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যেন কেউ তাকে গুলি করেছে। টেবিলের উপর সজোরে ঘুষি মারল সে, গেলাসগুলো শূন্যে নেচে উঠে মেজেতে পড়ে গেল।

"এই মেয়ের দিকে যে হাত বাড়াবে তার আর রক্ষে থাকবে না, গুলি করেই আমি তাকে সাবাড় করব!"

টেলিফোনটা যে টেবিলের ওপর ছিল তার ওপর যেন ছিটকে পড়ল মামন্ত্ রিভলবারটা তখনও সেখানেই পড়ে আছে। অন্যরা সবাই চেয়ার টেয়ার ফেলে লাফিয়ে উঠল। প্রকাণ্ড পিয়ানোর নিচে আশ্রয় নিল ইয়াশা। এর মধ্যে রিভলবারটা তুলে নিয়েছে মামন্ত্। দাশাও জানে না কীভাবে কখন সে মামন্তের হাতটা চেপে ধরে তার মুখের দিকে মিনতিভরা চোখে তাকিয়ে আছে। দাশার পিঠের হাড়টার নিচে হাত দিয়ে ওর সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরে মামন্ত্ ওকে শূন্যে তুলে নিল। তারপর ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে এমন জোরে পিষতে লাগল যে দাশার দাঁতে ওর দাঁত ঠেকে গেল। চাপা গলায় একটা আওয়াজ করে উঠল দাশা। ঠিক সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। দাশাকে একটা আরামকেদারার ওপর নামিয়ে দিয়ে মামন্ত্ রিসিভারটা ধরল। দু'হাতে চোখ ঢেকে বসে রইল দাশা।

গুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল দাশা। কাছাকাছি কেউ নেই, নির্মেঘ আকাশের গায়ে সারি সারি চিমনি নিঃশব্দে ধোঁয়া ছাড়ছে।

ঝুল-কালিমাখা একটা দরজার দিকে আঙুল দেখালো একজন। ভিতরে ঢুকে দাশা দেখে লম্বা হল-ঘর, দেয়ালের ইটগুলোর উপর আস্তরের বালাই নেই। কাঁচের ছাদটা ধোঁয়ার কালো, তারই ফাঁক দিয়ে আসছে একটুখানি ক্ষীণ আলো। সবকিছুই নগ্ন আর নিরাবরণ। মাথার ওপরের কপিকলগুলো থেকে শিকল ঝুলছে। আরেকটু নিচে মেশিনের চাকার দাঁড়গুলো, পুলির ওপর তাদের ড্রাইভিং বেল্ট নিশ্চল হয়ে আছে। দাশার অনভ্যস্ত চোখ দুটো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকে কালো কালো লেদ-মেশিনগুলো; পালিশ-করার মেশিন, চাপ-দেয়া আর জোড়া-লাগাবার মেশিন, ফ্রিকশন কব্জার লোহার ডিস্কগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে নানা ভঙ্গিতে—কোনোটা মাটিতে বসা, কোনোটা টিংটিঙে লম্বা, কোনোটা আবার পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। বিরাট একটা স্টীম হাতুড়ির ছায়ারেখাও দাশার নজরে পড়ল, প্রকাণ্ড একটা খিলানের আবছা অন্ধকারে সেটা মাথা ঝুলিয়ে পড়ে আছে।

কারখানার অন্ধকার দেয়ালের বাইরে যে জীবন, তার সবটুকু উত্তাপ, আলো আর গতিচাঞ্চল্য, সবটুকু সার্থকতা আর বিলাসিতার উপাদান যোগায় যন্ত্র আর যান্ত্রিক কৃৎকৌশল। আর সেই যন্ত্রেরই সৃষ্টি হয় এই কারখানাটিতে। উকো-ঘষা লোহার গুঁড়ো, মেশিন তেল, মাটি আর গিরস্তি তামাকের গন্ধে চারিদিক ভরপুর। একটা কাঠের মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য নরনারী, অনেকে আবার জায়গা করে নিয়েছে মেশিনগুলোর সাইডপ্লেটের ওপর কিংবা উঁচু জানলার চৌকাঠের ওপর।

দাশা ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যায় মঞ্চের কাছে। ঢ্যাঙা একটি ছোকরা মাথা ঘুরিয়ে আকর্ণ দাঁত বের করে হাসে, ঝুলকালিমাখা মুখের মধ্যে তার দাঁতগুলোকে আরও বেশি সাদা দেখায়; একটা বেঞ্চির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। দাশা তার পাশে উঠে এসে জানলার নিচের লেদ মেশিনটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়েক হাজার লোকের বিশাল ভিড়ের মধ্যে মুখগুলোকে দেখায় বিষণ্ণ, ভুরু কুঁচকে ঠোঁট এঁটে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। রোজ রাস্তায় আর ট্রামে দাশা এই মুখগুলোই দেখে, এমনি ধরনের ক্লান্ত রুশীয় মুখ, চোখে তাদের অসৌহার্দ্যের বিতৃষ্ণা। যুদ্ধের আগের একটি দিনের কথা দাশার মনে পড়ে। রবিবার দিন পিতার্সবুর্গের এক দ্বীপে ও বেড়াচ্ছিল। ওর সঙ্গী দু'জন ব্যারিস্টার ভদ্রলোক। আলাপ প্রসঙ্গে তাঁরা ঠিক এমনি ধরনের মুখের কথাই বলছিলেন : "প্যারিসের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখুন দারিয়া দ্মিত্রেভ্না—কেমন ফুর্তিবাজ, আর রসিক, আনন্দে যেন উপচে পড়ছে..... আর এখানে! মানুষগুলোর চেহারায় যেন তিরিক্ষি বদমেজাজী ভাব। ওই যে দুটি কারখানার মজুরকে দেখুন, এদিকেই আসছে। ওদের কাছে গিয়ে একবার ঠাট্টা তামাসা করার চেষ্টা করেই দেখুন না? বুঝবে তো না কিছু, উল্টে চটে যাবে। আমাদের এই রুশগুলোর মাথায় কি সহজে কিছু ঢোকে? এমনি মোটা বুদ্ধি সব.....।" সেই বেরসিক মানুষগুলোকেই এখন

সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে দাশা, উত্তেজনায় থমথম করছে ওদের আঁধারমলিন মুখ, দৃঢ়তার ছাপ চোখে মুখে। সেই একই মুখ, কিন্তু এখন যেন অনাহারে তা কালো হয়ে উঠেছে, সেই একই চোখ, অথচ তাতে আগুনের জ্বালা, ধৈর্যচ্যুতির ছাপ।

দাশা ভুলেই গেছে ও কী জন্য এসেছে এখানে। ক্লাস্‌নিয়ে জোরি স্ট্রীটের সেই জানলার ধারের নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের বিনিময়ে যে-জীবনটাকে ও আজ হাতের মুঠোয় পেয়েছে তারই টানে ঝড়ের পাখির মতো দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে ও—জীবনের এই নব-সঞ্চিত আস্বাদের মধ্যে ও নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে শিশুর সারল্যে। ও তো আর সত্যি সত্যিই নির্বোধ নয়, কিন্তু অনেকের মতোই ওকেও আজ নিজের হাল নিজেকেই ধরতে হচ্ছে, অথচ ওর পাথেয় শুধু ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার এই সামান্য পুঁজিটুকু। কিন্তু ও চায় সত্যকে উপলব্ধি করতে—সত্যকে ও জানতে-বুঝতে চায় ব্যক্তি হিসেবে, নারী হিসেবে, মানুষ জাতিরই অন্যতমা হিসেবে।

বিভিন্ন রণাঙ্গনের পরিস্থিতি বর্ণনা করে একজন বক্তা কিছু বললেন। তার বক্তব্যটা অবশ্য তেমন কিছু উৎসাহজনক মনে হল না। খাদ্য অবরোধের প্রাচীর ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে : চেকোস্লোভাকরা সাইবেরিযা থেকে সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, এদিকে আতামান ক্রাস্‌নভ আটকাচ্ছে দন এলাকার খাদ্যশস্য। উক্রেইনীয় পার্টিজান যোদ্ধাদের উপব নির্মম প্রতিশোধ নিচ্ছে জার্মানবা। হস্তক্ষেপকারী বৈদেশিক শক্তিবর্গের নৌবহর ক্রনস্টাড্‌ট্‌ আর আর্খানগেল্‌স্ক্‌-এব দিকে এগিয়ে আসছে। "কিন্তু তবু বিপ্লবের জয় অনিবার্য!"

বাতাসের গায়ে শ্লোগান ছুঁড়ে বক্তা যেন হাতের মুঠি দিযে শূন্যেই তা গেঁথে দিলেন পেরেক ঠোকার মতো। ভারপর ব্রীফ কেস্‌টা তুলে নিযে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। সামান্য হাততালি পড়ল—অবস্থা যেমন ঘোরালো হযে দাঁড়িয়েছে তাতে হাততালি দেবার উৎসাহই বা আসবে কোথা থেকে। শ্রোতাবা মাথা নিচু করে বসে আছে। কুঞ্চিত ভুরুর আড়ালে চোখগুলো একেবারে অদৃশ্য।

চকচকে দাঁতওয়ালা সেই ছেলেটির সঙ্গে দাশার চোখাচোখি হতেই ফূর্তিব ভাব দেখিয়ে ছেলেটি দাঁত বের করে হাসল।

"বড্ডো বিশ্রী দিনকাল যাচ্ছে, বুঝলে গো, ওরা আমাদেব না খাইয়ে মারতে চায়। কী করা যায়?"

"ভয় পেয়েছেন নাকি?" দাশা জিজ্ঞেস করে।

"কে, আমি? ভয়ে বলে বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাবার জোগাড়। তা, তোমাব নামটা কী?"

ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অন্যরা চেঁচিয়ে উঠল : "শ্‌-শ্‌!" "এই, চুপ করো!"

দাশা একবার নজর বুলিয়ে নিল ছেলেটির ওপর। কালো শার্টের বোতাম খোলা, পেশীবহুল বুকখানা দেখা যাচ্ছে। কাঁধটা বৃষের মতো। খুশি খুশি মুখটায় একটা উজ্জ্বল হাসি লেগে আছে। ভিজে কোঁকড়া চুলগুলো মাথায় বসে আছে চ্যাপ্টা হয়ে। ঘাঘু প্রেমিকের মতো গোল-গোল চোখ। সারা গায়ে তেলকালি আর ময়লার ছাপ।

"বেশ ছেলে তো আপনি? দাঁত বের করে অমন হাসছেন কেন?" বললো দাশা।

"অভ্যেস। এইটুকুন বয়েস থেকে মায়ের কোল ছাড়া কিনা। একটা কথা বলি? আমাদের সঙ্গে এস তুমি, কাল বাদ পরশু আমরা ফ্রন্টে চলে যাচ্ছি। আসবে তো? মস্কোয় থাকলে কোথায় তলিয়ে যাবে তার কি ঠিকানা আছে?.....ভাবনা কী, সঙ্গে অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে যাচ্ছি।..... "

প্রচণ্ড হর্ষধ্বনির মধ্যে ওর কথাগুলো ডুবে যায়। একজন নতুন বক্তা এবার মঞ্চে উঠে এসেছেন। ধূসর জ্যাকেট-পরা খাটো মানুষ, ওয়েস্ট্‌কোটে আড়াআড়ি ভাঁজ পড়েছে অনেকগুলো। বড়ো টাক-মাথাটা ঝুঁকে আছে হাতের কাগজগুলোর ওপর। "কমরেড্‌স"—বলতে আরম্ভ করলেন তিনি। দাশা লক্ষ্য করল 'র'-গুলোকে উনি একটু টেনে উচ্চারণ করে., চেহারায় উদ্বিগ্নতার ছাপ, চোখ দুটো কুঁচকে রেখেছেন, চোখে আলো পড়লে যেমন হয়। টেবিলের একপাদা কাগজপত্রের ওপর হাতটা স্থির করে রেখেছেন। যখন উনি বললেন যে ওঁর আজকের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এমন একটি প্রচণ্ড সংকটের কথা যা সারা ইউরোপ এবং বিশেষ করে রাশিয়াকে জর্জরিত করে তুলেছে, এবং সে সংকট হচ্ছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, তখন ধোঁয়ায় কালো ছাদের নিচে সেই তিনহাজার মানুষ যেন দম বন্ধ করে কান পেতে থাকে।

প্রথমে উনি সাধারণ কয়েকটি কথা বলে নেন নিচু গলায়, শ্রোতাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করবার জন্য। টেবিল ছেড়ে কখনো সামনে এগিয়ে আসেন, কখনো পিছিয়ে যান। বিশ্বযুদ্ধের কথা বলেন—সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের দুটো দল পরস্পরের টুঁটি টিপে ধরেছে, যুদ্ধ থামাবার ক্ষমতাও নেই তাদের, ইচ্ছেও নেই। দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে উন্মত্তের মতো মুনাফাখোরী চলছে, সে কথাও তিনি বললেন। ঘোষণা করলেন, একমাত্র সর্বহারার বিপ্লবই পারে যুদ্ধকে চিরতরে খতম করতে। ..

বক্তা ব্যাখ্যা করে বললেন, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়বার দুটো রাস্তা খোলা আছে : একটা হল ফাটকাবাজদের পকেট ফাঁপিয়ে তাদের অবাধ ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ কবে দেয়া, দু' নম্বব হল—বাষ্ট্রের হাতে একচেটিয়া অধিকার। টেবিলের কিনারা থেকে তিন পা সরে এসে তিনি শ্রোতাদের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। ওয়েস্ট-কোটের দু' বগলে দু'হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে রেখেছেন। এই বিশেষ ভঙ্গিটার ফলে তাঁব উঁচু চওড়া কপাল আর প্রকাণ্ড হাত দুটো সুস্পষ্টভাবে নজরে পড়েছে। দাশা দেখল, বক্তার ডান হাতেব তর্জনীতে কালির দাগ লেগে রয়েছে।

"যে-শ্রেণীর সঙ্গে এক হয়ে আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, যে-শ্রেণীর সঙ্গে এক হয়ে আমরা বুর্জোয়াদের উৎপাটিত করেছি, যে-শ্রেণীর সঙ্গে এক হয়ে আমরা বর্তমান সংকটের সমস্ত আঘাতটা সহ্য করে যাচ্ছি, সেই শ্রেণীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা বরাবর লড়েছি, চিরকালই লড়ব। খাদ্যশস্যের ওপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্বের সপক্ষে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবই...।' (কথাগুলো

ত্যাগের জন্য, কারণ এ লড়াই হল সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই, মেহনতী মানুষ ও শোষিতশ্রেণীর চূড়ান্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য লড়াই।....."

কপালের ওপর তাড়াতাড়ি একবার হাতের তালুটা বুলিয়ে নিলেন তিনি।

"মস্কোর কাছাকাছি জেলাগুলোতে, আশেপাশের প্রদেশগুলোতে,—কুরস্ক্, ওরেল, তাম্বোভে, খুব কম করে ধরলেও এখন পর্যন্ত এক লক্ষ পুড উদ্বৃত্ত শস্য মজুত রয়েছে। কমরেডস্, আসুন আমরা সমবেত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবার! সমবেত শক্তি, দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রামে ও শহরে যারা সবচেয়ে বেশি ঘা খেয়েছে তাদের সকলের শক্তি একত্র করেই আমাদের কিছু কাজ হতে পারে। আর সোবিয়েত শাসক-শক্তির তরফ থেকে তাই এই ডাকই আপনাদের কাছে এসেছে : শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করো! তাদের মধ্যে যারা অগ্রণী, সবচেয়ে গরীব অংশটাকে ঐক্যবদ্ধ করো, যাতে 'রুটির জন্য কুলাকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে' এই ধারণা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে....."

হাত দিয়ে ঘন ঘন কপাল মুছতে শুরু করেছেন বক্তা, গলার স্বরে সেই গম্‌গমে ভাবটা অন্তর্হিত হয়েছে। যা বলবার ইচ্ছে তাঁর ছিল, সবই বলা হয়ে গেছে। টেবিল থেকে এক শিট্ কাগজ তুলে নিয়ে সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার, তারপর বাদবাকি কাগজগুলো একজায়গায় জড়ো করলেন।

"তাহলে, কমরেডস্, এই জিনিসগুলো যদি আমরা ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারি এবং সেই অনুসারে কাজ করে যেতে পারি তা হলে জয় আমাদের অনিবার্য।"

তারপর হঠাৎ একটা সরল প্রাণখোলা হাসিতে তাঁর মুখটা ভরে উঠল। সবাই বুঝে নিয়েছে : এ যে আমাদেরই একান্ত আপনার লোক! সকলে মিলে চেঁচায়, হাততালি দেয়, পা দাপায়। মঞ্চ থেকে বক্তা তাড়াতাড়ি নেমে পড়েন, মাথাটা যেন কাঁধদুটোর মধ্যে ঢুকে গেছে। সাদা-দাঁতওয়ালা সেই ছেলেটি দাশার পাশ থেকে বলিষ্ঠ মোটা গলায় চীৎকার করে ওঠে :

"ইলিয়িচ জিন্দাবাদ!"

সবকিছুর মধ্যে থেকে দাশার কাছে কেবল এই কথাটাই পরিষ্কার হয়ে এল যে সে আজ "নতুন কিছু" দেখেছে ও শুনেছে। সভা থেকে ঘরে ফিরে ও বিছানায় বসে রইল, দেয়াল-মোড়া কাগজের নক্‌শাগুলোর দিকে বড়ো-বড়ো চোখে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। বালিশের ওপর ঝিরভের একটা চিরকুট, তাতে লেখা : "মামন্ত্ আপনার সঙ্গে এবারোটার সময় মেত্রোপোলে দেখা করতে চায়।" আর মেঝের ওপর ঠিক দরজার চৌকাঠটার কাছে পড়ে আছে আর একটা চিরকুট, সেটাতে লেখা : "গোগোলের মূর্তির কাছে আজ সন্ধ্যে ছ'টার সময় হাজির থাকবেন।"

প্রথমেই দাশার যা মনে হচ্ছে তা হল, আজকের এই "নতুন কিছু"র মধ্যে আছে একটা সুকঠোর নৈতিকতা, যার ফলে তা মহনীয় হয়ে উঠেছে।...আলোচনাটা হচ্ছিল রুটি নিয়ে। এতদিন দাশা জানত, রুটি কিনতে পাওয়া যায়, কিংবা হয়তো অন্য কিছুর বদলেও পাওয়া যায়—এমন একটা দামে যা সকলেরই জানা : এই

অসহ্য, রাগে গা জ্বলে যায়।.....মানুষকে ঠকাচ্ছে লোকটা, সারা দেশটাকে ধাপ্পার ওপর দিয়ে রেখেছে।.....বস্তুবাদী দৃষ্টি থেকে দেখলে লোকটা হল "মহা ধড়িবাজ উল্কানিদাতা".....আর অন্যভাবে দেখলে.....(দাশার কাছে সরে এসে এক নিঃশ্বাসে ওর কানে কানে বলে)—"এই লোকটিই হল সেই খৃষ্ট-শত্রু এ্যান্টিক্রাইস্ট্! বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে আছে তো? সবকিছু মিলে যাচ্ছে হুবহু। উত্তর যাবে দক্ষিণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। মৃত্যুর লৌহ অশ্বারোহীদলের আবির্ভাব হবে—তার মানে ট্যাঙ্ক।...জলধির উৎসমুখে অশুভ এক তারকার পতন হবে—তার মানে বলশেভিকদের ওই পাঁচ-মুখো তারা।.....আর ইনিও ঠিক খৃষ্টের মতোই বিরাট জনতার সামনে বাণী বিতরণ করছেন, শুধু খৃষ্টের বিপরীত এই যা।...আজ এমনকি আপনার মনও উনি ভোলাতে চেষ্টা করেছেন। তবে আমরাও আপনাকে ছাড়ছি না।...আমি আপনাকে অন্য কাজে বদলি করিয়ে দেব।"

দাশার তৃতীয় প্রশ্নের কোনো জবাব মিলল না। (ঘরে ফিরে ও বিছানায় শুয়ে থাকল, কনুইয়ের কিনারা দিয়ে ঢেকে রাখল চোখ দুটো।) তারপর হঠাৎ এক সময় ও বিরক্ত হয়ে উঠল এত কথা ভাবছে বলে।....."লোকে ভাববে আমি যেন কোন্ একশো-বছরের বুড়ি! অমন কুৎসিত আমি হতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার যেমন খুশি আমি তাই করব।...মেত্রোপোলে যাব না কেন? যদি আমার তাই ভাল লাগে তবে যাব না কেন? যা লুকিয়ে রাখা যায় না তা লুকোবার এই চেষ্টা কেন, বুকের ভেতর থেকে যে আনন্দের ধ্বনি ঠেলে আসছে তাকে চাপা দেবার এই প্রয়াস কেন? যন্ত্রণার বাঁধনে নিজেকে কেন বেঁধে রাখা? কার ঐকান্তিক প্রয়োজনে? বোকা, একেবারেই বোকা আমি, ভীরু! ছেড়ে দাও নিজেকে! দাও গা ভাসিয়ে! কিসের বা কী দাম আছে? চুলোয় যাক ভালোবাসা, চুলোয় যাক আমার সবই....."

দাশা গোড়া থেকেই জানে ও মেত্রোপোলেই যাচ্ছে। ও যদি ইতস্তত করার ভান করে থাকে, তার মানে আর কিছুই নয়—যে-সময় ঠিক করা আছে সে সময় এখনো হয়নি, এখনও বিকেল রয়েছে, আর বিকেল হলেই যতো রাজ্যের চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। বাড়ির মধ্যেই কোথায় যেন একটা ঘড়িতে ন'টা ঘণ্টা বাজল পরপর। আওয়াজটা গম্ভীর, যেন গির্জার টাওয়ার ঘড়ি বাজছে। বিছানা ছেড়ে হুড়মুড় করে লাফিয়ে উঠল দাশা। "এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়লাম কেন, ছি ছি!"

তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে, শেমিজ গায়েই ও ছুটে গেল বাথরুমে। যত রাজ্যের কাঠ, ট্রাঙ্ক, আর আজে বাজে জিনিস রয়েছে সেখানে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল দাশা, পিঠের ওপর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে পড়ার সময় দম বন্ধ করে রইল ও। তারপর ভিজে গায়ে এক ছুটে কামরার মধ্যে ফিরে এসে তোষকের ওপর থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে মুছতে শুরু করল গা। দাঁত দুটো তখন ওর ঠক্ ঠক্ করছে ঠাণ্ডায়।

কিন্তু তবু যেন ও মনটাকে স্থিরই করতে পারছে না। মেঝের ওপর ছেড়ে-রাখা পুরনো পোশাকটা থেকে ওর দৃষ্টি নিতান্ত দুর্বলতার বশেই যেন সরে যায় চেয়ারের ওপর সযত্নে রাখা সান্ধ্য পোশাকটার দিকে। তারপর অবশেষে ও নিজের

॥ নয় ॥

তর্‌গোভায়া রেলস্টেশনের ওপর হামলা করে ভলাণ্টিয়ার বাহিনী শুরু করল তাদের নতুন অভিযান—তথাকথিত "দ্বিতীয় কুবান অভিযান"। এই রেল-জংশনটা দখল করার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণ এর ফলে গোটা উত্তর ককেসাস রাশিয়ার বাকি অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বলা যায়। জুন মাসের দশ তারিখে দেনিকিনের পরিচালনায় পদাতিক আর অশ্বারোহী সমেত নাহাজার সৈন্যের একটা ফৌজী-বাহিনী চারটি সারিতে ভাগ হয়ে এগিয়ে চলল তর্‌গোভায়া স্টেশন ঘিরে ফেলবার জন্য।

দেনিকিন স্বয়ং ছিলেন দ্রজ্‌দ্‌ভস্কির সারিতে। চারদিকে ভয়ানক থম্‌থমে ভাব। সবাই বুঝতে পারছে, যুদ্ধের একেবারে প্রথম দফার লড়াইয়েই বাহিনীর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। দ্রজ্‌দভ্‌স্কির সৈন্যরা তাদের একখানা মাত্র সম্বল কামান সামনে রেখে এলোমেলো গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সবেগে ছুটে চলল এগর্‌লিক্‌ নদীর দিকে—শত্রুর গোলাবর্ষণের মধ্যেই ওরা নদী পার হবে। সারির একেবারে সামনে ছিল ক্যাপ্টেন তুর্‌কুল, রেজিমেণ্টের অধিনায়ক। জলের মধ্যে ঠিক রবারের বলের মতোই সে হাবুডুবু খাচ্ছিল আর চারদিকে জল ছিটিয়ে একধার থেকে গালাগাল ঝাড়ছিল। লাল সৈন্যরা প্রথমে সাংঘাতিক বাধা দিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেহাৎ আনাড়ির মতো নিজেরাই অভিজ্ঞ শত্রুদের সুযোগ করে দিল ঘেরাও করে ফেলার। ওদের ঘাঁটিগুলো সবই উৎখাত হয়ে গেল, দক্ষিণ দিক থেকে এল বরোভ্‌স্কির সৈন্য-সারি আর পূর্বদিক থেকে এরদেলির ঘোড়সওয়ার দল। হতচকিত লাল ইউনিটগুলো তখন তর্‌গোভায়া ছেড়ে তাদের বড়ো-বড়ো মালটানা ট্রেনগুলো নিয়ে উত্তরের দিকে পিছু হটতে শুরু করল। কিন্তু শাব্‌লিয়েভ্‌কা বলে একটা জায়গায় মারকভের সৈন্যদল এসে সে-রাস্তাও বন্ধ করে দিল। ভলাণ্টিয়ারদের এবার চূড়ান্ত জয় হয়ে গেছে। এরদেলির কসাক কোম্পানিগুলো স্তেপের মধ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, যেখানেই পলাতকদের হাতে পাচ্ছে কেটে ফেলছে, বন্দী করছে; দখল করছে মালটানা গাড়ি।

বিকেল হয়ে এল। লড়াইও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করছিলেন দেনিকিন। রাঙা মুখটার ওপর ভ্রূকুটিচিহ্ন, মোটা হাতদুটো পিছনদিকে জোড় করে রেখেছেন। ক্যাডেটরা খুব হাসাহাসি আর ঠাট্টাইয়ার্কি করছে, সাংঘাতিক বিপদের মধ্যেও যখন গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে না তখন লোকে এমনি হাসি তামাসাই করে। বালির বস্তা টেনে এনে খোলা ট্রাকগুলোর ওপর চাপাচ্ছিল ওরা, বাদবাকি সবাই তাড়াতাড়ি-করে-সাজানো সাঁজোয়া ট্রেনের ওপর মেশিনগান তুলছিল। মাঝে মাঝে কামানের আওয়াজে বাতাস থর-থর করে কেঁপে উঠছে—লালবাহিনীর সাঁজোয়া ট্রেন থেকে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে উত্তর দিকে, শাব্‌লিয়েভকার ওধারে। মানিচ নদীর পুলটার কাছে জেনারেল মারকভ যেখানে

আর বেলায়া শ্লিনা। দুটো গ্রামই বলশেভিজমের লালনকেন্দ্র। ওরা রক্ষাব্যূহ তৈরি করছে ক্ষিপ্রগতিতে। তিখোরেৎস্কায়ার আশে পাশে কাল্‌নিনের ফৌজ পুরোদমে লেগে গেছে ঘাঁটি গেড়ে বসতে। সরোকিনের বাহিনী ইতিমধ্যে ভয়ত্রস্ত ভাবটা কাটিয়ে উঠে পশ্চিমদিক থেকে আবার চাপ দিতে শুরু করেছে। যে-সব লাল ইউনিট মানিচ এলাকায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল তাদের আবার জড়ো করা হয়েছে, তারা নতুন করে হামলা শুরু করেছে শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে। অনেকগুলো গ্রাম থেকে আব'র অতিরিক্ত সৈন্য হিসেবে স্বেচ্ছাসেবকও পাঠাচ্ছে।

দেনিকিনের এখন একমাত্র ভরসা শত্রুর সৈন্যচলাচলের মধ্যে সংগতির অভাব। কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে সে-অবস্থাও পাল্‌টে যেতে পারে। সুতরাং তাঁকে তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হচ্ছে সৈন্যদলকে এগিয়ে নিয়ে যাব'র জন্য তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার, কারণ সময়-সময় তারা লড়াইয়ের ময়দানে দারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ছে। পদাতিক সৈন্যদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তাড়াতাড়ি জোড়াতালি দিয়ে খাড়া-করা একটা সাঁজোয়া-ট্রেন ফৌজের আগে-আগে চলেছে।

পেস্‌চানোকপ্‌স্কয়ে গাঁয়ের সমস্ত মানুষ লালফৌজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে। ভলাণ্টিয়ার বাহিনী জন্মে কোনোদিন এমন ভয়ংকর বাধার সম্মুখে পড়েনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কামানের গোলাবৃষ্টির নিচে থরথর করে কাঁপতে লাগল স্তেপের মাটি। বরোভ্‌স্কি আর দ্রজ্‌দভ্‌স্কির রেজিমেণ্ট দুটোকে দু'-দু'বারই গ্রাম থেকে হটিয়ে দিয়েছিল লালফৌজ, কিন্তু যখন ওরা দেখল শত্রু ওদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, অথচ শত্রুর শক্তি আর হাতিয়ারের পরিমাণ আন্দাজ করার কোনো কায়দা নেই, তখন তারা একেবারে শেষ প্রাণীটি অবধি গ্রাম ছেড়ে সরে পড়ল। ইউনিট, ফৌজীদল আর অসংখ্য উদ্বাস্তু এসে ভিড় জমালো বেলায়া শ্লিনা গ্রামটিতে।

দ্‌মিত্রি শেলেস্ত্‌-এর লৌহ ডিভিশনটা এখানেই মোতায়েন ছিল। ওদের সঙ্গে অতিরিক্ত ফৌজ হিসেবে ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের একটা গণফৌজ—দশ হাজার সেপাই সে গণফৌজে। সব রকম বয়েসের লোকই যোগ দিয়েছে। গ্রামের প্রবেশ-পথগুলো শক্ত করে আগলাবার ব্যবস্থা হল; লালবাহিনীর মধ্যে এই প্রথম দেখা গেল সুশৃঙ্খলা, আর পরিস্থিতি সম্পর্কে রণকুশল বিচারবুদ্ধি। সভাসমিতি-গুলোতে শপথ নেয়া হল—হয় জয়লাভ করতে হবে, না হয় মৃত্যু।

কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। যুদ্ধ-নিপুণ শত্রু, তারা বিজ্ঞান আর করণকৌশল দিয়ে মোকাবিলা করে হিম্মত আর বেপরোয়া লড়াইয়ের, সামান্যতম বিষয়ও তারা উপেক্ষা করে না, দাবা-খেলোয়াড়ের মতো প্রত্যেকটা চাল দেয় রীতিমতো ভেবেচিন্তে, আর সব সময়ই কোনো-না-কোনো উপায়ে এসে হাজির হয় শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে। সত্যি কথা, প্রথমটায় শ্বেতরক্ষীদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। দ্রজ্‌দভ্‌স্কির কলামটার পরিচালনাভার ছিল কর্ণেল ঝেব্‌রাকের হাতে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে তার লোকজন নিয়ে সিধে উঠল একটা খামারবাড়িতে, লাল বাহিনীর সম্মুখ-

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমার কথাটা কত খাঁটি...তাই না, কি বল?" (দ্রজ্‌দভ্‌স্কি চুপ করেই রইল।) "আমি যা-যা বললাম সব তোমার অফিসারদের গিয়ে বল, আর এইসব ব্যাপার যাতে না ঘটে তাই দেখ।..."

"বেশ, তাই হবে স্যার!"

দরজাটা দড়াম্‌ করে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল দ্রজ্‌দভ্‌স্কি।

চায়ের গেলাসটার সামনে বসে অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবতে ভাবতে মাথা নাড়তে লাগলেন দেনিকিন। শেষবারের মতো কতগুলো বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠল কোথাও, তারপর সব নিস্তব্ধ, অন্ধকার।

প্রায় চল্লিশ মাইল চওড়া রণাঙ্গনে ফৌজটাকে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা ছিল ওদের, তিখোরেৎস্কায়া দখলের অভিযান সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ। সমস্ত এলাকাটা থেকে তাই শত্রুদের বিচ্ছিন্ন ফৌজীদল আর গেরিলা ইউনিটগুলোকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন ছিল। কাজটার ভার দেয়া হয়েছিল তরুণ সেনাপতি বরোভ্‌স্কির হাতে। দু'দিনের মধ্যে ষাট মাইলেরও বেশি রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে অনেকগুলো গ্রাম দখল করল বরোভ্‌স্কি। প্রায় সারা রাস্তাই লড়াই করতে করতে যেতে হয়েছিল তাকে। গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথম শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্‌ভাগে তথাকথিত আক্রমণ চালানো হল।

ভলান্টিয়ার বাহিনী এবার সমস্ত এলাকাটার ওপর নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যূহ বিস্তার করতে পেরেছে। তিরিশে জুন তারিখে দেনিকিন একটা সংক্ষিপ্ত আদেশ জারি করলেন: "আগামী কাল পয়লা জুলাই তারিখে তিখোরেৎস্কোয়া রেলস্টেশন দখলে আনিতেই হইবে, তের্নভ্‌স্কায়া-তিখোরেৎস্কায়া জেলার শত্রুসৈন্যের সমাবেশ যেমন করিয়া হউক ভাঙিয়া দিতে হইবে।... " রাতের অন্ধকারে অভিযান শুরু করল ওরা, বিরাট একটা সাঁড়াশির আকারে তিখোরেৎস্কায়া ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করল। ছোটখাট কয়েকটা সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর বলশেভিকরা পিছিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগল রক্ষাঘাঁটির মধ্যে।

এখন আর এক-হপ্তা আগের মতো মরিয়া হয়ে রুখতে পারছে না ওরা। বেলায়া গ্লিনার পতনের ফলে ফৌজের মধ্যে হতাশার ভাব এসে গেছে। সরোকিনের অগ্রগতিও রুদ্ধ হয়েছে। রক্তঝরা লড়াইয়ে হাজারে-হাজারে প্রাণ দিয়েছে—কিন্তু এত ক্ষয়ক্ষতি সব বৃথাই। যন্ত্রের মতো নির্ভুল গতিতে এগিয়ে আসছে দুশমনরা। ভলান্টিয়ারদের শক্তি সামর্থ্য ওরা কল্পনায় আরো দশগুণ বাড়িয়ে দেখছে। গুজব, সারা রুশদেশ থেকে নাকি অফিসাররা সব দলে-দলে ছুটে আসছে দেনিকিনের কাছে, ক্যাডেটরা নাকি কাউকেই দয়া দেখাচ্ছে না, যে-মুহূর্তে একেকটা জেলা ওরা খালি করে চলে যাচ্ছে সেই মুহূর্তেই নাকি সেখানে এসে ঢুকছে জার্মানরা। তিখোরেৎস্কায়া স্টেশনে একটা ট্রেনের কামরায় পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিশ্চল হয়ে বসেছিল কাল্‌নিন, তিখোরেৎস্কায়া গ্রুপের অধিনায়ক। যখন সে শুনল দেনিকিনের বগী-

সম্মুখীন যার শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের পারমাপ করা তাঁর সাধ্যাতীত, রীতিমতো অস্ত্রসজ্জিত এক জনসমষ্টি আজ তাঁর সম্মুখে, তাদের শক্তিও অপরিমেয়। এটা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি যে তাঁর নিজের পক্ষে প্রত্যেকটা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের এই ফৌজের মধ্যেও পাল্টা বেড়ে চলেছে ঘৃণা, আরও এককাঠ্ঠা হয়ে উঠছে তারা। যে-যুগে গরম-গরম সভাসমিতি করে নিছক ভোটের জোরেই অবাঞ্ছিত কম্যান্ডারদের সরানো চলত আর ইচ্ছেমতো অভিযান চালানো হত, সে যুগ যে আর নেই সে-হিসেব রাখেননি দেনিকিন। খেয়ালখুশির বদলে এখন ঘরোয়া-লড়াইয়ের উপযোগী এক নতুন শৃঙ্খলাবোধ এসেছে, অবশ্য খুব জোরদার হয়ে ওঠেনি তা, কিন্তু দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে দৃঢ়তর হয়ে।

গতিক দেখলে মনে হয় জয়লাভের পথ পাকা হয়ে গেছে, খুব বেশি দেরিও হবে না। পর্যবেক্ষকরা খবর দিয়েছে, সরোকিনের ফৌজ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কুবানের ওপারে একাতেরিনোদারের দিকে পালাচ্ছে। কিন্তু পুরো সত্যি নয় খবরটা। পর্যবেক্ষকদের হিসেবে ভুল হয়েছে। কুবানের ওপারে যারা হটে যাচ্ছে তারা আসলে পলাতক, ছোট-ছোট ফৌজীদল আর গাড়িভর্তি উদ্বাস্তু। সরোকিনের তিরিশ হাজারের ফৌজ থেকে ফালতু গলগ্রহগুলোকে বিদায় দেয়া হয়েছে, সে-ফৌজ এখন সুশৃঙ্খল দুর্ধর্ষ। জার্মানদের বিরুদ্ধে বাতায়িস্ক রণাঙ্গনের প্রতিরোধ তুলে নেয়া হয়েছে। লালফৌজ এখন দেনিকিনের বাহিনীর সঙ্গে খোলা ময়দানেই মোকাবিলা করার অপেক্ষায় আছে। তারপর যা ঘটল তা এই : জয়ের উন্মাদনায় উল্লসিত ভলান্টিয়ার বাহিনী যখন প্রায় লক্ষ্যের কাছে এসে পৌঁচেছে, এমনি সময় সম্মুখবর্তী সরোকিন ফৌজের সঙ্গে দশদিনের প্রচণ্ড রক্তাক্ত লড়াইয়ে ওদের প্রায় শেষ মানুষটি অবধি খতম হয়ে গেল।

কুবান-কৃষ্ণসাগর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রশ্নের জবাবে নেপোলিয়নের মতো ধৃষ্টতার সঙ্গে জবাব দিলেন সরোকিন : "আমার কোনো আন্দোলনকারী প্রচারকের দরকার নেই। দেনিকিনের ডাকাতদলই আমার হয়ে প্রচার করে দিচ্ছে। প্রতিবিপ্লবীরা যে প্রাচীর তুলেছে, আমার সৈন্যদলের অতুলনীয় মহাবীরত্বের আঘাতেই সে-সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।" দেনিকিনের প্রথম আক্রমণের দিন-গুলোতেই সরোকিন সেনানীদের আতঙ্কের ভাবটা দমন করতে পেরেছেন, যেন একটা মাতলামির ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠেছেন তিনি। দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছেন রণাঙ্গণে, কখনো ট্রেনে, কখনো রেলওয়ে ট্রলিতে, কখনো ঘোড়ার পিঠে চেপে। সৈন্যদের তদারক করছেন; একবার তো ফৌজের চোখের সামনে দু'জন অফিসারকে তিনি নিজের হাতে গুলি করেই মেরে ফেললেন—ওদের মধ্যে নাকি বিপ্লবী উদ্দীপনার অভাব ঘটেছিল। রেকাবে পা রেখে খাড়া হয়ে উঠে গাঁজলা-ওঠা ঠোঁট দুটো বন্যভাবে বিকৃত করে তিনি যখন জনগণের শত্রুদের মুণ্ডপাত করে গালাগালি আরম্ভ করতেন, তখন ওঁর মুখের ওই কদর্য ভাষা শুনে লালফৌজের লোকেরা এমনভাবে খেপে উঠে বক্তৃতার মাঝে-মাঝে সিংহনাদ করত, যেন একদল বুনো

সর্বনাশ, সে ক্ষেত্রেও নিশ্চিত মৃত্যু। তাই সরোকিনের উন্মাদ উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই উনি সান্ত্বনা খুঁজে পান—এ এক উদ্ভট কল্পনাবিলাস বটে, কিন্তু সে আমলের সবকিছুই তো এমনি উদ্ভট। বেলিয়াকভের মতলবটা হল, সমস্ত রকম ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে প্রথমে তো সরোকিনকে ডিক্টেটরের গদীতে বসাও, তারপর দেখা যাবে কী করা যায়!

মনে-মনে যে মতলবই থাক, বেলিয়াকভ কিন্তু চূড়ান্ত রকমের সক্রিয় প্রস্তুতি চালাতে আগলেন আক্রমণের জন্য : রসদ আর ঘোড়ার খাবার জমা করা হল তিমাশেভ্স্কায়া স্টেশনে, কামানের গোলা সাজিয়ে রাখা হল, স্তেপ এলাকায় সরানো হল সারি সারি গাড়ি। তিমাশেভ্স্কায়ার আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে রাখা হল গোটা ফৌজটাকে, ওদের সামনেটা ছিল পূবদক্ষিণ-মুখো—এভাবে ওদের সাজাবার উদ্দেশ্য, করেনভ্স্কায়া আর উত্তরদিকে ভিসেল্কি, এই দুটো জায়গার ওপর একই সঙ্গে আঘাত হানা যাবে।

পনেরই জুলাইয়ের ভোরবেলায় করেনভ্স্কায়ার ওপর লালফৌজের কামান থেকে ঝড়ের মতো গোলাবর্ষণ শুরু হল। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কসাক ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনগুলো লাভাপ্রবাহের মতো ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম আর স্টেশনে। সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলে ওরা তলোয়ারের কোপ বসাতে লাগল ক্যাডেটদের ওপর, ঘোড়ার পায়ের নিচে ফেলে পিষল ওদের, বন্দী করল শুধু তাদেরই যারা লাল সৈন্যদের আসার আগেই রাইফেল ত্যাগ করেছিল। পদাতিক ইউনিটগুলো সারারাত ধরে মার্চ করে চলল। করেনভ্স্কায়া পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ট্রেঞ্চ-ঘাঁটি তৈরি করতে লেগে গেল—এবার আর বেলায়া গ্লিনার মতো অর্ধবৃত্তের আকারে নয়, এবার একেবারে পুরো উপবৃত্তের আকারে ট্রেঞ্চ সাজালো ওরা।

সাদা সূর্য উঠেছে, উষ্ণ ধুলোর মেঘে ঢাকা। সারা স্তেপটাই যেন গতিশীল হয়ে উঠেছে : ঘোড়সওয়ারবাহিনী ছুটে বেড়াচ্ছে, পদাতিক রেজিমেণ্টগুলো গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে, গর-গর করে চাকার আওয়াজ তুলে কামানগুলো গর্জন করছে, গালাগাল, চীৎকার, আঘাত, গুলির আওয়াজ, ঘোড়ার হ্রেষা আর কর্কশ হুকুমের শব্দে বাতাস মথিত হচ্ছে। রসদবাহী যানবাহনের সারি একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো। উষ্ণ চুল্লীর মতো দিনের উত্তাপ। সেনাপতিমণ্ডলীর দল থেকে কেটে পড়ে সরোকিন একাই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সৈন্যদের মধ্যে, তাঁর ঘোড়াটার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে ফেনা, গ্রে-হাউণ্ডের মতো দ্রুতগামী সংবাদবাহক ঘোড়সওয়ার আর পার্শ্বচররা সরোকিনের হুকুম তামিল করবার জন্য সারা রণাঙ্গন চষে বেড়াচ্ছে!

ঘোড়া হাঁকিয়ে চলবার সময় সরোকিনের টুপি খসে পড়েছিল, সিরকাশিয়ান জামাটাও অবশেষে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। কনুইয়ের অনেকটা উপরে লাল সিল্কের শার্টের হাতদুটো গুটিয়ে-রাখা, নীল সওয়ারী-ব্রিচেস্টা শক্ত করে চামড়ার বেল্ট দিয়ে আঁটা। অনেকগুলো জায়গায় যেন একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় সরোকিনকে। ধূলিধূসর মুখখানার মধ্যে তাঁর উন্মুক্ত দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্

বাসেন তৎপরতার ব্যাপক সুযোগের জন্য, যুদ্ধের সংগীত-ব্যঞ্জনা আর বিজয়ের গৌরব-ডঙ্কার জন্য।

জুলাই দিনের কাঠ-ফাটা গরমের ইশারা জানিয়ে প্রকাণ্ড ঢলঢলে সূর্য উঠছিল স্তেপের উঁচু ঢিবিগুলোর আড়াল থেকে। ঝল্‌মলে রোদটা এসে পড়েছে ঠিক বলশেভিকদের চোখের ওপর। মেশিন-গানগুলো খেঁকিয়ে চলেছে খক্‌-খক্‌ করে, লাগাতর তোপের আওয়াজে গুমোট স্তব্ধ আবহাওয়াটা খান্‌ খান্‌ হয়ে যাচ্ছে। বিপক্ষের লোকদের দেখা গেল কাঁধে-কাঁধ লাগিয়ে পরিখা ছেড়ে সার বেঁধে বেরিয়ে পড়তে। মারকভ-ফৌজের সৈনিকরা বুলেট উপেক্ষা করে সামনে ছুটে চলেছে। গুঁড়ি মেরে ওদের মুখোমুখি এসে পড়ল হাজার হাজার ছোট-ছোট মূর্তি। কাজানোভিচ ফিল্ডগ্লাসটা চোখে ধরলেন। অদ্ভুত ব্যাপার তো!

"কমরেডদের জন্য তিন রাউণ্ড শ্রাপনেল দাগো!" টেলিফোন অপারটেরকে চেঁচিয়ে জানালেন কাজানোভিচ। কুয়োর একপাশে জায়গা করে নিয়েছিল লোকটা। ঢিবির আড়ালে লুকোনো দুটো কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হল। শত্রু লাইনের একেবারে মাথা ছুঁয়ে ফাটলো শ্রাপনেল, ছিন্নভিন্ন তুলোর পাঁজার মতো। খুদে-খুদে মূর্তিগুলো প্রথমে বিশৃংখলভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেই তারা দ্রুত-বেগে সারিবদ্ধ হয়ে গেল, এগোতে শুরু করল আবার। সারা রণাঙ্গনটাই তখন গুলিগোলার শব্দে কেঁপে উঠছে। অবশেষে বলশেভিকদের কামানগুলোও গর্জে উঠে সুর মেলালো। কাজানোভিচ কেমন যেন অপ্রতিভের মতো হাসলেন, ফিল্ড-গ্লাস-ধরা সরু হাতটা কেঁপে উঠল। যখন দেখলেন মারকভ-ফৌজ শুয়ে পড়েছে, হন্তদন্ত হয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ কবেছে, তখন ওঁর রোদে-পোড়া মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কুয়ো থেকে লাফিয়ে নেমে তিনি ফিল্ড টেলিফোনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন, ডাকলেন জেনারেল তিমানভ্‌স্ককে।

"সেপাইরা একদম শুয়ে পড়েছে মাটির ওপর", রিসিভারটার সামনে চীৎকার করে বললেন কাজানোভিচ : "যেমন কবে হোক্‌ শত্রুর বাঁ-দিকটায় ভাঙন ধরান!... এখন প্রত্যেকটা মুহূর্তেরই অনেক দাম!"

সঙ্গে সঙ্গে মারকভ-ফৌজের কিছু লোক বেরিয়ে এল রেল-লাইনের ধারের উঁচু পাড়টার আড়াল থেকে—এরা সবাই তিমানোভ্‌স্কির রিজার্ভ সৈন্য। দলে দলে, ভাগ ভাগ হয়ে, পর পর সারি বেঁধে ওরা অদৃশ্য হতে লাগল শীষ-ঝরা উঁচু উঁচু পাকা গমের ক্ষেতের আড়ালে, ওদের সবারই এখন দারুণ উত্তেজিত একরোখা মেজাজ। তিমানোভ্‌স্কির চেহারায় তারুণ্য, গাল দুটো লাল, ফূর্তিমাখা। উঁচু টুপিটা টেনে দিয়েছে এক কানের ওপর। পরনে নোংরা লিনেন শার্ট, কাঁধে জেনারেলদের কালো পটি। সারির পিছন পিছন ছুটে এল সে ঝুলন্ত তলোয়ারটা চেপে ধরে। সম্পূর্ণ ধারণাতীত কিছু একটা ঘটছে : বলশেভিকরা যেন এখন একেবারে নতুন মানুষ—এক সময় ওদের দোদুল্যমানতাকে মনে হত অবধারিত, কিন্তু সে-সময় এখন উৎরে গেছে। সারা স্তেপের মধ্যেই এখন ছেয়ে আছে ওদের খুদে-খুদে অগ্রসরমান মূর্তিগুলো। ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর মেশিনগানগুলো ভীষণ-

পক্ষে—কেবল বিপ্লব আর লড়াই,—আর নয়তো দূরান্তরের সুখ-স্বপ্ন, দাশার স্বপ্ন, যে-পাট ও চুকিয়ে দিয়েছে আগেই। দাশার কথাই ভাবতে থাকে তেলেগিন (সত্যি বলতে কি, এ-ভাবনার কোনোদিনই বিরতি হয়নি), দাশাকে দেখাশোনা করার কেউই নেই, একেবারে একা : দুনিয়ার কিচ্ছু বোঝে না ও, নিজের কল্পনা নিয়ে নিজেই মত্ত হয়ে আছে...দৃষ্টিতে ওর দৃঢ়তা আছে, কিন্তু মনটা পাখির মতো ভীরু, সচকিত,—একেবারে বাচ্চা, নেহাৎই শিশু ও...

সামনে বাড়ানো হাতটা দিয়ে তেলেগিন এক মুঠো গরম মাটি চেপে ধরে। চোখ বুজে আসে ওর। দাশা তো ওকে ছেড়েই গেছে—চিরকালের জন্য। সে বিষয়ে দাশার নিজের বোধহয় কোনো খটকাই নেই! কী বোকা মেয়েটা! কে তোমার ওই কড়া চোখকে ভয় করে? ভেবেছ আর কেউ তোমাকে আমার মতো এমন গভীরভাবে ভালবাসতে পারবে? বোকা কোথাকার! পরে যে কতো কষ্ট তোমায় সইতে হবে!...কত জ্বালা, ভুলতে পারবে না!.....

ইভান ইলিয়িচের চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে অজান্তেই গড়িয়ে পড়ল জল—জখমটা ওকে বড়ো কাহিল করে দিয়েছে। কানের কাছেই কোথায় যেন একটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে। তারার আলোয় রক্তাক্ত পদদলিত লড়াইয়ের ময়দানটাকে রুপোলি দেখাচ্ছে। রাতের আঁধারে ঢাকা পড়েছে সবকিছু।...নিজেকে কোনোরকমে ঠেলে তুলে ইভান ইলিয়িচ উঠে বসল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল হাঁটুজোড়া। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে, যেন ছেলেবেলার দিনগুলো আবার ফিরে এল। বুকটা ওর বেদনায় অশ্রুতে ভরে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে ও হাঁটতে শুরু করে, এমনভাবে হাঁটে যেন মাথায় ঝাঁকুনি না লাগে।

করেনভ্স্কায়া এখান থেকে আধমাইল-টাক দূরে। গ্রামের এখানে ওখানে দু'একটা অগ্নিকুণ্ড দেখা যাচ্ছে। তেলেগিনের কাছেই একটা নিচু মতো জায়গায় মাটির ওপর নাচছে আগুনের নির্মল লেলিহান শিখা। হঠাৎ যেন ওর খিদে আর তেষ্টা পেয়ে যায়, আগুনের দিকেই এগিয়ে যায় ইভান ইলিয়িচ।

মাঠের চারদিক থেকে কালো-কালো সব মূর্তি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে আগুনটার দিকে—অনেকে সামান্য আহত, অনেকে আবার বিধ্বস্ত ডিভিশন থেকে দলছাড়া হয়ে পড়েছে, কেউ-কেউ বন্দীদের ধরে আগে আগে ঠেলে নিয়ে আসছে। একজন আরেকজনকে ডাকছে, ভাঙা গলায় খিস্তি করছে, পাগলের মতো হাসিতে ফেটে পড়ছে কেউ-কেউ। আগুনের কুণ্ডের পাশে রীতিমতো একটা ভিড় জমে গেছে। জ্বলন্ত রেল-শ্লিপার গাদা করে আগুনে চাপানো হচ্ছে।

ইভান ইলিয়িচের নাকে রুটির গন্ধ আসে—ঝুলকালিমাখা মানুষগুলো সবাই যেন কী চিবোচ্ছে। আগুনের খুব কাছেই রুটি-বোঝাই একটা গাড়ি, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রোগা চেহারার একটি স্ত্রীলোক, মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা। সবাইকে জল খেতে দিচ্ছে সে।

প্রাণভরে জল খেয়ে, এক টুকরো রুটি হাতে নিয়ে তেলেগিন গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, রুটি চিবোতে চিবোতে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে

উঠবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আবার চিত হয়ে পড়লেন গরম বালিশটার ওপর, চোখদুটো তাঁর অসহায়ভাবে পিটপিট করতে লাগল। বেলিয়াকভ তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

"উঠুন, মহামান্য কমরেড সুপ্রীম কম্যাণ্ডার সাহেব। এখন তো আপনি ককেসাসের সর্বেসর্বা।...শুনতে পাচ্ছেন কী বলছি? আপনি তো এখন একাধারে জার আর সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং—শুনছেন আমার কথা?"

এতক্ষণে সরোকিন বুঝলেন খবরটার তাৎপর্য। বুঝলেন যে ফুটকি আর ড্যাশ্-এর আকারে তাঁরই চমকপ্রদ ভাগ্যলিপি লেখা রয়েছে ওই সরু কাগজের ফিতেটার ওপর, যে-ফিতেটা এখন চীফ-অব-স্টাফ তাঁর আঙুলে পাকিয়ে রেখেছেন। তাড়াতাড়ি পাতলুনটা ঠিক করে তিনি কাঁধের ওপর চাপিয়ে নিলেন টিউনিক, পিস্তলের খাপ আর তলোয়ারটাও এঁটে নিলেন কোমরে।

"ফৌজের কাছে এখনই হুকুমটা জানিয়ে দাও।.....আমার ঘোড়া কোথায়!"

ভোরের দিকে তেলেগিন গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে রাস্তা করে বেরিয়ে এল নিজের রেজিমেণ্টাল সদরদপ্তরের আস্তানাটা খুঁজে বের করবার জন্য। মাথায় একটা নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে ও। ঠিক এমনি সময় একদল ঘোড়সওয়ারকে ছুটে আসতে দেখা গেল স্টেশনের দিক থেকে। ওদের কসাক আংরাখার প্রান্তদেশ উড়ছে বাতাসে। দলের একজন হল বিউগ্‌ল-বাদক, তার পেছনে দু'জন সওয়ার—লম্বা-ঝুঁটিওয়ালা ঘোড়ার মুখের কাছাকাছি ঝুঁকে টগবগিয়ে ছুটে আসছেন সরোকিন, আর তাঁরই পাশে পাশে আসছে একজন কসাক, বর্শার মাথায় সর্বাধিনায়কের সরু নিশানটা উড়িয়ে। যে-দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল সেইদিকে ছুটে চলল সওয়াররা। ধুলোর ঘূর্ণিঝড়ে ঢাকা পড়ে ওদের দেখাচ্ছিল আবছা প্রেত-মূর্তির মতো।

শিশির-ভেজা গাড়িগুলোর ভেতর থেকে অবসন্নভাবে কয়েকটা মাথা জেগে উঠল দাড়ি উঁচিয়ে—কর্কশ গলার স্বরে নিস্তব্ধতা ভাঙল। কিন্তু বিউগ্‌ল-বাদক এর মধ্যেই অনেকটা দূরে চলে গেছে, সশব্দে সে ঘোষণা করছে সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের উপস্থিতির কথা,—কাছেই রয়েছেন তিনি, লড়াইয়ের একেবারে মাঝখানে, বুলেট-বিদীর্ণ আকাশের নিচে।.....বিউগলের সুরে ধ্বনিত হচ্ছে গান : "দুশমনকে আমরা করব নিপাত! এগিয়ে চলো বিজয়গৌরবের দিকে!.....বীরের মৃত্যু নেই, তাঁর প্রাপ্য চিরন্তন সম্মান.....টা-রা-টা-রা....."

ইভান ইলিয়িচ গিম্‌জাকে খুঁজে পেল ভাঙা জানলাওয়ালা একটা মাটির কুঁড়ে ঘরে। স্টাফের আর কোনো সদস্য তখন ছিল না। বিশালদেহী গিম্‌জা বিষণ্ণভাবে একটা বেঞ্চের ওপর বসেছিল ঘাড় গুঁজে, দু'হাঁটুর মাঝে ঝুলছিল একখানা হাত, কাঠের চামচে ধরা। টেবিলের ওপর এক বাটি কপির ঝোল, তার পাশেই পড়ে আছে পেট-মোটা একটা ব্রীফকেস্—ওটার মধ্যেই 'বিশেষ দপ্তরের' প্রধানের যাবতীয় সম্পত্তি।

॥ দশ ॥

শেষ পর্যন্ত তিন হপ্তার ছুটি মিলেছে। ভাদিম পেত্রোভিচ রশচিনের এখন আর নড়বার শক্তি নেই, ভয়ানক কাহিল পড়েছে সে, মনেও নানারকম দ্বন্দ্ব।

ভোলিকক্‌নিয়াঝেস্‌কায়া স্টেশনে যে ভলাণ্টিয়ার গ্যারিসনটা মোতায়েন ছিল, রশচিনও সেই দলে ছিল এতদিন। খুব বড়দরের লড়াই বিশেষ একটা হয়নি, কারণ লালফৌজকে আরও দক্ষিণে হটিয়ে নেয়া হয়েছে। সেখানে তারা এখন দেনিকিনের প্রধান বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত। মানিচ আর সাল নদীর আশপাশের গ্রামগুলোতে অবশ্য মাঝে মাঝে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে, কিন্তু আতামান ক্রাস্‌নভের কসাক পিটুনি-ফৌজ এইসব দুর্দান্ত লোকদের ঠাণ্ডা করবার কায়দা ভালভাবেই রপ্ত করেছে—প্রথমে তারা মিষ্টি কথা বলে বোঝায়, তারপর আনে কাঁটা-তোলা চাবুক, তাতেও না হলে ফাঁসিকাঠ।

এইসব প্রতিহিংসার কাজ ভাদিম পেত্রোভিচ এড়িয়ে গেছে মাথার জখমের অজুহাত দেখিয়ে। দেনিকিনের জয়ে উল্লসিত হয়ে অফিসাররা যে-সব উৎসবের অনুষ্ঠান করত, রশচিন যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকতো সেসব থেকে। আর অদ্ভুত জিনিস, ঘাঁটির মধ্যেই কি, আর লড়াইয়েই কি, সবাই রশচিনের সঙ্গে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতো, ওর সম্পর্কে সবারই কেমনধারা একটা চাপা শত্রুতার ভাব।

কে একজন রটিয়ে দিয়েছিল, রশচিন লোকটি আসলে লাল, আর সেই বিশেষণটাই এখন ওর সম্পর্কে চালু হয়ে গেছে।

শাব্‌লিযেভকার পরিখায় ভলাণ্টিয়ার ওনোলি ওর ওপর গুলি চালিয়েছিল। রশচিনের সে ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে : সাঁজোয়া ট্রেন থেকে ছুটে আসছিল একটা গোলা, কম্যাণ্ডার সাহেব হুকুম করলেন : 'শুয়ে পড়ো!' তারপরই বিস্ফোরণ। আর—রিভলবারের আওয়াজটা হল একটু দেরিতে, লাঠির খোঁচার মতো একটা আঘাত লাগল ওর মাথার পিছনটাতে, ওনোলির ঘূর্ণ্যমান কালো চোখ-দুটোর মধ্যেও দেখতে পেল পাশব উল্লাসের দীপ্তি।

রশচিনের কথা শুধু একজনই সত্যি বলে মানতে পারতেন—তিনি হলেন জেনারেল মারকভ। কিন্তু তিনিও আজ মৃত। রশচিন তাই ঠিক করেছে ওনোলি ছোকরার সম্পর্কে তার সন্দেহজনক নালিশটা আর তুলে কাজ নেই।

একটা প্রশ্নের জবাব ও প্রাণপণ চেষ্টা করেছে খুঁজতে : তার সম্পর্কে ওদের এই ঘৃণাটা কেন? ও যে সৎ লোক, তা কি ওরা কেউ খোলা চোখে দেখতে পায় না? দেখতে পায় না যে, ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, ওর সমস্ত কাজকর্মের পেছনে একমাত্র প্রেরণা রাশিয়ার মহত্ত্ব? স্তেপের এই ভয়াবহ প্রান্তরে ও তো আর জেনারেলের পদকচিহ্নের লোভে আসেনি!.....

যে-দৃষ্টির সামনে নির্মমভাবে প্রকট হয়ে ওঠে সবকিছু, সে-দৃষ্টির অভাব আছে রশচিনের। নিজের মনের রঙ দিয়ে ও পৃথিবীটাকে রাঙায়, ঘটনার বিচার

আত্মসমর্পণ করে যতোলোকের যতো রক্ত ঝরেছে তা যদি আজ একজায়গায় জমা করা যেত তাহলে সেই বিরাট রক্তের নদীতে তাকে নিঃসন্দেহে ডুবিয়ে মারতো লোকে।

রশচিনের সহযোদ্ধা-অফিসারদের মাথায় একমাত্র ভাবাদর্শ যা আছে তা ওই শ্রাদ্ধবাসরের সঙ্গীত। রশচিনকে তাই দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হয়।.....রাশিয়া থেকে বলশেভিকদের হটাও, মস্কো দখল করো। গির্জার ঘণ্টা.. ..সাদা ঘোড়ায় চেপে দেনিকিন ঢুকছেন ক্রেমলিনে।.....এ সব অবশ্য বুঝতে কোনোই কষ্ট নেই।... কিন্তু তার পর? সেইটেই তো আসল প্রশ্ন! অফিসার মহলে সংবিধান পরিষদের নামোচ্চারণ করলেও তা অভদ্রতার পরিচায়ক। তা হলে কি শুধু মৃতদের উদ্দেশে বিলাপ করলেই সবকিছু হয়ে গেল?

এতগুলো মানুষ যে লড়াইয়ে নেমেছে, মৃত্যু বরণ করছে, সে তাহলে কিসের আকর্ষণে? রশচিন আবার চোখ ঘুরিয়ে নেয়।.....বুলেটের সামনে বুক পেতে দেয়া, আর তারপরেই মালগাড়িতে চড়ে নির্জলা মদের গেলাসে চুমুক দেয়া—একে নিশ্চয়ই বীরত্ব বলে না। এ তো হল মামুলি ব্যাপার। সাহসীই বলো আর ভীরুই বলো—সবাই তো তাই করে থাকে। মরণের পরোয়া না করাটা এখন নিতান্তই দৈনন্দিন ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে, মানুষের জীবন এখন শস্তা।

বিশ্বাস আর সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করলে তাকেই বলা যায় আসল বীরত্ব। কিন্তু এবারও রশচিনকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে হয়। ওর সঙ্গী-অফিসাররা কোন্ সত্যে বিশ্বাস করে? ওর নিজেরই বা কোন্ সত্যে আস্থা? রাশিয়ার মহান্, করুণ ইতিহাসে? কিন্তু সে তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, সত্য তো নয়। সত্য আছে গতির মধ্যে, জীবনের মধ্যে—জীর্ণ খাতার বহু-আঙুল-ঘষা পাতার মধ্যে নয়, আছে ভবিষ্যতের চির-প্রবহমান জীবনধারার মধ্যে।

কোন্ সত্যের নামে রুশ চাষীদের হত্যা করার প্রয়োজন হল (মস্কোর গির্জার ঘণ্টা, সাদা ঘোড়া, আর বেয়নেটের মাথাব ফুল ইত্যাদিতে যদি কারো ভক্তি নাই-বা থাকে)? এই প্রশ্নটাই মাথা চাড়া দিতে শুরু করল ভাদিম পেত্রোভিচের চেতনার মধ্যে, ওর চিন্তাভাবনাকে বিপর্যস্ত করে তুলল—একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে দিলে জলের ওপরকাব প্রতিবিম্ব যেমন বিপর্যস্ত হয় ঠিক তেমনিভাবে। রশচিনের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে একটা মর্মান্তিক বিদারণ শুরু হল এই সময়টায়। সঙ্গী-অফিসারদের কাছে তার পূর্ব-পরিচয় ঘুচে গেল, ও এখন 'লাল", "বল্‌শি"।

কাতিয়াকে ও শেষ যে-কথাগুলো বলেছিল সেগুলো যেন ক্রমেই আরো বেশি করে মনে পড়তে থাকে ওব। লজ্জায কান পর্যন্ত গরম হযে ওঠে। আবেগে রুদ্ধনিঃশ্বাস হয়ে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে দাশা বলেছিল: "ভাদিম, ভাদিম! একেবারে অন্য রকম কিছু যে করা দরকার আমাদের।" ও বোধহয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল অতল গহ্বরের কিনারায দাঁড়িযে আছে রশচিন, আর তার পায়ের নিচে যেন হড়কে যাচ্ছে পাথরের নুড়ি।

রশচিন এখনো মানতে রাজি নয় যে কাতিয়াই ঠিক, ও মানতে চায় না যে ওর অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। যতোই নিচের দিকে নামছে ও, ততোই

রশচিন আবার ছুটলো স্টেশনমুখো, এক কাপ চাও খেল না তেৎকিনের ঘরে। সন্ধ্যের সময় একাতেরিনোস্লাভের একটা ট্রেন রয়েছে, সেটা ধরতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিংরুমে ঢুকে ও একটা শক্ত ওক কাঠের বেঞ্চিতে বসল। কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের তেলোয় মুখ ঢেকে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিল চুপচাপ।...

ভাদিম পেত্রোভিচের পাশেই কে যেন এসে গা এলিয়ে দিল বেঞ্চিটার ওপর, এমনভাবে হাঁফ ছেড়ে বসল লোকটা যে পরিষ্কার বোঝা গেল বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাবার জন্যই সে এসেছে। এর আগে অনেকেই এসে বসেছে, আবার চুপচাপ চলে গেছে, কিন্তু এই শেষ আগন্তুকটি বসে এমন জোরে-জোরে পা আর হাঁটু নাড়াতে শুরু করল যে গোটা আসনটাই কেঁপে উঠতে লাগল। লোকটা যায়ও না, পা-নাচানো বন্ধও করে না। চোখের ওপর থেকে হাত না সরিয়েই রশচিন বলল :

"এই যে মশাই—পা নাচানোটা একটু বন্ধ করতে পারেন?"

"ওঃ, মাপ করবেন—বড্ড বিশ্রী অভ্যাস", মোলায়েম সুরে জবাব এল।

এর পর একেবারে চুপ হয়ে গেল আগন্তুকটি।

গলা শুনে ভাদিমের মনে হল চেনা-চেনা—কোন্ এক দূরান্তরের মনোমুগ্ধকর স্মৃতির সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে গলার স্বরটা।...হাত না সরিয়েই রশচিন আঙুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে তার পার্শ্ববর্তীকে। এ যে তেলেগিন। কাদামাখা বুটওয়ালা পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে, পেটের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে হাত দুটো, উঁচু আসনের পিছনে ঘাড়টা হেলিয়ে দিয়ে ঝিমুচ্ছে মনে হল। ওর পরনে আঁটসাঁট উর্দি, বগলের কাছটা তাই কুঁচকে আছে, কাঁধের ওপর লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের কাঁধপটিগুলো ঝক্‌ঝকে নতুন। পরিষ্কার-কামানো রোগা মুখটার ওপর একটা স্থির হাসি, অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন লোকে বিশ্রাম নেয় তখন যেমন হাসি লেগে থাকে মুখে, তেমনি।.....

কাতিয়ার পর যাকে রশচিন দুনিয়ার সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসে সে হল তেলেগিন—একেবারে ভাইয়ের মতো, প্রিয় বয়স্যের মতো ভালবাসে ওকে। কাতিয়া আর দাশা—এই দু'বোনের স্নিগ্ধতার আলোয় তেলেগিনও আলোকিত।...ওকে দেখে বিস্ময়ে ভাদিম প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল, আর একটু হলেই ঝাঁপিয়ে পড়তো ইলিয়িচের ওপর। তেলেগিন কিন্তু চোখ খোলেনি, নড়েও নি একবার। এর মধ্যে রশচিন সামলে নিল নিজেকে। ও বুঝতে পারছে ওর পাশেই যে-লোকটি বসে আছে সে ওর দুশমন। মে-মাসের শেষাশেষি ও জানতে পেরেছিল, তেলেগিন লালফৌজে আছে, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই নাকি যোগ দিয়েছে, আর ওকে নাকি খুব ভক্তিশ্রধাও করে ওরা। ওর পোশাকগুলো যে নিজের নয় তা বোঝাই যাচ্ছে, সম্ভবত কোনো নিহত অফিসারের সম্পত্তি যাকে নিশ্চয়ই প্রথমে খুন করতে হয়েছে ওকে। লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের পরিচয়চিহ্ন ওর কাঁধে, কিন্তু রশচিন ভাল করেই জানতো ও আগে সাধারণ একজন ক্যাপ্টেন ছিল। হঠাৎ রশচিনের যেন গা বমি-বমি করতে থাকে, মনে দারুণ ঘৃণা এলে সাধারণত ওর যেমন হয়। তেলেগিন এখানে এল কী করে? নিশ্চয়ই বলশেভিক গোয়েন্দা হিসেবে!...

সেই কাতিয়া একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ঢিকিরে ঢিকিরে চলেছে স্তেপের ওপর দিয়ে। কাঁধদুটো ওর শাল দিয়ে জড়ানো। পাশে বসে আছে সুন্দরী মাত্রিয়োনা ক্রাসিল্‌নিকোভা। লক্কর গাড়িটার ঝনর্‌-ঝন্‌র আওয়াজ। ঘোড়াগুলো ফোঁস-ফোঁস করছে। সামনেও অসংখ্য গাড়ি সারি বেঁধে চলেছে, পেছনেও অসংখ্য। স্তেপের ওপর দিয়ে চলে গেছে বহুদূর। তারায় ভরা রাতের আকাশের নিচে অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে সবাই।

সামনেই বসেছিল আলেক্সি ক্রাসিল্‌নিকভ, হাতে আলগা করে ধরে রেখেছে ঘোড়ার লাগাম। গাড়ির একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে সেমিয়ন, ওর বুটের ওপর এসে-এসে পড়ছে কাঁটা গাছের পাতা আর ঘাসগুলো। সোমরাজ লতা আর ঘোড়ার গায়ের গন্ধ আসছে। কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো আকাশ-পাতাল ভাবছে কাতিয়া। স্তেপের যেন আর শেষ নেই। রাস্তাও যেন ফুরোতে চায় না। ঘোড়াগুলো ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছে সামনে, চাকাগুলোও সমানে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করছে,—যেন কোন্‌ অনাদিকাল থেকে যাত্রা শুরু করে প্রাচীন যাযাবরদের স্রোতের মতো সারি বেঁধে ওরা চলেছে তো চলেছেই!

সুখের সন্ধান মিলবে অনন্ত চাওয়ার শেষে স্তেপের সীমানায় এসে, নীল সমুদ্রের তটরেখায়, ঢেউয়ের আকুলি-বিকুলিতে, সুখ হল প্রশান্তি, সুখ হল প্রাচুর্য।

কাতিয়ার মুখের দিকে চেয়ে মাত্রিয়োনা একবার খিল্‌খিল্‌ করে হাসল। তারপরেই আবার আগের মতো সব নিস্তব্ধ, আওয়াজ যা শুধু ঘোড়ার পায়ের। বেষ্টনীর ভেতর থেকে পালিয়ে বেরিয়ে আসছে ওদের ফৌজ। মাখনো ওদের বলে দিয়েছে যথাসম্ভব নিঃশব্দে সরে পড়ার জন্য। আলেক্সির ভারি কাঁধজোড়া নুয়ে পড়তে চায়—ওরও নিশ্চয় ঝিমুনির ভাব এসেছে।

"ব্যাপার এমন নয় যে আমি তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাই।" আস্তে আস্তে বলছিল সেমিয়ন মাত্রিয়োনাকে : "তুমি আমার কানের কাছে অমন ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ করে 'সেমিয়ন, সেমিয়ন' কোরো না তো..." (ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাতিয়া মুখ ঘুরিয়ে নেয়, চেয়ে থাকে স্তেপের দিকে।) "আমি তো আলেক্সিকে সেবার বলেইছিলাম, জাহাজী-টুপির রিবনের জন্য আমি পরোয়া করি না...আসল কথাটা হচ্ছে আদর্শের..." (আলেক্সি একটা কথাও বলে না।) "নৌ-বহর এখন কাদের হাতে? আমাদের চাষীদেরই তো হাতে। আর আমরাই যদি চম্পট দি তাহলে!...আমরা সবাই তো লড়ছি একই লক্ষ্য নিয়ে—তোমরা এখানে, আমরা সেখানে..."

"চিঠিতে ওরা কী লিখেছে?" জিজ্ঞেস করল মাত্রিয়োনা।

"ওরা লিখেছে, যদি নিজেকে আমি পলাতক আর বিপ্লবের আঙিনা থেকে বিতাড়িত প্রমাণ করতে না চাই তবে যেন এখনই ফিরে যাই নিজের ডেস্ট্রয়ারে..."

মাত্রিয়োনা একদিকের কাঁধ উঁচু করে। বোঝা গেল ভয়ানক রেগে গেছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে রইল ও। খানিকক্ষণ বাদে আলেক্সি একবার

ভীড়—চাষী, যুদ্ধফেরত সৈনিক, পলাতক, উদ্বাস্তু, সবাই আছে। সারাতভে নেমে বিপ্লবী কমিটির অফিসে গিয়ে ও কাগজপত্র দেখালো, তারপর সেখান থেকে ধরল সীজরানের টাগ্‌বোট। চেকোস্লোভাক রণাঙ্গনও সীজ্‌রান থেকেই শুরু।

সেই আধা-পৌরাণিক যুগে চেঙ্গিস্‌ খাঁর ঘোড়সওয়াররা নাকি ভল্‌গার বালুকাময় তীরভূমিতে এসে এই বহুবিখ্যাত নদীর জল খাইয়েছিল তাদের ঘোড়াদের। সে সময় যেমন ছিল, আজও তেমনি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে ভল্‌গার তীর। বালুতট, সবুজ জলা-মাঠ আর রোজ-উইলো ঝোপের নক্‌শার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে অক্রান্ত বয়ে চলেছে ভল্‌গার জলবিস্তার, আয়নার মতো স্বচ্ছ। অল্প ক'টা গ্রাম, মনে হচ্ছে তাও পরিত্যক্ত। অখণ্ডবিস্তৃত স্তেপ পুবের দিকে ছড়িয়ে আছে, মনে হয় গরম ভাপের ঢেউয়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে,—ঠিক মরীচিকার মতো। জলের ওপর মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে মন্থর গতিতে। নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দ শোনা যাচ্ছে নীল জলে টাগ-বোটের প্যাডেলের ছপ্‌ ছপ্‌ আওয়াজ।

কাপ্তেন-বুরুজের নিচে কাঠফাটা গরম ডেকের ওপর শুয়েছিল ইভান ইলিয়িচ। ওর খালি পা, পরনে বেল্‌ট্‌খোলা সুতীর কোর্তা; চোয়ালের ওপর লালচে-সোনালি দাড়ি দেখা দিয়েছে। রোদে গা-এলিয়ে-দেওয়া বেড়ালের মতো আরামে ও উপভোগ করছিল নীরব পরিবেশটুকু; জলা ঘেসো ফুলের ভিজে সুবাস, স্তেপ-ঘাসের শুকনো গন্ধ ভেসে আসছে নদীর ঢালু পাড় থেকে। আর আলোর সে কী সীমাহীন প্রাচুর্য! পরিপূর্ণ বিশ্রাম কাকে বলে তা আজই প্রথম জানলো ইভান।

স্তেপ এলাকার গেরিলাদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র আর গুলিগোলা যাচ্ছিল এই স্টীমারে। মালের সঙ্গে সঙ্গে যে-সব লাল ফৌজী সেপাই চলেছিল তারা সবাই তাজা হাওয়া খেয়ে কেমন যেন চিশ্‌চিশ্‌ করছে—কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ প্রাণভরে ঘুমিয়ে নিয়ে এখন গান গাইছে, কেউ গড়াচ্ছে, কেউ আবার জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফৌজীদলের কম্যান্ডে আছে কমরেড খ্‌ভেদিন, কৃষ্ণসাগরের নাবিক। দিনের মধ্যে বার-কয়েক কবে সে চেষ্টা করছে সেপাইদের কর্তব্যবোধ জাগাতে, শ্রেণী-চেতনার অভাবের জন্য ওদের লজ্জা দিতেও চেষ্টা করছে। কিন্তু ওরা খালি কম্যান্ডারকে ঘিরে দল পাকিয়ে শুয়ে-বসে থাকে, হাতের তেলোয় থুতনি রেখে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

খস্‌খসে গলায় বলে খ্‌ভেদিন : "একবার বুঝতে চেষ্টা করো ভাইসব! শুধু দেনিকিন নয়, আতামান ক্রাস্‌নভ্‌ও নয়, শুধু চেকরাও নয়, আমরা আজ লড়ছি পুব-পশ্চিম দুনিয়ার গোটা বুর্জোয়া জাতটার বিরুদ্ধে।.....নিজেদের ওরা শেষবারের মতো গুছিয়ে নেবার আগেই খুনী বিশ্ববুর্জোয়াগুলোর ওপর একটা চরম আর ভীষণ আঘাত হানতে হবে। আমাদের পক্ষে রয়েছে দুনিয়ার সর্বহারা মানুষ—ওদের সঙ্গে যে রক্তের টান রয়েছে আমাদের র্‌-র্‌-রাশিয়ানদের! (শব্দটা সে রীতিমতো গর্বের সঙ্গে জোর দিয়ে-দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে)।...ওরা শুধু একটা জিনিসের জন্য অপেক্ষা করছে—আমাদের নিজেদের দেশের পরগাছাদের

এখন শ্বেতফৌজের দখলে। দ্বীপের ওপর যারা আছে তারা হচ্ছে পলাতক গ্যারিসনেরই হতাবশিষ্ট লোকজন। স্থানীয় গেরিলাদের একটা অংশও আছে। কারো-কারো হাতিয়ার আছে, তবে গুলিবারুদ ফুরিয়ে গেছে একদম।

লালফৌজের লোকেরা কোবিনে ছুটে যায় রাইফেল আনতে। কাপ্তেনের জায়গায় খ্‌ভেদিন নিজেই গিয়ে দাঁড়ায়। ওর মুখের সচীৎকার খিস্তি আর গালাগালি নদীর ওপর গম্‌গম্‌ করে এমন সাড়া জাগায় যে চরের লোকদের আশ্বস্ত হতে একটুও দেরি হয় না, ওদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মুহূর্তের উত্তেজনায় খ্‌ভেদিনের ঝোঁক উঠেছিল নদীর দিক থেকে শহরের ওপর এখনই সামনাসামনি হামলা চালাবে, শত্রুদের মোকাবিলা করবার জন্য ডাঙায় নামিয়ে দেবে একটা অবতরণকারী দল। কিন্তু ইভান ইলিয়িচ বাধা দিল, সামান্য চেষ্টা-চরিত্র করেই ওকে বুঝিয়ে দিল অপ্রস্তুত অবস্থায় হামলা কবলে সে হামলা ব্যর্থ হতে বাধ্য; প্রথমে চারদিকের ঘাঁটি শক্ত করতে হবে; খ্‌ভেদিন তো জানেও না শত্রুর সামরিক শক্তি কেমন—হয়তো ওদের কামানও আছে!

খ্‌ভেদিন দাঁত কিড়মিড় করল বটে, কিন্তু মেনে নিল কথাটা। মাথার ওপর রাইফেলের গুলি চলছে, সেই অবস্থায় স্টীমার পেছু হটতে শুরু করল স্রোতের অনুকূলে। তারপর দ্বীপটার দিকে এগোল পশ্চিম দিক ধরে, সেদিক থেকে শহর দেখা যায় না, জঙ্গলের আড়ালে পড়ে। এইখানে নোঙর করল ওরা। দ্বীপের লোকেরা ছুটে এল বালির চড়া ডিঙিয়ে—জনাপঞ্চাশেক লোক। উদ্‌ভ্রান্ত ছেঁড়া-খোঁড়া অবস্থায়।

"আমাদের কথা একবার শুনতে কী হয়, শয়তানের ঝাড়!" চেঁচিয়ে বলতে লাগল ওরা।

"আমাদের জন্য জাখারকিনের আসার কথা পুগাচেভ্‌স্কের গেরিলাদের নিয়ে"

"পরশুদিন আমরা লোক মারফত খবর পাঠিয়েছিলাম তাকে।"

ওরা বলতে লাগল, তিনদিন আগে নাকি স্থানীয় বুর্জোয়ারা সশস্ত্র হামলা করে শহর-সোবিয়েতের বাড়ি, টেলিগ্রাফ-পোস্টাফিস দখল করে নিয়েছে। অফিসাররা আগের যুগের মতোই একেবারে কাঁধপটি লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অস্ত্রাগারের ওপর, কতকগুলো মেশিনগানও ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। স্কুলের ছাত্র, ব্যবসায়ী, কর্মচারী সবাই বন্দুক ধরেছিল, এমন কি গির্জার পাদ্রিও হাতে একটা শিকারী বন্দুক নিয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করেছে। হঠাৎ এমনি ধরনের ক্ষমতা-দখল হতে পারে তা কেউ আশাই করেনি, রাইফেল ধরার পর্যন্ত সময় ছিল না লালসৈন্যদের।

"আমাদের কম্যাণ্ডাররা পালিয়েছে—ওরা বেইমানি করেছে আমাদের সঙ্গে."

"আর এখন হারানো ভেড়ার মতো ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে।"

খ্‌ভেদিন আর সামলাতে পারল না :

"দূর হ, অপদার্থ যতো সব ডাঙার ভূত!"

রাগে আর কোনো কথাই ও খুঁজে পেল না।

নদীর ধারে জড়ো হল সবাই—সামরিক মন্ত্রণাপরিষদ তৈরি করার জন্য।

ঘাবড়ে দিয়েছিলাম যাই বল্।.....তোর ভাগ্যি ভাল যে আমার হাতে পড়িস্ নি....."

"হ্যাঁ হ্যাঁ! বলো! আরও জাঁক করো! সেবার জিতেছিলুম কিন্তু আমরাই!"

"সবুর, সবুর—আর দুটো দিন বাদে আবার লড়া যাবে'খন দুই উল্টো তরফ থেকে!"

"সে নয় লড়ব।...চিরকালই তুমি কুলাক ছিলে, আর তোমার ওই নোংরা কুলাক-মার্কা বুদ্ধি ঘুচবেও না কোনোদিন।"

"ওরে বেটা, তোর স্বাস্থ্য কামনা করি!"

"তোমারও স্বাস্থ্য কামনা করি বাবা!"

নদীর বাঁ-দিকে গিয়ে ভিড়ল স্টীমার। গ্যাংওয়ে নামিয়ে দিতেই পুগাচেভ্স্ক্-ফৌজীদলের কম্যান্ডার জাখারকিন উঠে এল ডেকের ওপর। শকুনের ঠোঁটের মতো নাকটা তার বাঁকা। এমন শক্তসমর্থ পেশীবহুল চেহারা যে ওর পায়ের ভারে পাটাতনের তক্তা পর্যন্ত ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। রং-জ্বলা উর্দি বগলের কাছে ফেটে গেছে। উঁচু সওয়ারী বুটের ওপর ঠোকর খাচ্ছে বাঁকা তলোয়ারটা। ওর বড়ো ভাইরা উতেভ জেলার চাষী, প্রত্যেকের হাতে রয়েছে একেকটি ডিভিশনের পরিচালনা-ভার। জাখারকিনের পেছন পেছন এল ছ'জন গেরিলা—ওরই কম্যান্ডার সবাই—তাদের পরনে উদ্ভট আর বিচিত্র ধরনের পোশাক : রং-জ্বলা শার্ট, তাতে ধুলো আর আলকাতরার দাগ, বোতামহীন কলার; কারুর পায়ে আবার ফেল্ট জুতো—রেকাব আঁটা, কারুর পায়ে বাক্লা-জুতো; কাঁধে ঝুলিয়েছে কার্তুজ বেল্ট, কোমরে গুঁজেছে হাতবোমা, তা ছাড়া আছে চ্যাপ্টা জার্মান রেয়নেট, করাতে-কাটা রাইফেল।

কাপ্তেন-বুরুজের ওপর সাক্ষাৎ হল জাখারকিন আর খ্ভোদিনের, পারস্পরিক সৌহার্দের সঙ্গে করমর্দনও হল। সিগারেট বিলির পালা চলল খানিক। সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত সারমর্ম জানিয়ে দিল খ্ভোদিন। জাখারকিন বলল :

"আমি জানি খ্ভালিন্স্কে গোলমাল পাকাচ্ছে কে—কুকুশ্কিন, জেম্স্তভোর সভাপতি।...শূয়ারটাকে যদি জ্যান্ত পাকড়াতে পারতাম রে..."

"আপনাদের ওই কামানটা", বলল খ্ভোদিন : "ওটা কি চালু অবস্থায় আছে?"

"দাগা তো যায় ভালই, তবে প্রত্যেকবার সোজা করে বসিয়ে নিতে হয়—'সাইট' তো নেই, তাই নলের ফুটো দিয়েই তাক করে নিতে হয়। তবে হতভাগার দাপট বড়ো কম নয়—ঠিক জায়গায় ঘাই দেয়! প্রত্যেকটা তোপের সঙ্গে উড়িয়ে দেয় ঘণ্টাঘর, পাম্প হাউস!"

"চমৎকার! আচ্ছা কমরেড জাখারকিন, বলুন দেখি ডাঙায় নেমে পাশ থেকে হামলা করা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?"

বস্তার মতো সেগুলো সাজাতে লাগল সারি করে। নিঃশব্দে কাজ করছে ওরা—ব্যাপারটা মোটেই ঠাট্টার নয়।

ভোর হয়-হয়। প্রস্তুতিও শেষ। মরচে-ধরা ছোট পাহাড়ী কামানটাকে বসানো হল স্টীমারের সামনের দিকে। পঞ্চাশজন লোক উঠে এল পাটাতনের ওপর, বালির বস্তাগুলোর পিছনে গুঁড়ি মেরে শুয়ে থাকল। খ্‌ভেদিন ধরল হাল, চেঁচিয়ে হুকুম করল :

"সামনে বাড়ো পুরোদমে!"

প্যাডেলের নিচে জল সপ্‌সপ্‌ করে ফুলে উঠতে লাগল। দ্বীপের পাশ কাটিয়ে প্রধান স্রোত ধরে তাড়াতাড়ি শহরের দিকে এগিয়ে চলল স্টীমার। শহরের এখানে ওখানে হলদে আলো দেখা যায়। পিছন দিকে, রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়ের অস্পষ্ট রেখা দেখা যাচ্ছে। এখন বেশ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে মোরগের ডাক।

ইভান ইলিয়িচ দাঁড়িয়েছিল কামানের কাছে। আর খানিকক্ষণ বাদেই এই অভেদ্য নিস্তব্ধতাটুকু গুলি ছুঁড়ে ভাঙতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছিল ওর।

পুরুতের মতো দেখতে বেঁটেখাটো নিরীহ চেহারার একজন খ্‌ভালিন্‌স্ক্‌-বাসী মাছ ধরার সখও আছে মনে হয়, কামান বসাবার কাজে নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিল। তেলেগিনকে বিনীতভাবে বলল ঃ

"কমরেড কম্যাণ্ডার, সোজা পোস্টাপিসের ওপর তোপ দাগলে কেমন হয়? একেবারে মাঝখানে?...ওই যে দেখুন—পোস্টাপিসের হলদে আলো দুটো..."

"পোস্টাপিস তাক করো!" মেগাফোনের মারফত সগর্জনে হুকুম করল খ্‌ভেদিন : "রেডি! সাইট খোলো!"

গোলন্দাজ হাঁটু গেড়ে বসে কামানের নলের ফুটো দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে কামানের মুখ সরিয়ে এনে তাক করল হলদে আলো দুটোর দিকে। কামানে গোলা পুরে গোলন্দাজটি ঘুরল তেলেগিনের দিকে :

"একটু পেছনে সরে যান তো কমরেড, কখন আবার ফেটে-ফুটে যাবে!"

"ফায়ার!" খেঁকিয়ে উঠল খ্‌ভেদিন।

সজোরে পিছনে হটে এসে গর্জে উঠল কামান। চোখ-ধাঁধানো আলোর ঝলক বেরিয়ে এল মুখ থেকে। নদীর বুকটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল গুরগুর করে। পাহাড়ের দিক থেকে সগর্জন প্রতিধ্বনি উঠল।

"চালাও তোপ! ফায়ার!" হাল ঘোরাতে ঘোরাতে চেঁচাচ্ছে খ্‌ভেদিন : "বন্দরের দিক থেকে তাড়াতাড়ি গুলি চালাও! ঝাঁকে-ঝাঁকে গোলা ছোঁড়ো শুয়োরগুলোর মুখের ওপর!"

প্রবল উত্তেজনায় পা দাপাতে দাপাতে বিতিকিশ্রী গালিগালাজ করতে লাগল খভেদিন। ডেকের দিক থেকে এলোমেলো গোলা চলছিল। খ্‌ভালিন্‌স্কের দিকের পাড়টা ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। গোলন্দাজ স্থিরমস্তিষ্কে কামানে গোলা

যাচ্ছে খোলা স্তেপের জনমানবহীন প্রান্তরে। অস্তরাগের ক্ষণিক সৌন্দর্য বুঝি স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে জলে, নদীর তটে, মানুষের চোখে, এমন কি তার হৃদয়েও...

"এমন মন-মরা কেন ভাইসব?" বলল খ্‌ভেদিন : "গানই যদি গাইবে তো ফুর্তির গান গাও না?"

ও নিজেও একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছে। তারপর এক গেলাস স্পিরিট গলায় ঢেলে এখন পায়চারি করছে ডেকের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। পাতলুনটা টেনে সোজা করে বলল : "সীজরানটা যদি একবার দখল করতে পারতাম! আপনি কী বলেন, কমরেড তেলেগিন? জোর একটা ধোলাই দিয়ে দিতে পারতাম ওদের, তাই না?"

ক্রমাগত সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসছিল খ্‌ভেদিন। বিপদে ওর ভয় কী! ভলগার জলে সূর্যাস্তের কী বিষণ্ণ শোভা তা নিয়ে ও মাথা ঘামায় না, কোন্ দিক থেকে কোন্ মারাত্মক বুলেট এসে ওর প্রাণ হরণ করবে সে গ্রাহ্যও নেই ওর। জীবনের জন্য আকণ্ঠ পিপাসা আর অনির্বাণ প্রাণশক্তি ওর মধ্যে উদ্দাম উদ্বেল।...পাটাতনের তক্তাগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ্ করে উঠল ওর খালি পায়ের চাপে।

"একটু সবুর বাছাধনেরা, একটু গুছিয়ে নিতে দাও, তারপর সীজ্‌রান, সামারা—সারা ভল্‌গাই আমাদের হাতে এসে যাবে।..."

একটা পাতলা আবরণে ঢাকা পড়ে সূর্যাস্তের আকাশ। স্টীমারে কোনো বাতি জ্বলে না। নদীব পাড় যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রাতের আঁধারে। নিজেকে নিয়ে কী করবে ঠিক করতে না পেরে খ্‌ভেদিন ইভান ইলিয়িচকে ডাকল তাস খেলতে।

"টাকা বাজি রেখে খেলতে না চাও তো এসো—যে হারবে তাব নাকের ওপর চাপড়, এই বাজি রাখা যাক্। কিন্তু খাঁটি জিনিস হওয়া চাই!"

কাপ্তেনের কেবিনে বসে ওরা নাকে-চাপড় বাজি রেখে খেলতে লাগল। ঝৌকের মাথায় খ্‌ভেদিন বেশি ডাক দিয়ে ফেলল,—উঠতে উঠতে একসঙ্গে একদম তিনশো চাপড় বাজি। খেলতে গিযে এমন পাগলা হয়ে গেছে যে প্রায় চুরি করবার জোগাড়। কিন্তু ইভান ইলিয়িচ কড়া নজর বেখেছে, বলে : 'উঁহু, ওটি চলবে না হে দোস্ত!' জিতে গেল তেলেগিনই। তারপর একটা টুল টেনে নিয়ে বেশ যুৎ করে বসে দোস্তের নাকের ওপর তেলতেলে তাসের গোছা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই খ্‌ভেদিনের নাকটা করমচার মতো লাল হযে উঠল।

"কোথায় শিখলে হে ভাই?"

"শিখেছিলাম যখন জার্মানদের হাতে বন্দী ছিলাম তখন।" বলল তেলেগিন : "আরে আরে বদন ফিবিয়ে নিচ্ছ কেন! এই দু'-শো-সাতা-নব্বই।"

"খবরদার! তাস বাঁকানো চলবে না! যদি বাঁকাও তাহলে কিন্তু আমি..."

"বাজে বোকো না! এই শেষ তিনটে ঘাইয়ে ইচ্ছে করলে বাঁকানো চলে।"

"চালা তাহলে, শয়তান!"

ঘণ্টাখানেক বাদে সীজরান শহর পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে গেল অনেকটা। বাত্‌রাকির কাছাকাছি আসতে তেলেগিনকে নামিয়ে দেয়া হল ডিঙিতে। বাত্‌রাকি থেকে দুপুরের ট্রেন ধরে গোটা পাঁচেকের সময় তেলেগিন সামারা স্টেশনে এসে পেঁছুল—সেখানে থেকে রওনা হল ডাক্তার বুলাভিনের ফ্ল্যাটের উদ্দেশে। লেফটেন্যান্ট-কর্ণেলের কাঁধ-পটি-লাগানো ছেঁড়া ভাঁজ-পড়া টিউনিকটা আবার সে গায়ে চাপিয়েছে। রাস্তায় যেতে যেতে যতো থিয়েটারের বিজ্ঞাপন, নোটিস আর আবেদনপত্র চোখে পড়ে সবই ও পরম ঔৎসুক্যভরে পড়তে থাকে, যেন কতকাল সে দেখেনি এসব জিনিস, আর বেত দিয়ে ঠুকতে থাকে বুট জুতোর ডগা—এই বেতটা দিয়েই সে গত রাতে গেরিলা সেপাইদের জাগিয়েছিল ঘুম থেকে। বিজ্ঞাপন আর নোটিসগুলো সবই দুটো ভষায় লেখা : রুশ (প্রাক সংস্কার যুগের বানানে) আর চেক।

লেমনেডের গ্লাস হাতে ডাক্তার দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ্‌ বুলাভিন; ওয়েস্ট্‌-কোটের গলায় গোঁজা বড়ো রুমাল-খানা টেনে বের করে নিলেন তিনি, তারপর রাজকীয় ভঙ্গীতে ঠোঁটদুটো চিবিয়ে-চিবিয়ে আরম্ভ করলেন বক্তৃতা, গলার স্বর সুগম্ভীর আর ব্যঞ্জনাময়, আন্ডার সেক্রেটারির দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকে তিনি সম্প্রতি এমনি ধরনের কণ্ঠস্বর আয়ত্ত করেছেন।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে অনুমতি দিন. ."

পৌরসভার প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এটা একটা সম্বর্ধনা-সভা, উত্তরাঞ্চলে সংবিধানী ফৌজের সাফল্যমণ্ডিত অভিযান উপলক্ষে উৎসব হচ্ছে এখানে। সিম্‌বির্স্ক্‌ আর কাজান দখল করা হয়েছে। মধ্য-ভল্‌গা এলাকা বুঝি শেষ পর্যন্ত একেবারেই হাতছাড়া হয়ে গেল বলশেভিকদের। মেলেকেস্‌ বলে একটা জায়গায় লাল অশ্বারোহী ফৌজের হতাবশিষ্ট অংশ প্রাণপণে চেষ্টা করছে অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে। ওদের দলে তখন সাড়ে তিন হাজার সেনা। সম্মুখ-যুদ্ধে চেকরা কাজান দখল করেছে, সেখান থেকে লুঠ করেছে চব্বিশ-হাজার পুড সোনা অর্থাৎ ষাটকোটি রুবলের চেয়েও বেশি যার দাম—রাষ্ট্রীয় স্বর্ণভাণ্ডারের অর্ধেকই চলে এসেছে চেকদের হাতে। ঘটনাটা এমনই অবিশ্বাস্য আর এমনই আশাতিরিক্ত যে এখনো ধারণা করে উঠতে পারা যাচ্ছে না এর গুরুত্ব কতো অপরিসীম!

সেই সোনা এখন আসছে সামারার দিকে। এখন পর্যন্ত অবশ্য কেউ নির্দিষ্টভাবে কোনো দাবি তোলেনি সোনাটার ওপর, তবে চেকরা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করেছে, জিনিসটা সংবিধান-পরিষদের সামারা কমিটির সদস্যদের হাতে তুলে দেয়া হোক। সামারার ব্যবসায়ী-সমাজ সোনাটার সদ্গতি সম্পর্কে যা-কিছু ভাববার নিজেরাই মনে-মনে ভেবে রেখেছে, প্রকাশ করেনি। বিজয়ী চেকদের প্রতি তাদের সুগভীর শ্রদ্ধা এখন একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

সম্বর্ধনা সভায় যথেষ্ট ভিড়, রীতিমত জমজমাট। চেক বাহিনীর কম্যাণ্ডার কাপ্তেন চেচেক্‌ হলেন আজকের দিনের বাহাদুর বীর, তাঁকে কেন্দ্র করেই আজ

মহিলাটির মুক্তা-গোলাপী কাঁধের ওপর, মঁসিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছেন এমনিভাবে সে হেসে উঠছে খিল্‌খিল্‌ করে। দু'জনই ফরাসী বোঝে, তবে বেশি তাড়াতাড়ি বললে নয়। বেচারী মসিয়ে জানো যে মরিয়া হয়ে দু'দুটো মোহিনীমায়ার ফাঁদে পড়ে গেছেন তা সুস্পষ্ট। কিন্তু তাই বলে, বিশ্রম্ভালাপে একটু ভাঁটা পড়লে তাঁর যে অসুবিধে হয় তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফেরেন নির্ভেজাল ময়দা-কলের ব্যবসায়ী ব্রিকিনের দিকে। ব্রিকিন সদ্য এসেছে ওম্‌স্ক্‌ থেকে। কিংবা দরকার পড়লে আতামান দুতভের দেদীপ্যমান কীর্তির উদ্দেশে স্বাস্থ্যপানও করে নিতে পারেন মসিয়ে জানো। সাইবেরীয় গম আর ওরেনবুর্গের মাখন-মাংসের দিকে মসিয়ের সবিশেষ আগ্রহ শ্বেতরক্ষী-আন্দোলনের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠারই পরিচয় দেয় : খাদ্যসংকটের সময় গভর্নমেণ্টকে পঞ্চাশ গাড়ি ময়দা অথবা অন্য খাদ্যসামগ্রী দেবার জন্য ফরাসী দূত যে-কোনে. মুহূর্তেই প্রস্তুত।.....তবে অনেক নিন্দুক ব্যক্তি আছে যারা প্রকাশ্যেই বলে বেড়ায়, যে-কোনো স্বাভাবিক গভর্নমেণ্ট যেমন করে থাকে তেমনিভাবে মঃ জানোকেও তাঁর দৌত্য-সংক্রান্ত কাগজপত্র হাজির করতে বললে ক্ষতি কী?.....কিন্তু এসব ঝামেলার চেয়ে মিত্রদের প্রতি আস্থা স্থাপন করার সুকৌশলী কর্মপন্থাই গভর্নমেণ্ট আরো বেশি পছন্দ করেন।

বিদেশী অতিথিদের মধ্যে আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বসেছিলেন টেবিলে—সিনর পিচ্চলোমিনি (এইটেই যে তাঁর আসল নাম তা তিনি হলপ করে বলতে পাবেন)। গায়ের রং তামাটে, চোখ দুটো সর্বদাই চঞ্চল। ঠিক স্পষ্টভাবে বলা যায় না, তবে তিনি নাকি ইতালীয় জাতি আর ইতালীয় জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। রুপালি ব্যাণ্ড্‌-বসানো আশমানী রঙের উর্দি গায়ে, কাঁধের ওপর ওঠা-নামা করছে জেনারেলদের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রতীকচিহ্ন। সামারায় উনি নাকি একটা বিশেষ ইতালীয় ব্যাটালিয়ন গড়ে তুলছেন। গভর্নমেণ্টও মাঝে মাঝে বিস্ময় প্রকাশ করেন : 'এখানে উনি ইতালীয় পাবেন কোথা থেকে ভগবান জানেন', কিন্তু তবু গভর্নমেণ্ট তাঁকে অর্থসাহায্য দিতে কসুর করেন না। হাজার হলেও, মিত্র যাঁরা তাঁরা মিত্রই।.. বুর্জোয়া সমাজে কিন্তু তাঁর দিকে কেউ বড়ো একটা নজরও দেয় না।

ভোজসভায় একমাত্র সরকারী প্রতিনিধি হলেন ডাঃ বুলাভিন আর সেমিয়ন সেমিয়নোভিচ গভিয়াদিনের মতো পার্টি-নিরপেক্ষ লোকেরা। গভিয়াদিন এখন সরকারী কর্মচারীমহলের উচ্চ শিখরে উঠেছেন, পালটা-গুপ্তচরবিভাগের তিনি এখন সহকারী হর্তাকর্তা। বলশেভিকদের উৎখাত করার সময় যে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্যম দেখা গিয়েছিল তা এখন নেই। সংবিধানী পরিষদ কমিটির সদস্যরা সবাই সোশালিস্ট-রিভলিউশনারী (এস্‌-আর) বাস্তুঘুঘু—বিপ্লবের 'সার্থক ফলাফল' ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা যে হৈচৈ শুরু করলেন তাতে অবশ্য শুধু চেকরাই ভুল বুঝেছিল, কারণ রুশদেশের ব্যাপারাদি সম্পর্কে তাদের নাড়ি-নক্ষত্র জ্ঞানের অভাব। প্রথম পর্যায়ে যখন রাতারাতি ক্ষমতাদখলের প্রশ্ন ছিল, আর প্রয়োজন ছিল চাষী মজুরদের ঠাণ্ডা রাখবার, এস্‌-আর সরকার তখন যেন সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেরিত প্রতিষ্ঠান। সামারার ব্যবসাদাররা পর্যন্ত এস্‌-আরদের গলায় গলা

বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ধোঁয়াটে দুর্বোধ্য ভাষায় ব্যবসাদাররা তাদের বক্তব্য উপস্থিত করলেন—একমাত্র সাইবেরিয়ার দিক থেকেই মুক্তি আসতে পারে, এই কথাটিই তাঁরা জোর দিয়ে বোঝালেন।...প্রত্যেকের বলা হয়ে যাবার পর আতামান দুতভ্‌কে সাধা-সাধি করা হল কিছু বলার জন্য। প্রথমে তিনি গররাজি ভাব দেখালেন। বললেন : "না, না, ভাই, আমি হলাম সৈনিক মানুষ, বক্তৃতা কেমন করে দিতে হয় তা কি আর আমি জানি!" কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিরাট দেহটা নিয়ে দাঁড়াতেই সবাই চুপ করে গেল। ফোঁস ফোঁস করে বলতে লাগলেন ঃ

"ভদ্রমহোদয়গণ! আমাদের মিত্ররাষ্ট্ররা যদি সাহায্য করেন—তো ভাল কথা! আর যদি না করেন—তাহলে আমরা নিজেরাই বলশেভিকদের সঙ্গে মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করে নেব।.....যতক্ষণ হাতে টাকা রয়েছে।...আশা করি আপনারাও এ-ব্যাপারে আমাদের ডানা কেটে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবেন না, ভদ্রমহোদয়গণ!"...

"আমাদের কাছ থেকে যা খুশি নিতে পারেন, আতামান, আমাদের কোনো আপশোস নেই!" আনন্দের আতিশয্যে চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রিকিন।

সভার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করা হল কালো কফি। বিদেশী ব্রান্ডি আর লিকারও আছে। অনেক দেরি হয়ে গেল। এক ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে এলেন দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ, কাউকে বিদায়-সম্ভাষণও জানালেন না।

মোটরগাড়ি থেকে নেমে সবে বাড়ির সামনের দরজাটা খুলেছেন এমন সময় একজন অফিসার দ্রুতবেগে ছুটে এল তাঁর দিকে ঃ

"মাফ করবেন,—আপনি কি ডাক্তার বুলাভিন?"

আগন্তুকের দিকে একবার চোখ তুলে চাইলেন দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ। রাস্তা অন্ধকার, শুধু লেফটেন্যান্ট-কর্নেলের কাঁধপটি দুটো নজরে পড়ল তাঁর। বিড়বিড় করে ডাক্তার বললেন ঃ

"হ্যাঁ, আমিই বুলাভিন।"

"খুব জরুরি কাজে আপনার কাছে এসেছি।...জানি এসময় আপনি কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না।...কিন্তু আমি তিন-তিনবার এসে আপনার খোঁজ না পেয়ে ফিরে গিয়েছি।"

"কাল এগারোটার পর মন্ত্রী-পরিষদের বাড়িতে যাবেন।"

"আজকেই যেমন করে হোক ব্যবস্থা করুন, আমার একান্ত অনুরোধ। রাতের স্টীমারেই চলে যেতে হবে আমাকে।"

জবাব দেওয়ার আগে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিচ। এই অপরিচিত লোকটার মধ্যে কেমন যেন একটা জবরদস্তির ভাব, আতঙ্ক জাগায় মনে। ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন।

"আমি আপনাকে আগেই জানিয়ে দিচ্ছি—যদি অর্থসাহায্যের জন্য এসে থাকেন, সেটি হবে না, সে ব্যাপারে আমার হাত নেই।"

"না, না, আমি কোনো সাহায্যের জন্য আসিনি।"

টেলিফোনের হাতলটা ঘুরিয়ে ডাক্তার নিচুগলায় একটা নম্বর চাইলেন—পাল্‌টা গোয়েন্দা-বিভাগের নম্বর, তারপর সেমিয়ন সেমিয়নোভিচ গভিয়াদিনকে ডাকলেন স্বয়ং এসে টেলিফোন ধরবার জন্য।

কপিং-পেন্সিল দিয়ে চিঠিটা লিখেছিল দাশা; হাতের লেখা ক্রমান্বয়ে মোটা-মোটা হয়ে উঠেছে, লাইনগুলোও ক্রমে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

"বাবা, জানি না আমার কী হবে শেষ পর্যন্ত।...আগেও যেমন সবকিছু অস্পষ্ট ছিল, এখনো তেমনি রয়ে গেল।...তুমিই একমাত্র লোক যাকে আমি লিখতে পারি। আমি এখন কাজানে আছি। হয়তো কালই রওনা হব, কিন্তু জানি না তোমার ওখানে পৌঁছুতে পারব কিনা। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। তুমিই বুঝবে আমার সব কথা। তুমি আমায় য করতে বলবে তাই করব।. .আমি যে বেঁচে রয়েছি সেইটেই আশ্চর্য।...আমার ওপর দিয়ে যে ঝড় গেছে তারপর আর না বাঁচলেই হয়তো ভালো হত।...যা কিছু ওরা আমায় শুনিয়েছে সব ডাহা মিথ্যে, ঘৃণ্য জোচ্চুরি।...এমন-কি নিকানর য়ুরেভিচ্‌ কুলিচকও ঐ পদের।.. আমি লোকটাকে বিশ্বাস করেছিলাম, মস্কোতে যাবার জন্য আমায় সাধাসাধি করেছিল—মেনে নিয়েছিলাম। (দেখা হলে সব কথা খুলেই বলব।) এমন-কি তার মতো লোকও গত-কাল আমায় এমনি ধরনের সব কথা বলেছে ঃ 'ওরা গুলি করে মানুষ মারছে, ডজনে-ডজনে পুঁতে ফেলছে মাটির নিচে...মানুষের জীবনের কী দাম? একটা বুলেটের সমান তো? সারা দুনিয়াটা ডুবে যাচ্ছে খুনখারাপিতে, আর তুমি কিনা ভাবছ তোমার সঙ্গে আমরা আদিখ্যেতা করতে যাব! আর কেউ হলে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আর কষ্ট করে আলাপ করতে যেত না—সোজা হুকুম করতো—বিছানায় চলো।' আমি তখন রুখে দাঁড়ালাম, সত্যি সত্যিই রুখে দাঁড়ালাম বাবা।...এক গেলাস মদ গিলে আমায় নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করা হবে এ আমি সহ্যও করতে পারব না। আমার যদি এতই অধঃপতন হয়ে থাকে তাহলে আর বাকি রইল কি? এইখানেই তাহলে ঘুচে যাবে সব—ফাঁসি দিয়ে মরলেই বা তখন ক্ষতি কী। যাতে সত্যিকারের কোনো কাজে লাগতে পারি এমন চেষ্টাও করেছি। রেডক্রসের নার্স হিসেবে ইয়ারোস্লাভ্‌লে তিনদিন দৌড়োদৌড়ি করেছিলাম গুলি-গোলার নিচে। রাতে যখন নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়েছি, হাত কাপড় সব রক্তে ভেসে গেছে। একবার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি কে যেন আমার স্কার্টটা তুলবার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলাম। একেবারে নেহাৎই ছোকরা একজন অফিসার। তার মুখটা আমি জীবনে ভুলব না! একেবারে বুনো জানোয়ার হয়ে গেছে তখন, কব্জি চেপে ধরে আমাকে সে ধাক্কা দিয়ে ফেলল নিচে, মুখে একটি কথাও নেই। শুয়োরটাকে তখন আমি গুলি করলাম, বাবা,—ওরই নিজের রিভলবার দিয়ে—কি করে কি ঘটে গেল তা এখন ভাবতেও পারি না।.. বোধ হয় পড়ে গিয়েছিল লোকটা, আমি তখন কিছুই দেখিনি, কিছু মনেও নেই আমার।...ছুটে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। আকাশটা লাল, শহরে আগুন লেগেছে, গোলা ফাটছে।

নামও পাওয়া বেছে। সুতরাং মস্কোতে থাকা এখন আমার পক্ষে বিপজ্জনক, ওর সঙ্গে ইয়ারোস্লাভ্‌লে চলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

"ওখানে সবই তৈরি ছিল আগে থেকে ঃ ফৌজ, মিলিশিয়া আর অস্ত্রাগারের বাছা-বাছা পদগুলো আগেই ওদের নিজেদের লোকেরা দখল করে বসেছিল।..... সন্ধ্যের দিকে আমরা পৌঁছলাম সেখানে। ভোর থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল বন্দুকের আওয়াজে।...জানলার কাছে ছুটে গেলাম।...সামনেই একটা উঠোন, উল্টোদিকে দেখা যাচ্ছে গ্যারেজঘরের ইটের দেয়াল আর আস্তাকুঁড়। ফটকের কাছে ঘেউ-ঘেউ করছে কয়েকটা কুকুর।...বন্দুকের শব্দ আর শোনা গেল না। সব নীরব নিস্তব্ধ। দূরে শুধু দু'একটা গুলির আওয়াজ আর মোটর বাইকের বিশ্রী ভট্‌ভট্‌ শব্দ।... একটুবাদেই সারা শহরের প্রত্যেকটা গির্জায় বাজতে লাগল ঘণ্টা। উঠোনের ফটক-গুলো খুলে গেল, একদল অফিসার ঢুকল ভেতরে। এর মধ্যেই তারা কাঁধপটি চড়িয়েছে। প্রত্যেকেরই উত্তেজিত মুখের ভাব, বন্দুক তড়পাচ্ছে। দাড়িগোঁপ-কামানো ধূসর জ্যাকেট-পরা একজন স্কাউটকে ওরা ঠেলে নিয়ে আসছে ভেতরে। লোকটার মাথায় টুপি নেই, গলাবন্ধ নেই, ওয়েস্টকোটেরও বোতাম খোলা। পিঠের ওপর ঘা কষাচ্ছিল সবাই মিলে। লোকটার মুখ তখন রাগে লাল হয়ে উঠেছে, চোখদুটো ঘুরছে এপাশ ওপাশ—দেখলেই মনে হয় সাংঘাতিক ক্ষেপে গেছে সে। দু'জন অফিসার তাকে চেপে ধরে গ্যারেজের পাশে দাঁড়িয়ে রইল, এর মধ্যে বাদ-বাকিরা একপাশে সরে গেল নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার জন্য। ঠিক সেই সময় কর্নেল পেরখুরভ্‌ বেরিয়ে এলেন খিড়কির দরজা দিয়ে। আগে তাঁকে কখনো দেখিনি—সশস্ত্র বিদ্রোহী ফৌজের তিনিই হলেন অধিকর্তা।..সবাই তাঁকে অভি-বাদন জানালো। লোকটার লোহার মতো শক্ত মন; দারুণ শক্তসমর্থ চেহারা। কালো চোখদুটো কোটরে-বসা, শীর্ণ মুখ, হাতে দস্তানা, আর বেতের ছড়ি। মুহূর্তে বুঝে ফেললাম—ধূসর কোর্তাপরা লোকটার মৃত্যু অনিবার্য। পেরখুরভ্‌ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলেন ভুরুর তলা দিয়ে। শয়তানের মতো দাঁত বের করছিলেন। লোকটা এদিকে সমানে গালাগাল দিচ্ছে, শাসাচ্ছে, কিসের যেন দাবি জানাচ্ছে। পেরখুরভ এবার চট্‌ করে মাথাটা তুলে কি একটা হুকুম দিয়েই ফিরে চললেন।. মোটা লোকটাকে যে দু'জন অফিসার ধরে রেখেছিল তারা লাফিয়ে সরে গেল। গায়ের কোর্তাটা ছিঁড়ে খুলে ফেলে লোকটা সেটাকে শূন্যে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল সামনে দাঁড়ানো অফিসারদের দিকে—একজনের একেবারে মুখের ওপর গিয়ে পড়ল সেটা। তারপর মুখ লাল করে প্রাণপণে গালিগালাজ করতে লাগল ওদের লক্ষ্য করে। বিশাল ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাতের মুঠো পাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, পরনে শুধু বোতামখোলা ওয়েস্ট্‌ কোটটা। গুলি ছোঁড়া হল ওর ওপর। সারা শরীরটা কাঁপিয়ে হাত দুটো তুলে এক-পা এগিয়েই সে পড়ে গেল মাটিতে। ভূমি-লুণ্ঠিত দেহের ওপর ওরা খানিকক্ষণ ধরে সমানে গুলি চালিয়ে গেল।..লোকটির নাম নাখিম্‌সন, বলশেভিক কমিসার। বাবা, এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চোখের ওপর একটা হত্যাকাণ্ড দেখলাম! যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না কী ভাবে

দাঁড়িনৌকায় করে। পুরো এক হপ্তা ধরে হেঁটেই চললাম যাতে কারুর চোখে না পড়ি। রাতগুলো আমরা খড়ের গাদার নিচে কাটাতাম—ঠাণ্ডা ছিল না তেমন এই যা রক্ষে। হেঁটে হেঁটে জুতো খসে পড়ার জোগাড়, পা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। কুলিচকঁ আমার জন্য কোথা থেকে এক জোড়া ফেল্ট বুট জোগাড় করে আনলো—বোধ হয় কারো বেড়ার খুঁটি থেকে সেরেফ উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল। একদিন, ঠিক মনে নেই কবে, একজন লোককে দেখলাম বার্চ ঝোপের মধ্যে। লোকটার পরনে ছেঁড়া আংরাখা, বাকলার জুতো আর জীর্ণ টুপি। ঠিক পাগলের মতো দেখতে, গম্ভীর মুখে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে সামনের দিকে, একটা মোটা লাঠি হাতে। লোকটা পেরখুরভ। ইনিও তাহলে পালিয়েছেন ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌ ছেড়ে। ওঁকে দেখে এমন ঘাবড়ে গেলাম যে সটান শুয়ে পড়লাম ঘাসের মধ্যে মুখ ঢেকে।. ..কস্ত্রোমার দিকে চলতে শুরু করলাম আবার। শহরতলীর একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাড়ির মালিক কুলিচকেরই বন্ধু। যতদিন না চেকরা কাজান দখল করে, ততদিন ওইখানেই রইলাম। নিকানর য়ুরেভিচ সব সময়ই নজর রাখতো আমার ওপর, যেন আমি কচি খুকি—যাক্‌ এজন্য আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞই।... ..কিন্তু কস্ত্রোমায় এসে ও আমার হীরাজহরতগুলো দেখে ফেলল। আমার হাতব্যাগের মধ্যে রুমালে বাঁধা ছিল জিনিসগুলো। হাতব্যাগটা ও এতদিন নিজেরই কোটের পকেটে বয়ে বয়ে এনেছে। কস্ত্রোমায় এসেই প্রথম মনে পড়ল ওগুলোর কথা। কুলিচককে সবই খুলে বললাম—বললাম যে নিজেকে আমার অপরাধী মনে হচ্ছে। কুলিচক কিন্তু এ সম্পর্কে রীতিমতো একটা দার্শনিক তত্ত্ব খাড়া করে দিল : মনে হয় না যে আমি অপরাধী, জীবনের ভাগ্য পরীক্ষায় আমি একটা বিশেষ সংখ্যা টেনেছি এইমাত্র। সেই সময় থেকেই আমার ওপর ওর মনোভাবটা কেমন যেন বদলে গেল; খুবই জটিল হয়ে উঠল ওর আচরণ। এমনিতেও আমাদের সম্পর্কের ওপর একটা প্রভাব পড়েছিল সেই ছোট গ্রাম্য বাড়িটার, সেখানে ওইরকম অনাবিল শান্তজীবন কাটিয়ে, দুধ, গুজ্‌বেরী আর রাস্‌বেরী খেয়ে বেশ একটা অন্যরকম ভাব এসে গিয়েছিল। মোটাও হতে আরম্ভ করেছিলাম আমি। একদিন, সূর্য ডোবার পর ছোট্ট বাগানটায় বসে ও আমাকে প্রেমের কথা শোনাতে লাগল—বলল যে ভালোবাসার জন্যই নাকি আমি জন্মেছি, তারপর চুমুও খেল আমার হাতে। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ওর নিশ্চিত ধারণা হয়েছে আমি আর কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সঁপে দেব ওর হাতে, অ্যাকেসিয়া গাছের নিচে ওই বেঞ্চিটার ওপর।.....এতসব ঘটনার পরও, বাবা ভাবো তো একবার! আর বেশি ব্যাখ্যা করে না বুঝিয়ে আমি শুধু বললাম তাকে : 'এ ভাল কথা নয়—আমি যে ইভান ইলিয়িচকে ভালোবাসি।' আর আমি মিথ্যেও বলিনি বাবা।. .."

ইভান ইলিয়িচ রুমাল বের করে মুখ মুছল, চোখটাও মুছল, তারপর আবার পড়তে শুরু করল :

"আমি মিথ্যে বলিনি।.... ইভান ইলিয়িচকে আমি ভুলতে পারিনি। ওর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকে যায়নি। তুমি তো সে ঘটনা নিশ্চয়ই জানো, তাই না

জ্বলছে। ঘরটায় আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই, শুধু একটা পেরেকের ওপর ঝুলছে দাশার স্কার্ট, আর আছে একটা লোহার খাট, বিছানার চাদরটা দেয়ালের দিকে অবিন্যস্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

"তুমি কি এখানে একা নাকি?" ফিস্‌ফিসিয়ে বলল তেলেগিন : "তোমার চিঠিটা পড়েছি।"

চারদিকটা দেখল একবার। একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখে, ঠোঁট কাঁপছে। জবাব না দিয়ে দাশা ওকে খোলা জানলার কাছে টেনে নিয়ে গেল।

"পালাও! এক্ষুনি পালাও! পাগল হয়ে গেলে নাকি?"

জানলা দিয়ে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উঠোন। অনেকগুলো বাড়ির ছাদ আর ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে নদীর ধার পর্যন্ত, এবং আরো নিচে দেখা যাচ্ছে ঘাট-সিঁড়ির আলো। ভলগার দিক থেকে একটা ভিজে বাতাস আসছে, তাতে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ।.....দাশা দাঁড়িয়েছিল ওর সারা দেহটা দিয়ে ইভান ইলিয়িচকে ছুঁয়ে। ভয়ার্ত মুখখানা উঁচুতে তোলা, ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে গেছে।.....

"ক্ষমা করো আমায় ইভান, আর দাঁড়িও না, পালাও!" —তেলেগিনের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল ও।

কেমন করে তেলেগিন নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে যাবে? ব্যবধানের প্রকাণ্ড প্রাচীরটা সবেমাত্র সরে গেছে। হাজারবার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আজ সে দেখা পেয়েছে সেই মুখখানার যার কোনো তুলনাই সে খুঁজে পায় না সারা পৃথিবীতে। ঝুঁকে পড়ে ও চুমু খেল দাশাকে।

দাশার ঠান্ডা দুটি ঠোঁটে কোনো সাড়া জাগল না, শুধু একবার কেঁপে উঠল সামান্য।

"আমি তোমারই আছি।.....তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারো! সুদিন এলে আবার আমাদের দেখা হবে, ইভান।.....এখন তুমি যাও, পালাও আমার মাথা খাও!"

জীবনে কোনোদিন তেলেগিন ওকে এত ভালোবাসেনি, এমনকি ক্রিমিয়ার সেই আনন্দময় দিনগুলোতেও নয়! প্রাণপণে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখল ও, তাকিয়ে রইল শুধু মুখের দিকে।

"আমার সঙ্গে চলো, দাশা! শোনো! আমি তোমার জন্য নদীর ঘাটে অপেক্ষা করব—কাল রাতে....."

মাথা নেড়ে একটা অস্ফুট ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠল দাশা :

"না, না।.....সে আমি পারব না!"

"পারবে না?"

"সে হয় না ইভান!"

"বেশ। তাহলে আমিও থেকে গেলাম।"

জানলা থেকে সরে এসে তেলেগিন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।.....ডুকরে কেঁদে উঠল দাশা।

চেপে ধরল দাশা।...বাইরে কোনো শব্দ নেই।...ঠিক এমনি সময় দেখা গেল ছায়ার ভেতর থেকে দুটো মূর্তি বেরিয়ে যাচ্ছে। উঠোনটার ওপর দিয়ে কোণাকুণি দৌড়লো তারা মাথা নিচু করে। দাশা আর্তনাদ করে উঠল, এমন তীক্ষ্ন আর ভয়ানক সে আর্তনাদ যে সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি দুটো বোঁ করে ঘুরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্চয়ই ওরা দাশার জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ঠিক সেই সময় দাশাও দেখল, উঠোনের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কাঠের ছাদের আল্‌সে বেয়ে উঠছে তেলেগিন।

বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দাশা, কয়েক মুহূর্ত অমনিই পড়ে রইল নিশ্চলভাবে। তারপরেই আবার ধাঁ করে উঠে পায়ের একপাটি চটি কোনো-রকমে হাতড়ে খুঁজে বের করেই ও ছুটে চলে গেল খাবার-ঘরের দিকে।

সেখানে দেখে ডাক্তার আর গভিয়াদিন রীতিমতো মারমুখী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে —দাশার বাবা ধরে আছেন একটা ছোট নিকেল-করা পিস্তল, আর তাঁর বন্ধু তড়পাচ্ছে একটা পল্টনী রিভলবার। একসঙ্গে দু'জনেই বলে উঠলেন "কী ব্যাপার?" হাতের মুঠো পাকিয়ে দাশা কটমট করে চেয়ে রইল গভিয়াদিনের লাল-লাল চোখদুটোর দিকে।

"হতভাগা বদমায়েস!"—গভিয়াদিনের ফ্যাকাশে নাকের নিচে হাতের মুঠি উঁচিয়ে বলল দাশা: "তোমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে! গুলি খেয়ে মরবে, মনে থাকে যেন সে কথা, বদমায়েস কোথাকার!"

গভিয়াদিনের লম্বা মুখটা আরো কুঁচকে যায়, আরো ফ্যাকাশে হয়ে যায়, নিষ্প্রাণ হয়ে ঝুলে পড়ে ওর দাড়ি। ডাক্তার ইশারা করলেন, কিন্তু রাগে তখন থর-থর করে কাঁপতে শুরু করেছে গভিয়াদিন।

"আমার দিকে অন্তত মুঠি পাকিও না, দারিয়া দ্‌মিত্রেভনা।...একবার যে তুমি আমায় মেরেছিলে সে কথা আমি কখনো ভুলিনি—জুতোই মেরেছিলে বোধ-হয়, যদ্দুর মনে পড়ে।...মুঠো নামাও...আমাকে যে আর একটু বেশি সম্মান করা উচিত তোমার, সে কথাও মোটামুটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।"

"সেমিয়ন সেমিয়নোভিচ, সময় নষ্ট করছ তুমি", বাধা দিয়ে বললেন ডাক্তার, তখনো ইশারা করছেন, তবে দাশা যাতে তা না দেখতে পায় সে-চেষ্টাও আছে।

"ঘাবড়াবেন না দ্‌মিত্রি স্তেপানোভিভচ্‌, তেলেগিনের নিস্তার নেই আমাদের হাত থেকে....."

দাশা চীৎকার করে ধেয়ে গেল ওর দিকে।

"আস্পর্ধা দেখানো হচ্ছে!" (সঙ্গে সঙ্গে গভিয়াদিন আশ্রয় নিল চেয়ারের আড়ালে)।

"আস্পর্ধা আছে কি নেই তা দেখিয়ে দেব।.....আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি দারিয়া দ্‌মিত্রেভনা, জন-নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষ নজর রয়েছে তোমার ওপর, হ্যাঁ ব্যক্তিগতভাবেই।.....আজকের এই ঘটনার পর কিন্তু আমি আর কিছু ভরসা দিতে পারছি না, তোমার মুস্কিল হতে পারে—সে কথা জানিয়ে রাখলাম!"

"তোর ওই বলশেভিকদের আর তোর ওই তেলেগিনটাকে ফাঁসিকাঠে লটকানো উচিত! টেলিগ্রাফের খাম্বায় ঝুলিয়ে মারা উচিত!...জ্যান্ত ছাল ছাড়ানো উচিত হতভাগাগুলোর!"

কিন্তু দাশার মেজাজ ওর বাপের চেয়েও চড়া। ফ্যাকাশে মুখে সিধে বাপের সামনে এগিয়ে গিয়ে ওর সেই অসহ্য চক্‌চকে চোখ দুটো তাঁর মুখের ওপর স্থির করে রাখল।

"তুমি একটি হন্যে কুকুর!" চিৎকার করে উঠল দাশা: "তোমার ঐ চেঁচানি বন্ধ করো! আমার বাবা তো নও তুমি—তুমি হলে একটা উন্মাদ, ইতর!"

চিঠির ছেঁড়া-টুকরোগুলো ওর বাপের মুখের ওপর ছুড়ে দিল।

সেই রাতেই, ঠিক ভোর হবার মুখে, ডাক্তারের ডাক পড়ল টেলিফোনে।

একটা উদাসীন রুক্ষ গলায় কে যেন তাঁকে জানালো:

"আপনার জন্য খবর আছে: ময়দার আড়তের পেছনে সামোলেৎস্কায়া ঘাটে দুটো মৃতদেহ পাওয়া গেছে, লাশদুটো সনাক্ত হয়েছে: একজন হলেন পাল্টা-গোয়েন্দা-বিভাগের সহকারী অধিকর্তা গভিয়াদিন, আরেকজন তাঁর সহকারী।"

রিসিভারটা উল্টো করে ঝোলালেন ডাক্তার দ্‌মিত্রি স্তেপানেভিচ। তারপর একটু দম নেবার জন্য মুখটা হাঁ করতেই সাংঘাতিক হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে গেলেন টেলিফোনটার পাশে।

ভূতে-পাওয়ার মতো এগিয়ে চলেছেন ফৌজের কাঁধে ভর করে, চেঁচাতে চেঁচাতে গলার স্বর বিকৃত করে ফেলেছেন।

এরপর যা ঘটবার তাই ঘটল। পরাজিত ভলান্টিয়ার বাহিনী অনবরত পিছু হটলেও এমন সাংঘাতিক কড়াকড়ি শৃঙ্খলা কায়েম করা হল এখন, যে প্রতি-পদেই তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করল একটি একক ইচ্ছাশক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। যান্ত্রিক বশ্যতায় তারা গোঁয়ারের মতো আঁকড়ে রইল প্রতিটি মাটির ঢিবি যেখান থেকে লড়া যায়, আর ধূর্ত কৌশলের সঙ্গে খুঁজে বের করতে লাগল শত্রুর দুর্বলতম ঊরুস্থল। তারপর পঁচিশে জুলাই তারিখে তিখোরেৎস্কায়া থেকে তিরিশ মাইল দূরে ভিসেল্‌কির কাছাকাছি এলাকায় শুরু হল দশম দিনের শেষ লড়াই; সে-লড়াইয়ে হেস্তনেস্ত হয়ে গেল সবকিছু।

আগের কয়েকদিন যেমন ছিল তার চেয়েও সেদিন শোচনীয় হয়ে পড়েছে দ্রজ্‌দভস্কি আর কাজানোভিচের পল্টনের অবস্থা। লাল সৈন্যরা শত্রুর পশ্চাদ্‌-ভাগে ঢুকে পড়েছে। বেলায়া গ্লিনাতে বলশেভিকদের যে দশা হয়েছিল এখানেও ঠিক তেমনিভাবেই ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়ে গেল ভলান্টিয়াররা। কিন্তু ন'দিন আগে সরোকিনের ফৌজ যা ছিল আজ কি আর তার কিছু অবশিষ্ট আছে! শিথিল হয়ে গেছে সেই সাগ্রহ তৎপরতা, শত্রুর একরোখা প্রতিরোধের ফলে সেপাইরা আর ভরসা পাচ্ছে না, ওদের মনে ঢুকেছে সন্দেহ আর হতাশা—কবে যে জয় হবে, কবে বিশ্রাম পাবে, কে জানে!

বেলা তিনটের পরই সরোকিনের ফৌজ ছুটল সারা রণাঙ্গন জুড়ে একসঙ্গে হামলা চালাতে। সংঘর্ষ হল প্রচণ্ড। দিগ্‌বলয়ের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে গর্জাতে লাগল কামান। পাশাপাশি কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে এগোলো সৈন্যরা, আড়াল নেবার কোনো চেষ্টাই করল না তারা। উত্তেজনাময় অধীরতা আর উন্মাদনা যেন এবার ফেটে পড়ার জোগাড়।

কিন্তু সরোকিনের ফৌজের সর্বনাশের এই তো সবে শুরু। আগুন আর ইস্পাতের অভ্যর্থনা জুটল প্রথম আক্রমণকারী সৈন্যসারিটার ভাগ্যে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তারা। পরের সারিগুলোও এক-এক করে শত্রুর গোলাবর্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, অসংখ্য হতাহত আর মরণোন্মুখ সৈনিকের ভিড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল তারা। তারপরেই হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার ঘটল যা আগে থাকতে আন্দাজ করাও যায়নি, বোঝাও যায়নি, আর যা রোখাও সম্ভবপর ছিল না—সৈনিকদের তৎপরতা যেন নিমেষের মধ্যে একেবারে ঝিমিয়ে পড়ল। লড়াইয়ের একফোঁটা উৎসাহ নেই, শক্তিও নেই তখন।

স্থির ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে-করে আঘাত হানতে লাগল শত্রু, ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে আরো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল তারা।...উত্তর দিক থেকে মারকভের ইউনিটগুলো, অশ্বারোহী রেজিমেন্ট একটা, আর দক্ষিণ দিক থেকে এরদেলির ঘোড়সওয়ার বাহিনী একযোগে লাল সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চলল। শ্বেতরক্ষী সাঁজোয়া গাড়িগুলো বিধ্বংসী গুলিগোলা ছুঁড়তে

আর নয়তো অন্য কোনো উপায়ে। অমূল্য ক্রিমিয়া-উপদ্বীপটিকে তাহারা কখনোই হাতছাড়া করিতে রাজি নয়। তাহা ছাড়া, এই রাস্তাটিকে পুরাপুরি ব্যবহার করিতে হইলে প্রয়োজন প্রধান রেলপথগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, আর যেহেতু এই রেলপথ এবং কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলির জন্য জার্মানি হইতে কয়লা আমদানি করা অসম্ভব, তাই জার্মানির পক্ষে অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন হইল দন কয়লাখনি-এলাকার বড়ো বড়ো খনিগুলিকেও আয়ত্তে রাখা! এই সমস্তই জার্মানি হাসিল করিতে চায় যে-কোনো সম্ভাব্য উপায়ে।....."

১০ই জুন তারিখে যখন জার্মান চরমপত্রটি মস্কোতে এসে পৌঁছুল, লেনিনও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দ্রুততার সঙ্গে এই জটিল সমস্যার সমাধান করে ফেললেন—অথচ অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল এ সমস্যার বুঝি আর সমাধান নেই। সিদ্ধান্ত হল : জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করা বর্তমান অবস্থায় যেমন অসম্ভব, ওদের হাতে নৌবহর তুলে দেওয়াও তেমনি একই রকম অচিন্তনীয়।

সোবিয়েত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে মস্কো থেকে কমরেড ভাখ্‌রামিয়েভ্‌-কে পাঠানো হল নভোরোসিস্ক্‌-এ। কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের প্রতিনিধি ও কম্যান্ডারদের এক সভায় তিনি ঘোষণা করলেন, জার্মান চরমপত্রের একমাত্র বলশেভিক জবাব যা হতে পারে তা হচ্ছে : কৃষ্ণসাগরীয় রণতরীবহরের কাছে পিপ্‌লস্‌-কমিসারদের পরিষদ খোলাখুলি বেতারবার্তা পাঠাক্‌ সেবাস্তোপোলের দিকে রওনা হয়ে জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করার হুকুম জানিয়ে। কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর কিন্তু এ হুকুম মানতে রাজি হল না, ওরা ঠিক করল নভোরোসিস্ক্‌-এর সমুদ্রপথে বরং জাহাজগুলোকে ওরা ডুবিয়ে দেবে।

দুটো ড্রেড্‌নট্‌, পনেরোটা ডেস্ট্রয়ার, কয়েকটা সাবমেরিন আর ছোটখাট সহগামী জাহাজ নিয়ে সোবিয়েত নৌবহর নভোরোসিস্ক্‌ ছেড়ে খানিকটা দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিল—ব্রেস্ত্‌-লিতভ্‌স্ক্‌ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা হাত-পা-বাঁধা হয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

জাহাজের প্রতিনিধিরা ডাঙায় এসে গম্ভীরভাবে শুনল ভাখ্‌রামিয়েভের বক্তব্য—ওদের কানে তার প্রস্তাবটা মনে হল আত্মহত্যারই সামিল। কিন্তু ওরাও খুঁজে পেল না আর কোনো রাস্তা, কারণ নৌবহরের নেই তেল, নেই কয়লা। এদিকে মস্কোর সামনে পাঁয়তারা কষছে জার্মানরা, পূব দিক থেকে এগিয়ে আসছেন দেনিকিন, জার্মান ইউ-বোটের পেরিস্কোপগুলোকে এর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে জাহাজী রাস্তার ওপর দিয়ে ফেনার দাগ কেটে-কেটে ঘুরে বেড়াতে, নীল আকাশের গায়ে ঝক্‌মক্‌ করে উঠছে জার্মান বোমারুবিমান। প্রতিনিধিরা অনেকক্ষণ ধরে গরম-গরম তর্ক করল।.... .একটিমাত্র পথই খোলা আছে : জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেয়া।.. এমন একটা ভয়ানক সিদ্ধান্তের মুখোমুখি এসে অবশেষে প্রতিনিধিরা সাব্যস্ত করল, নৌবহরের ভাগ্য ছেড়ে দেয়া হোক্‌ সমস্ত নাবিকের ভোটের ওপর।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভা হতে লাগল নভোরোসিস্ক্‌-এর জাহাজ-ঘাটায়। বিরাট বিরাট ইস্পাত-ধ্বংসের দৈত্য নোঙর করে আছে সেখানে—আছে ড্রেড্‌নট্‌ 'ভলিয়া'

(স্বাধীনতা), 'স্ভবোদ্‌নায়া রসিয়া' (মুক্ত রাশিয়া), আছে দ্রুতগামী ডেস্ট্রয়ার যারা লড়াইয়ে নাম কিনেছে, আর অসংখ্য মাস্তুল ও বুরুজের জটিল অরণ্য রয়েছে জাহাজ-ঘাটার শীর্ষে, মানুষের ভিড়ের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে।

একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নাবিকরা। ওরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে বিপ্লবের এই সব অজেয় সম্পত্তি, জাহাজীদের এই সব ভাসমান স্বদেশভূমি কখনো সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে একটিও গোলা না ছুঁড়ে, একটুও রুখে না দাঁড়িয়ে।

কৃষ্ণসাগরের নাবিকেরা অত নির্বিবাদে আত্মহত্যার প্রস্তাব মেনে নেবার মানুষ নয়। ভয়ানক কড়া-কড়া কথা বলতে শুরু করল তারা আর আক্রোশে বুক চাপড়াতে লাগল; কতো অসংখ্য উল্কি-আঁকা বুক থেকে ছিঁড়ে পড়ল তক্‌তি, পায়ের নিচে পিষ্ট হল ফিতে-লাগানো জাহাজী টুপি।....

জাহাজী, যুদ্ধফেরত সেপাই আর সমুদ্রতীরের নানা ধরনের বাসিন্দা এসে ভিড় জমাতে থাকে জাহাজঘাটায়, সূর্য ওঠার সময় থেকে সারাদিন তারা কাটিয়ে দেয় দারুণ উত্তেজনায়, সে ভীড় লেগে থাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, যখন ওই অভিশপ্ত সাগরের বেগুনি জলের ম্লানিমা মুমূর্ষু সূর্যের কিরণে একেবারে টকটকে লাল হয়ে ওঠে।—ও সমুদ্রকে শাসনের অধিকার হারিয়েছে তারা।

কম্যাণ্ডার আর জাহাজের অফিসারদের মতের মিল হয় না; বেশির ভাগই মনে-মনে সেবাস্তোপোল চলে যাওয়ার পক্ষপাতী, তাদের গোপন ইচ্ছা জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করার; কিন্তু এদিকে একটা সংখ্যালঘু দলও আছে যারা ভালরকমই বোঝে যে আসন্ন এই ভয়ংকর বিপর্যয়টাকে ঠেকাবার কোনো উপায় নেই, বোঝে যে ভবিষ্যতের পক্ষে এ ঘটনার তাৎপর্যও অপরিসীম। রণতরী 'কার্চ'-এর অধিনায়ক সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট কুকেল হল এই দলের নেতা। এবা বলে :

"আমাদের আত্মহত্যার পথই বেছে নিতে হবে। সামরিকভাবে তাই কৃষ্ণ-সাগর নৌবহরের ইতিহাস আমাদের রুদ্ধ করে রাখতে হবে, এর প্রত্যেকটি পাতা অকলঙ্কিত রেখে. .."

সগর্জন সমুদ্র-ঝড়ের মতো চোখ-ধাঁধানো এই সব বিশাল জনসভায় হযতো সকালেব দিকে এক ধরনের প্রস্তাব পাশ করা হল, বিকেলেব দিকে পাশ করা হল অন্যরকম। সবচেয়ে তারিফ হয সেই সব বক্তার যারা মাটিতে টুপি ছুঁড়ে ফেলে সচীৎকারে ঘোষণা করে :

"কমরেডস্‌, ওই মস্কো-ওয়ালারা গোল্লায় যাক্‌! ওরা যদি পারে তো নিজেরাই এসে ডোবাক্‌ না কেন জাহাজ! আমরা কিন্তু জাহাজ ছেড়ে দেব না। জার্মানদের সঙ্গে লড়ব শেষ অবধি....."

"হুররে, হুররে"—বজ্রধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে ওঠে সাবা জাহাজঘাটা।

বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে যখন চরমপত্রের শর্তকাল শেষ হবার চারদিন আগে একাতেরিনোদার থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে দু'জন প্রতিনিধি : একজন হল রুবিন—কৃষ্ণ-সাগর প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি, এবং আরেকজন হল ফৌজী প্রতিনিধি পেরেবিনোস্‌—ভয়ংকর চেহারার একটি দানববিশেষ, কোমরে

নীরবতাটুকু ভেঙে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল 'ভলিয়া'র চাকার দাঁড়. দু'পাশ থেকে ওপরে উঠে যেতে লাগল জল-ভেজা শিকল আর পলিমাটি-মাখা নোঙরগুলো। গলুইয়ের দিকটা ঘুরতে শুরু করল, শহরের সূর্যস্নাত বাড়ির ছাদগুলোকে পেছনে ফেলে গতিশীল হয়ে উঠলো অসংখ্য চিমনি আর দাঁড়-দড়ার জাল।

"ওরা যে যাচ্ছে!.....জার্মানদের কাছে চলল!.....উঃ, জাহাজী ভাইসব.... শেষটায় জার্মানদের কাছে চলল নিজেদের সঁপে দেবার জন্য!...এ কী করলে তোমরা?"

'কার্চ'-এর কাপ্তেন এসে দাঁড়ালেন বুরুজের মাথায়, চটা-ওঠা প্রকাণ্ড নাকটা জেগে আছে রোদ-পোড়া মুখটার ওপর। চোখ কুঁচকে উনি 'ভলিয়া'র গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। বুরুজের ওপর ঝুঁকে পড়ে হুকুম করলেন :

"সিগ্‌ন্যাল দেখাও!"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ"—সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল নাবিকরা, সিগ্‌ন্যাল পতাকার বাক্সটার দিকে ছুটে গেল ওরা। 'কার্চ'-এর মাস্তুলের ওপর পত্‌পত্‌ করে উড়তে লাগল ছোট ছোট নিশান, বিভিন্নভাবে সাজিয়ে ওদের মারফত সংকেত জানানো হল :

"যে-সব জাহাজ সেবাস্তোপোলে যাচ্ছে রাশিয়ার সেই বিশ্বাসঘাতকদের আমরা ধিক্কার জানাই!"

সংকেত-বার্তাটা যেন লক্ষ্যই করেনি এমনি ভাব করে সংকেতের কোনো জবাবই দিল না 'ভলিয়া'। পরিত্যক্ত, অবমানিত অবস্থায় আর-আর সব সাচ্চা ইমানদার রণতরীর পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে। নাবিকরা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : "ওরা আমাদের সিগ্‌ন্যাল দেখেছে!" 'ভলিয়া'র পাছ-গম্বুজের ওপর যে প্রকাণ্ড কামান দুটো রয়েছে তাদের মুখ উঁচু হয়ে উঠল, গম্বুজটা ঘুরল 'কার্চ' রণতরীর দিকে। রেলিংটা শক্ত হাতে চেপে 'কার্চে'র কাপ্তেন তাঁর প্রকাণ্ড নাকটা বাগিয়ে রইলেন আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায়। কিন্তু কামানগুলো শুধু একবার ঘুরে গিয়েই মুখ নিচু করল।

ভাসমান ঘাটসিঁড়ির পাশ কাটিয়ে 'ভলিয়া' ক্রমেই জোরে ছুটতে লাগল। অল্পক্ষণ বাদেই দিগ্‌বলয়ের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল তার সগর্ব রেখাকৃতি—বহু বছর পরে ভলিয়াকে আবার দেখা গিয়েছিল সেই সুদূর বিজার্তা বন্দরে—মরচে-ধরা অবস্থায়, নিরস্ত্র, চিরদিনের মতো ধিক্কৃত।

নৌবহরের প্রধান অধিনায়ক তিখ্‌মেনেভ দাবি করেছিলেন পিপ্‌লস্‌ কমিসার পরিষদের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে, আর তাই ড্রেডনট 'ভলিয়া' ও অন্য ছ'টি ডেস্ট্রয়ারও সেবাস্তোপোলে গিয়ে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। 'ভলিয়া'র সমস্ত অফিসার আর নাবিককে কাজ ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দেয়া হল।

জাহাজীরা ফিরে আসে যার-যার বাড়িতে আর জন্মভূমিতে। তারা অবশ্য বলে যে নিজেদের জাহাজ ডোবাবার ব্যাপারে তারা কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারেনি, কিন্তু আসল কারণ হল, লালফৌজের চল্লিশ হাজার সেপাই নভোরোসিস্ক্‌-এর সমস্ত মানুষকে কচুকাটা করবে বলে শাসাবার ফলে ওরা ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠেছিল।

পর্যন্ত একটি প্রাণীও নেই, সে জাহাজগুলোকে বার-দরিয়ার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন স্টীমারও নেই একটা।

'কার্চ'-এর কাপ্তেন জবাব দিলেন : "মিডশিপম্যান আন্সেন্স্কি, দায়িত্ব হল আমাদের, যেমন করে হোক জাহাজ আমরা ডুবিয়ে দেবই।"

মিডশিপম্যান আন্সেন্স্কি মাথা নাড়লেন। অল্প কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপরেই আন্সেন্স্কি আবার ডাঙ্গায় ফিরে গেলেন। সূর্য যখন মাঝ-আকাশে একেবারে উপসাগরের মাথায়, 'লেফটেন্যান্ট শেস্তাকভ্' তখন ভাসমান ঘাটসিঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে 'ক্যাপ্টেন বারানভ'-কে পেছনে বেঁধে নিয়ে—চলেছে বার-দরিয়ায় যেখানে তার আত্মনিমজ্জনের কথা। ডেস্ট্রয়ারগুলো মাস্তুলের ওপর তুলল সংকেত-পতাকা : "জলের নিচে তলিয়ে গেলেও আমরা আত্মসমর্পণ করিনি।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল ভোরের কুয়াশার আড়ালে। এখন মনে হচ্ছে সব জাহাজগুলোই বুঝি জনশূন্য, পরিত্যক্ত। ইস্পাতের পাহাড় 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া'র মাথার ওপর উড়ছে গাং-চিলের দল। 'কার্চ'-এর চিমনি থেকে উঠছে ধোঁয়া। এত সকালেও ডকের দিকে জমেছে বিস্তর মানুষের ভিড়। ঘাটসিঁড়ির ওপর ছুটোছুটি করছে অসংখ্য মূর্তি, মনে হচ্ছে কালো কালো মাছি বুঝি থিক্ থিক্ করছে সেখানে। জাহাজগুলোর আশেপাশেও অসম্ভব রকম ঠেলাঠেলি ভিড়, এ ওর কাঁধ বেয়ে উঠছে, দু'চারজন পড়েও যাচ্ছে জলে।

জাহাজের সিঁড়িপথের মুখে পাহারায় দাঁড়িয়েছিল সেমিয়ন ক্রাসিল্নিকভ। পাঁচটা বাজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাটো মতো একজন লোক দুম্দাম করে উঠে এল সিঁড়িপথের ওপর, দারুণ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে লোকটি। পরনের কালো রীফার জ্যাকেটটার ওপর কাঁধপটি-টটিও কিছু নেই। লাল মুখটার ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে আর ছোট-ছোট স্রোতের আকারে বেয়ে পড়ছে কোঁচকানো খুদে মুখটার দু'পাশ দিয়ে।

"সিনিয়র লেফটেন্যান্ট কুকেল কি এখানে আছেন?" সেমিয়নকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটি—বেয়নেট তুলে রাস্তা আটকে রেখেছে খালাসীটা, তাই তার দিকে জ্বলজ্বলে নীল গোল-গোল চোখে তাকিয়ে রইল সে। বুক আর দু'পাশের পকেট হাতড়ে অবশেষে একটা পরিচয়-পত্র বের করল, কেন্দ্রীয় সোবিয়েত কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে কমরেড শাখভের নামে পরিচয়পত্রটা। গম্ভীরমুখে বেয়নেট নামিয়ে নিল নাবিক।

"রাস্তা ছাড়ো, কমরেড শাখভ!"

কুকেল এগিয়ে এলেন দেখা করতে। এসেই বলতে শুরু করলেন পরিস্থিতির কথা। তার মতে অবস্থা এখন হতাশাজনকই বলা যায়। আস্তে আস্তে অনেক কথাই বললেন তিনি। অধৈর্যভাবে চারদিকটা দেখে নিয়ে বলল শাখভ :

"বাজে কথা বলছেন, এর আগে এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় আমরা অনেকবার পড়েছি! নাবিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, চমৎকার মনোবল রয়েছে

ওদের।...আমি আপনাকে টাগ-বোট এনে দেব, আর আপনার যা-যা প্রয়োজন সবই দেব।.....একটা সভা ডাকতে হবে।.....শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে, ঘাবড়াবেন না।..."

একটা মোটর-লঞ্চ চেয়ে নিয়ে শাখভ্ 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া'তে গিয়ে হাজির হল। তারপর একে একে সমস্ত জাহাজগুলো ও ঘুরে ঘুরে দেখল। সেমিয়ন দেখতে পাচ্ছিল, লোকটির ছোট দেহ কখনো সওদাগরী জাহাজের মইয়ের ওপর ঝুলছে, কখনো লাফিয়ে ডাঙায় নেমে ভিড়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠছে লোকে। এক সময় হাজার কণ্ঠে গর্জন উঠল : "হুররে!"

লস্কর-বোঝাই হয়ে কয়েকটা আট-দাঁড়ি নৌকো জেটির দিক থেকে ছুটে এল জাহাজঘাটের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা ছোট মরচে-ধরা স্টীমারের কাছে; একটু বাদেই ছোট স্টীমারটার চিমনি থেকে বগ্‌বগ্ করে বেরুতে লাগল মেঘের মতো ঘন ধোঁয়া; নোঙর তুলে স্টীমারটা এগিয়ে গেল 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া' জাহাজের কাছে। একটা স্কুনারও পাল তুলল। 'লেফ্‌টেন্যান্ট শেস্তাকভ্' এর মধ্যে ফিরে এসেছে আরেকটা ডেস্ট্রয়ারকে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য।

ন'টা বাজতে বাজতেই ভিড়টা এগোতে শুরু করল 'কার্চ' জাহাজের সিঁড়ি-মুখের দিকে। সাধারণভাবে মনোভাবটা যেন আরো খারাপের দিকেই মোড় নিয়েছে। কনুই ঠেলে-ঠেলে রাস্তা করে জাহাজের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে বিদ্‌কুটে চেহারার সব গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক, ওদের প্রত্যেকের হাতে ভাপ-সেদ্ধ সসেজ, রুটি আর বেকনের চর্বি। বিশ্রী হাসি হেসে ওরা জাহাজীদের দিকে চোখ মটকাতে লাগল, মদের বোতল তুলে তুলে দেখাতে লাগল ওদের। কুকেল হুকুম দিলেন সিঁড়ি তুলে ফেলতে, এখুনি রওনা দিতে হবে। প্রলোভন এড়িয়ে 'কার্চ্' ছুটল পোতাশ্রয়ের একেবারে মাঝামাঝি জায়গায়, সেখান থেকে সে লক্ষ্য করতে লাগল ডেস্ট্রয়ারগুলোকে কেমন করে বেঁধে টেনে-টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মরচে-ধরা স্টীমারটাকে দেখা যাচ্ছে একটা শূন্য নৌকোর খোলের মতো। অনেক ধোঁয়া ছেড়ে ফোঁস্-ফোঁস্ করে অবশেষে 'স্ভবোদ্নায়া রসিয়া'কে নড়াতে পারল সে. রাজকীয় ভঙ্গিতে ডেস্ট্রয়ারটা ভেসে চলল অগণিত দর্শকের সামনে দিয়ে। যেন শবযাত্রা চলেছে এমনিভাবে অনেক লোক মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নিল। প্রকাণ্ডকায় জাহাজটা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে জাহাজঘাটের বীম, ফটক আর পোতাশ্রয় পার হয়ে। তারপর সেটা গিয়ে পড়ল বার-দরিয়ার জাহাজী-পথে। সবাই ভাবছে এই বুঝি মাথার ওপর আবার এসে হানা দেয় জার্মান বিমান, কিন্তু আকাশ আর সমুদ্র এখন সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট। পোতাশ্রয়ে একমাত্র জাহাজ রয়ে গেছে এখন 'ফিদোনিসি'।

আবার যেন ভিড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল একটু। যে জেটিতে বাঁধা ছিল ফিদোনিসি তারই ওপর অনেকগুলো কালো-কালো মাথা দেখা গেল মাছের ডিমের মতো জটলা পাকিয়ে জমে আছে। ইঞ্জিন-বসানো একটা পাল-তোলা স্কুনার এগিয়ে এল 'ফিদোনিসি'কে টেনে নিয়ে যাবার জন্য। ভিড়ের ভেতর থেকে ঢিল এসে

সাবধানতার খাতিরে জার্মানরা শহর থেকে সরে পড়ল। কঝুখ তার সৈন্য-দল নিয়ে শহরের ওপর দিয়ে চলে যাবার পরে-পরেই কসাকরা দখল করল শহর; তার কিছু বাদেই ঢুকল শ্বেতরক্ষীরা, ওরা এসে চালাল লুটতরাজ।

জাহাজী কিংবা লালফৌজী সেপাই কিংবা যে-কোনো লোক যার চেহারা একটু বেশি গরিব-গরিব তাকেই ধরে টেলিগ্রাফের খাম্বায় ঝোলানো হল বিনা বিচারে। লরী বোঝাই করে তিন হাজার লাশ সমুদ্রের দিকে চালান করা হল এই ক'দিনে। নভোরোসিস্ক্ এখন শ্বেতরক্ষীদের বন্দর।

পনের হাজার উদ্বাস্তু তাদের তল্পিতল্পা নিয়ে তামান-ফৌজের গলগ্রহ হয়েছে। এদের নিয়েই ফৌজ ধুঁকতে ধুঁকতে চলল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উপকূল এলাকা ধরে তুয়াপ্সের দিকে। তুয়াপ্সেতে পৌঁছে ওরা চট্ করে পুব দিকে ঘুরল। দেনিকিনের দল ওদের একেবারে পেছনে এসে পড়েছে, আর সামনে যতো গিরিপথ আর নদীখাত, সব দখল করে রয়েছে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহীরা। এমন একটি দিনও কাটে না যেদিন জোর লড়াই না হয়। সমানে এগিয়ে চলেছে ফৌজ, কখনো গুঁড়ি মেরে, কখনো খাড়া পাহাড়ের উঁচু পাড় বেয়ে; রক্ত ঝরছে, শিরদাঁড়া ভেঙে পড়ছে অনাহারে আধমরা অবস্থা, যতোই এগোচ্ছে সংখ্যায় ততোই কমছে, তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে মরি-বাঁচি করে।

একদিন কঝুখের কাছে ধরে আনা হল লালফৌজী একজন সেপাইকে, বন্দীদশা থেকে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন জেনারেল পকরোভ্স্কি। তার কাছে একটা চিঠি ছিল, তাতে জংগী কায়দায় বেশ খোলাখুলি ভাষাতেই লেখা রয়েছে ঃ

"রুশ ফৌজ আর নৌবহরের অফিসারদের মুখে তুই চুণ-কালি দিয়েছিস্, হতভাগা বদমায়েশ,—যোগ দিয়েছিস্ বলশেভিক, চোর-ডাকাত, আর বাউণ্ডুলে-গুলোর দলে। তা হলে জেনে রাখ্ এই তোর শেষ, তোর ওই বাউণ্ডুলে হতভাগা-গুলোরও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। তোকে আমরা শক্ত কব্জার মধ্যে পেয়েছি, বুঝলি বদমায়েশ, এবারে তোকে আঙুলের ফাঁক গলে পালাবার সুযোগ দিচ্ছি না। তুই যদি দয়া ভিক্ষা চাস্, অর্থাৎ কয়েদী-খাটিয়েদের দলে ঢুকে মাথা বাঁচাতে চাস্ তবে যেমন বলছি তেমনি কর্ ঃ আজই তোদের সমস্ত হাতিয়ার ছেড়ে দলবল নিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় বেলোরেচেন্স্কায়া রেলস্টেশনের দু'তিন মাইল পশ্চিমে সরে যা। আমার হুকুম মেনে নিলে সেকথা আমায় জানিয়ে দে, সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠা চার নম্বর সিগন্যাল বক্সে।."

টিনের কৌটোয় ঢালা চায়ে চুমুক দিতে দিতে চিঠিখানা পড়ল কঝুখ। লালফৌজী সেপাইটির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার—পায়ে জুতো নেই, টিউনিকের বেল্ট খোলা, বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

"নোংরা কুকুর!" বলে উঠল কঝুখ: "কোন্ সাহস এই চিঠি আনলে তুমি আমার কাছে? যাও, নিজের ইউনিটে ফিরে যাও এক্ষুনি..."

সেই রাতেই জেনারেল পকরোভ্স্কির ফৌজের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো কঝুখ, তাড়া করে চলল ওদের পিছু-পিছু, ঘোড়সওয়ার লেলিয়ে দিল ওদের

ঝাঁঝে বিগলিত হয়ে গরম রক্ত চড়ে যায় মাথায়।.....সজোরে পর্দা ছিঁড়ে ফেলে তিনি জানলা দিয়ে চেয়ে থাকেন রাতের অন্ধকারের দিকে, তাঁরই বিকারগ্রস্ত জল্পনা-কল্পনার প্রতিচ্ছায়া যেন ভিড় করে আসতে থাকে সে অন্ধকারে।.....

শ্বেতরক্ষীদের আক্রমণাত্মক অভিযান শিথিল হয়ে এল। লালফৌজ অবশেষে উত্তর কুবানের ডানপাড়ে একটু দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে পেয়েছে, সেখানেই ঘাঁটি গাড়লো তারা। এই ফাঁকে আবার লৌহ ডিভিশনের কম্যাণ্ডার দ্‌মিত্রি শেলেস্ত্‌ও ফিরে এলেন জারিৎসিন থেকে—কিরঘিজ স্তেপের ওপর দিয়ে একসার মোটরলরী আর দু'লক্ষ রাউণ্ড গুলিগোলা নিয়ে এলেন তিনি। ককেসীয় বাহিনীকে উত্তরে ঘুরে জারিৎসিন শহর বাঁচাতে যেতে হবে, এ হুকুমনামাও ছিল তাঁর সঙ্গে। আতামান ক্রাস্‌নভের শ্বেত কসাক বাহিনী এখন জারিৎসিন ঘিরে রেখেছে।

সরোকিন এ হুকুম মানতে সরাসরি অস্বীকার করলেন। উক্রেইনীয় রেজিমেণ্টগুলো দেশগ্রাম ছেড়ে এত দূরে এসে লড়াই করতে গিয়ে এমনিতেই ত্যক্ত-বিরক্ত, রাগে গজগজ করছে তারা, সরোকিনের শত অনুরোধ-উপরোধ আর শাসানি সত্ত্বেও পালাচ্ছে পল্টন ছেড়ে। একমাত্র লোক যিনি অন্তত কিছু সেপাইকে আটকে রাখতে পারেন তিনি হলেন শেলেস্ত্‌। পল্‌তাভায় তাঁর জন্ম, পল্‌তাভাতেই মানুষ হয়েছেন। সেপাইদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে পারেন, চাষীদের সঙ্গে চাষীরা যেমন কথা কয় ঠিক তেমনিভাবে—আস্তে-আস্তে, বুঝিয়ে-শুঝিয়ে, খানিকটা ওদের খোসামোদ করে, খানিকটা নিজের তারিফ করে। উক্রেইনীয়রা দেখে এ-লোক 'ভিন্‌দেশী' তো নয়ই, উপরন্তু তাদেরই ঘরের লোক, প্রবীণ। তাই তাঁকে মেনেও চলে ওরা। দ্‌মিত্রি শেলেস্ত্‌ ওদের লড়াইয়ে টেনে নিয়ে যান, নেভিন্নমিস্কায়ায় ওরা একটা শক্ত অফিসার-ইউনিটকে একদম ছাতু করে ফেলে। আর ঠিক এই সময় থেকেই শেলেস্তের প্রতি বিদ্বেষে যেন জ্বলতে থাকেন সরোকিন।

শেলেস্তের জয়লাভে অভিনন্দন জানিয়ে সরোকিন তাঁকে রণাঙ্গনেরই একটা অংশের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন, আর ঠিক সেইদিনই গোপনে হুকুম দিলেন যেন শেলেস্তের ইউনিটটিকে নিরস্ত্র করে তাঁকে সপারিষদ গুলি করে মারা হয়। আগে থাকতেই গন্ধ পেয়ে শেলেস্ত্‌ তাঁর লৌহ ডিভিশন নিয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে সরে পড়লেন। একদল উক্রেইনীয় এসে যোগ দেবার ফলে তাঁর ফৌজের আয়তন এর মধ্যেই বেড়ে গেছে। দশম আর্মির বিপ্লবী সমর পরিষদের হুকুমের মর্যাদা রেখে শেলেস্ত্‌ জারিৎসিনের দিকে এগিয়ে চললেন লবণাকীর্ণ স্তেপভূমি আর চোরাবালির ওপর দিয়ে। এর পরেই সরোকিন করলেন কী, শেলেস্ত্‌কে আইনের আওতা থেকে বিতাড়িত বলে ঘোষণা করে দিলেন, লালফৌজের প্রত্যেকটা সেপাইয়ের ওপর তাঁর ঢালাও হুকুম হল, শেলেস্ত্‌কে গুলি করে মারতেই হবে; আর লৌহ ডিভিশনকে যাতে কেউ ঘোড়ার খাবার ইত্যাদি সরবরাহ না করে সে নিষেধও জারি করলেন তিনি। কিন্তু এতকিছুর পরও শেলেস্ত এগিয়ে চললেন সমানে, একটি হাতও উঠল না তাঁকে রুখবার জন্য। যদি রাস্তায় কখনো ঘোড়ার খাবারের নেহাৎই দরকার পড়ে, তাহলে পেলেস্ত্‌ সিধে গিয়ে ঢুকে পড়েন কোনো গ্রামে, কসাক-টুপি খুলে

অরাজকতা হবে সে-কথা জেনে রাখা ভাল। মার্তিনভকে বাঁচাবার কোনো উপায় ছিল না—পিয়াতিগর্স্কে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল, ফৌজের সামনেই গুলি করে মারা হল। তামান রেজিমেণ্টগুলোর মধ্যে ঝড়ের মতো বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল, ওরাও শাসিয়ে রাখল এর প্রতিশোধ নেবে।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের জন্য একটা নতুন সেনাপতিমণ্ডলী খাড়া করা হল। বেলিয়াকভ বরখাস্ত হয়ে গেলেন, কিন্তু সরোকিন তাঁর হয়ে ওকালতি করার কোনো চেষ্টাই দেখালেন না। প্রাক্তন চীফ-অব-স্টাফ তাঁর নথিপত্র টাকাপয়সা ইত্যাদি জমা দিয়ে ভূতপূর্ব বন্ধুর কোয়ার্টারে এলেন জবাবদিহি দাবি করতে। ঘরের ভেতর পায়চারি করছিলেন সরোকিন, হাতজোড়া পেছন দিকে মোড়া। টেবিলের ওপর একটা তেলের বাতি, পাশে রয়েছে খাবার, এখনো হাত পড়েনি তাতে। একটা খোলা ভদ্‌কার বোতলও রয়েছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মাশুক্‌-এর অরণ্য-ঘন ঢালু পাহাড়, সূর্যাস্তের বিষণ্ণ বর্ণপটে কালো রেখার মতো ফুটে আছে তার আকৃতি।

মুহূর্তের জন্য সরোকিন আগন্তুকের দিকে চোখ তুলে চাইলেন; তারপর আবার শুরু করলেন পায়চারি। টেবিলের পাশে মাথা নিচু করে বসলেন বেলিয়াকভ। সরোকিন ততক্ষণে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। একদিকের কাঁধ উচু করে বললেন :

"একটু ভদ্‌কা হয়ে যাক্‌! শেষবারের মতো একসঙ্গে দু'জনে।"—একটা কর্কশ অট্টহাসির সঙ্গে বললেন সরোকিন। তাড়াতাড়ি দুটো গেলাস ভর্তি করে আবার শুরু করলেন পায়চারি : "তোমার লীলাখেলা তো এবার সাঙ্গ হল ভাই।... আমার উপদেশ শোনো, যতো তাড়াতাড়ি পারো কেটে পড়ো এখান থেকে।.....আমি তোমার হয়ে ওকালতি করতে যাচ্ছি না।.....কালই একটা কমিশন নিয়োগ করব তোমার নথিপত্র পরীক্ষা করবার জন্য, বুঝেছ? হয়তো গুলি খেয়ে মরতে হবে তোমাকে....."

বেলিয়াকভ তাঁর পাংশু শুকনো মুখখানা তুলে চাইলেন, কপালের ওপর একবার হাত বুলিয়েই নামিয়ে নিলেন হাতটা।

"তুমি একটি ইতর ছোটলোক, তার চেয়ে বেশি কিছু নও," বললেন বেলিয়াকভ : "আর আমি কিনা তোমার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে খাটলাম!.....নোংরা জানোয়ার!.....এই লোকটাকেই কিনা তালিম দিচ্ছিলাম নেপোলিয়ন হবেন বলে!... উকুন কোথাকার!....."

সরোকিন মদের গেলাস তুললেন। গলায় ঢালবার সময় গেলাসের কিনারায় লেগে দাঁতগুলো বেজে উঠল। তারপর সিরকাশিয়ান জামার পকেটে হাতদুটো গুঁজে আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

"বেশ তো, নথিপত্র পরীক্ষা করা হবে না।"—হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন সরোকিন : "বেরিয়ে যাও এখান থেকে! আর জেনে রাখ, এখন যে তোমায় গুলি করে মারছি না তার একমাত্র কারণ হল তোমার আগেকার কাজকর্ম। আশা করি এজন্য তুমি আমার তারিফই করবে!"

ঝুলে-পড়া ভুরুজোড়ার নিচে সে-দৃষ্টি খানিকটা ঢাকা পড়ে গেছে।...বেলিয়াকভের সঙ্গে যখন শেষবার দেখা হয় তখন তাঁর চোখেও ঠিক এমনি দৃষ্টিই দেখেছিলেন সরোকিন। হঠাৎ যেন গিম্‌জার দাড়ি-কামানো কালশিটে-পড়া মুখটার মধ্যে এক-সারি দাঁত দেখা গেল সাদা একটি রেখার মতো। সরোকিনের বুকটা যেন দমে গেল সঙ্গে সঙ্গে—এই লোকটাও তাহলে ওর দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে!

ঘোড়ার দু' বগলে হাঁটু দিয়ে এমন জোরে গুঁতো মারলেন তিনি যে ফোঁস্‌ করে জানোয়ারটা লাফ দিয়ে উঠল একবার, তারপর ঊর্ধশ্বাসে ছুটল নুড়িপাথর-গুলোর ওপর খুরের আওয়াজ তুলে। উৎরাইয়ে উঠে ঘোড়াটা সওয়ারকে সিধে এনে ফেলল বিশ্রী বোঁটকা-গন্ধওয়ালা একপাল ভেড়ার মাঝখানে। ভেড়াগুলো খোঁয়াড়ের দিকে ফিরছিল ল্যাজ তুলে ভ্যা-ভ্যা করতে করতে। সেদিন ছিল বারোই অক্টোবরের সন্ধ্যে। সরোকিন তাঁর প্রধান দেহরক্ষীকে ডেকে পাঠালেন। দেহরক্ষী জানলার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে সরোকিনের কানে-কানে বলল, গিম্‌জা সবে পিয়াতিগর্‌স্ক্‌ থেকে এসেছে; আত্মরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ফ্রন্ট থেকে দু' কোম্পানী সেপাই ফেরৎ চেয়ে পাঠাক্‌ এই হল গিম্‌জার অভিমত, এই অভিমতই সে জানাতে এসেছে।..."বুঝলেন কমরেড সরোকিন, কার বিরুদ্ধে এ-সব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা বুঝতে খুব একটা বুদ্ধির দরকার করে না!..."

মাশুক পাহাড় আর অন্ধকার তন্দ্রামগ্ন পিয়াতিগর্‌স্ক্‌ শহরের ওপর শরৎ-আকাশের তারাগুলো যখন ফুটে উঠল তাদের সমস্ত শোভা নিয়ে, সরোকিনের দেহরক্ষীরা তখন নিঃশব্দে এসে ঢুকল কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি রুবিনের ঘরে। কমিটির দু'জন সদস্য ভ্লাসভ আর দুয়ানেভ্‌স্কি, বিপ্লবী সমর পরিষদের সদস্য ক্রাইনি, আর চেকার সভাপতি রোঝান্‌স্কি—এদের ঘরেও ঢুকল তারা। বিছানা থেকে জোর করে টেনে তুলল ওদের, সঙ্গীনের ফলা দেখিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল শহরের বাইরে রেল লাইনের কাছে, তারপর কোনোরকম ব্যাখ্যানা না করেই সিধে গুলি চালিয়ে দিল ওদের ওপর।

এ-সব ব্যাপার যখন ঘটছে, সরোকিন তখন লের্‌মন্তোভো স্টেশনে তাঁর রেল-কামরার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে। কানে এল গুলির আওয়াজ—রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে পাঁচবার গুড়ুম্‌-গুড়ুম্‌ শব্দ। তারপর সরোকিন শুনতে পেলেন কারো ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ—প্রধান দেহরক্ষী এগিয়ে এল ওঁর সামনে, শুকনো ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে চাটলো একবার। "কি খবর?" জিজ্ঞেস করলেন সরোকিন। "খতম!" জবাব দিল রক্ষী, এক-এক করে দণ্ডিতদের নাম বলে গেল সে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। সুপ্রীম কম্যান্ডার এখন পূর্ণবেগে ছুটে চলেছেন রণাঙ্গনের দিকে। কিন্তু তাঁর সাংঘাতিক অপরাধের খবরটা আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। আঞ্চলিক কমিটির কয়েকজন কমিউনিস্টকে গিম্‌জা একদিন আগেই সাবধান করে দিয়েছিল, সরোকিন আসার আগেই তাঁরা গাড়িতে চেপে

বাঁচবার একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল তাঁর মনে, শেষবারের মতো টেবিলে ঘুষি মেরে তিনি চিৎকার করে উঠলেন ক্রুদ্ধ শপথ জানিয়ে :

"ওরে ডাকাতের দল! বিচারের রায় তো দেব আমিই! এ হচ্ছে শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অরাজকতা, গোপন প্রতিবিপ্লব! যে-ভাবে ওই বদমায়েশ মার্তিনভটাকে শাস্তি দিয়েছি, তোদেরও ঠিক সেই হাল করব।....."

বিচারকদের একজন হল ভিস্‌লেঙ্কো, গিম্‌জার পাশেই বসেছিল; ভয়ে একেবারে মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে উঠল সে। পিছনে হাতটা গুঁজে সে প্রকাণ্ড একটা অটোমেটিক পিস্তল টেনে বের করল, তারপর এক-এক করে ওর সবগুলো গুলি নিঃশেষ করে দিল সরোকিনের ওপর।

স্তাভ্‌রোপল থেকে ভল্‌গার তটের দিকে আর বেশি দূর এগোনো সম্ভবপর হল না—বাধা দিল শ্‌কুরোর "নেকড়ে" ঘোড়সওয়ার ফৌজ। পিছনদিকের এলাকায় পালিয়ে গিয়ে ওরা নেভিন্নমিস্কায়ার মূল ঘাঁটি থেকে তামান ফৌজকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। স্তাভ্‌রোপল অবরোধ করার জন্য সৈন্যবহর মোতায়েন করছিলেন দেনিকিন। এই উদ্দেশ্যে কুবান থেকে কাজানোভিচ্‌, দ্রজ্‌দভ্‌স্কি আর পক্‌রোভস্কির কলামগুলোকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। উলাগাইয়ের অশ্বারোহী ফৌজ এবং কুবান অশ্বারোহী ডিভিশন নামে একটা নতুন সংগঠিত ডিভিশনকেও সরিয়ে নেয়া হয়েছিল ঐ একই উদ্দেশ্যে। এই নতুন ডিভিশনটার অধিনায়ক হল একজন প্রাক্তন খনি-ইঞ্জিনীয়র, লোকটা যুদ্ধের গোড়ার দিকে ছিল জুনিয়র অফিসার, এখন হয়েছে জেনারেল র‍্যাঙ্গেল্‌।

আটাশদিন ধরে লড়ল তামান ফৌজ। একের পর এক প্রত্যেকটা রেজিমেণ্ট ধ্বংস হয়ে গেল অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান্‌ শত্রুর লোহার মুঠিতে পিষ্ট হয়ে। এর মধ্যে শুরু হল বর্ষা। যথেষ্ট ভারিকোটও নেই ওদের, তার ওপর বুট আর কার্তুজের অভাব। কারো কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করেও লাভ নেই, কারণ ককেসীয় ফৌজের বাকি অংশটুকু স্তাভ্‌রোপল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমাগত হটে যাচ্ছে পুবের দিকে।

শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে তামান বাহিনীর লোকেরা যেন প্রচণ্ড বিক্রমে লড়তে লাগল। ওদের কম্যাণ্ডার কঝুখ্‌ টাইফাসে মারা গেছেন। সেরা সেরা কম্যাণ্ডারদের সবাই প্রায় হতাহত। কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তামান ফৌজ বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হল। বীর তামান ফৌজের হতাবশিষ্ট অংশের তখন এক শোচনীয় অবস্থা, পায়ে জুতো নেই কারুর, পরনে ন্যাকড়ার ফালি। স্তাভ্‌রোপল ছেড়ে ওরা উত্তর-পুবে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রগোদাৎনয়ের ওপর। ওদের পশ্চাধাবন করার কেউ নেই তখন—বিশ্রী আবহাওয়া আর শরতের বর্ষায় শ্বেতরক্ষীদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু সে নিতান্তই বাহ্যিক : আসলে তখন গোটা দেশ জুড়েই জেগে উঠছিল সংহতির একটা সুপ্ত শক্তি, অস্তিত্ব রক্ষার মামুলি সংগ্রামে তখন সবে লাগতে শুরু করেছিল ন্যায়াকাঙ্ক্ষার বর্ণপ্রলেপ। এমন সব বিস্ময়কর নর-নারীর আবির্ভাব ঘটছিল যাদের তুলনা অতীতে কখনো দেখা যায়নি; তাদের রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের কথা নিয়ে সর্বত্র আলোচনা চলতো বিমুগ্ধ বিস্ময়ে।

সোবিয়েত-ভূমি বিচলিত হয়ে পড়েছিল আভ্যন্তরীন উপদ্রবে। ঠিক যে-সময়টায় বিদ্রোহ ঘটছিল ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এ (পরবর্তীকালে সে-বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে মুরোম্‌, আর্‌সামাস্‌, রস্তভ্‌-ভেলিকি ও রীবিন্‌স্কে), একই সময় মস্কোতেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল "বামপন্থী সোশালিস্ট-রিভলিউশনারীরা"। ৬ই জুলাই তারিখে তাদেরই দুজন লোক দেখা করতে আসে জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট মিরবাখ্‌-এর সঙ্গে। ওদের সঙ্গে ছিল জেরঝিন্‌স্কির* জাল সই-সমেত পরিচয় পত্র। কাউণ্ট মিরবাখের সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় ওরা রাষ্ট্রদূতের ওপর গুলিবর্ষণ করে, একটা বোমাও ছোঁড়ে। কামরা থেকে পালিয়ে যাবার সময় শেষ গুলিটা এসে রাষ্ট্র-দূতের মাথার পেছনে লাগে, এবং তাতেই তিনি মারা যান। সেইদিন সন্ধ্যায় সশস্ত্র নাবিক আর লালফৌজের লোকেরা ছেয়ে ফেলল 'ক্রিস্তিয়ে প্রুদি' আর 'য়াউজা' বুলভারে। মোটরগাড়ির গতিরোধ করে, পথিকদের থামিয়ে তারা তল্লাশী চালালো, সঙ্গে যে কোনোরকম অস্ত্র বা টাকা থাকলে তা কেড়ে নিয়ে তাদের টেনে নিয়ে চলল বিদ্রোহের সদর দপ্তরে—ত্রেখ্‌স্‌ভিয়াতিতেলি স্ট্রীটের মুরোজভ্‌ প্রাসাদে। ফেলিক্স্‌ জেরঝিন্‌স্কি স্বয়ং গিয়েছিলেন ওই বাড়িতে মিরবাখের আততায়ীদের খুঁজতে, কিন্তু তিনি সেখানে বন্দী হলেন। সারা সন্ধ্যে এবং রাতেও খানিকক্ষণ অবধি গ্রেপ্তারের হিড়িক চলল। টেলিগ্রাফ চলে গেছে বিদ্রোহীদের হাতে। কিন্তু ক্রেমলিন আক্রমণ করতে কেউ সাহস পায়নি তখনও। প্রায় দুহাজার বিদ্রোহী তখন য়াউজা নদী থেকে শুরু করে ক্রিস্তিয়ে প্রুদি বুলভার পর্যন্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল।

ক্রেমলিনের হাতে তখন টেলিফোন-যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নেই, আর ভরসা করবার মধ্যে আছে শুধু তার সাবেকী আমলের প্রাকার বেষ্টনী। খোদিন্‌স্কয়ে ময়দানে মোতায়েন ছিল পল্টন, আর বেশির ভাগ সেপাইকেই ইভান কুপালার উৎসব উপলক্ষ্যে ছুটি দেয়া হয়েছিল। ক্রেমলিনের ভেতর তখন দারুণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। সকালের দিকে অবশ্য তাঁরা ধরে-করে প্রায় আটশো সৈনিক জড়ো করলেন, আর জোগাড় করলেন তিনটে কামান, কয়েকটা সাঁজোয়া গাড়ি। সকাল সাতটায় আক্রমণ শুরু করল সেপাইরা, গোলা ছুঁড়ে তারা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিল ত্রেখ্‌স্‌ভিয়াতিতেলি স্ট্রীটের মুরোজভ্‌ প্রাসাদটা। ভেতরে হৈচৈ হচ্ছিল

---

*ফেলিক্স্‌ এদ্‌মুন্দোভিচ্‌ জেরঝিন্‌স্কি (১৮৭৭-১৯২৬)—বলশেভিক পার্টির একজন অগ্রগণ্য নেতা, লেনিন ও স্তালিনের দৃঢ় সমর্থক; 'সারা রুশ বিশেষ কমিশনের' (চেকা) অধিকর্তা ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের একজন প্রতিভাশালী সংগঠক।

তৎক্ষণাৎ ব্যাপক গুলিচালনার দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।.....শ্বেতরক্ষী কুকুরদের বিরুদ্ধে আমাদের পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় এখনই চূড়ান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।.....ব্যাপক আকারে সন্ত্রাস প্রয়োগ করিতে যেন কোনোপ্রকার ইতস্তত করা না হয়।....."

সে-সময়ে শহরগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবহারে অত্যন্ত কড়াকড়ি চলছে, মাঝে মাঝে গোটা একেকটা পল্লীতে আলোই জ্বালানো হয় না। যাঁরা দামি-দামি ঘরে থাকেন তাঁরা অবশ্য বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট্ ধীরে ধীরে লাল হয়ে আসছে দেখলেই ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠেন, কে জানে হয়তো এই তাঁদের মরণ-শয্যার শেষ বাতি, হয়তো একটু বাদেই একদল সশস্ত্র মজুর এসে হাজির হবে, তারই নিশানা জানিয়ে দিচ্ছে এখনই।.....

সারা রাশিয়ায় ঝড় তুলে উনিশ-শো-আঠারো সালটা চলে গেল। বিষণ্ণ জলগর্ভ মেঘ উঠেছে শরতের আকাশে। যেদিকে তাকাও সেদিকেই এখন রণাঙ্গন—সুদূর উত্তরে, ভল্‌গার তীরে কাজানে, দক্ষিণ ভল্‌গায় জারিৎসিনে, উত্তর ককেসাসে আর জার্মান-অধিকৃত সীমান্ত এলাকায়। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী পরিখা। আসন্ন শরতের আবহাওয়া লালফৌজের লোকদের মনে কিন্তু খুশির ভাব আনতে পারে নি। উত্তর দিক থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে-আসা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে ওদের অনেকেরই মনে পড়ে দেশের কথা, গাঁয়ের কথা—সেখানে এখন কুঁড়ে ঘরের চালা থেকে বাতাসে খসে পড়ছে ছাউনির খড়, কাঁটাগাছে ভরে গেছে জমি, মাঠেই পচে যাচ্ছে আলু; যুদ্ধ যে কোনোদিন থামবে, মনে হয় সে আশ্বাসও নেই; সামনে শুধু গাঢ়-অন্ধকার রাত আর কুটিরের মধ্যে কুপি বাতির ক্ষীণ আলো, বাপ-ছেলে কবে ফিরবে তারই আকুল প্রতীক্ষা, আর কোথায় কী ভয়ংকর ঘটছে তারই গল্প শুনে উনুনের ধারে শুয়ে-থাকা বাচ্চা ছেলের কান্না।

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গার বিদ্রোহ দমন করার পর, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কো পেত্রোগ্রাদ ও ইভানভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্ক্ শহরের সবচেয়ে পাকাপোক্ত কমিউনিস্টদের আহ্বান করে তাদের পাঠিয়ে দিলেন সেনা বাহিনীতে। ট্রেনে চেপে তাঁরা এগোতে লাগলেন রণাঙ্গনগুলোর দিকে, পথে যতো ধ্বংসমূলক কাজ তাঁদের গোচরে এল সব তাঁরা দমন করলেন কঠোর হাতে, তা সে ইচ্ছাকৃত অপরাধই হোক্ আর অনিচ্ছাকৃতই হোক্। সন্ত্রাসের কড়া হুকুমত ফৌজের মধ্যেও কায়েম হল। বিশৃঙ্খল কিংবা প্রায় উপে যাবার মতো ফৌজীদল-গুলোকে নতুনভাবে রেজিমেণ্টের রূপ দেয়া হল, তাদের আনা হল বিপ্লবী সমর পরিষদের পরিচালনাধীনে। নতুন যুগের আদর্শ হল সাহস ও বীর্যবত্তা। কাপুরুষতা হল রাষ্ট্রদ্রোহের সামিল। লাল রণাঙ্গনের তরফ থেকে এবার আক্রমণোদ্যোগ শুরু হল। একটি মাত্র প্রচণ্ড আঘাতে পতন হল কাজানের, আর

এই উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ড

॥ বিষন্ন প্রভাত ॥